জীবনানন্দ স্মৃতি

সম্পাদনা

দেবকুমার বসু

করুণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা-বারো



প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীপার্বতীচরণ রায়
গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯/এ বিধান সরণি
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

সূচীপত্র

প্রসঙ্গত

প্রসঙ্গত

আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতার ক্ষেত্রে চতুর্থ দশকের গোড়া থেকেই রবীন্দ্র-যুগেও রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়ে যিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন—নিজেই যুগ সৃষ্টি করলেন – যাঁর প্রভাব তরুণ থেকে তরুণতর কবিদের মনকে আচ্ছন্ন করে ক্রমে জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে যিনি অধিষ্ঠিত হলেন—তিনিই কবি জীবনানন্দ দাশ।

ও-দেশের ইয়েটস্ ও এ-দেশের জীবনানন্দ ব্যতিরেকে রবীন্দ্র পরবর্তী কোন কবি বাঙ্‌লার তরুণতম কবি সমাজকে এমনভাবে সম্মোহিত করে রাখতে পারেন নি। তাই আজ—"এই কালেই, একদল নবীন কবির কাছে জীবনানন্দ মাত্র ব্যক্তি কবিই নন—তিনি একটি ইন্‌স্‌টিট্যুশন—'সংস্থা'। 'জীবনানন্দের আর এক নাম কবিতা'।"* এ সৌভাগ্য যে কোন কবির কাছে দুর্লভ।

১৮৯৯-এর ৬ ফাল্গুন (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) বরিশাল-এ জীবনানন্দের জন্ম হয়। লেখাপড়া বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল ও ব্রজমোহন কলেজেই করেছেন। ইংরেজি অনার্স সহ বি. এ. পাস করেন কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে এবং ১৯২১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ.।

অতঃপর জীবনানন্দ কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে কোলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন ১৯২২ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত। এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত দিল্লীর রামযশ কলেজে। ইতিমধ্যে বাঙ্‌লা ১৩৩৪ আশ্বিন-এ (ইংরেজী ১৯২৮ হিসেবে ১৯২৭ হওয়া উচিত) কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হয় ২৬ বৈশাখে। ১৯৩৫-এ জন্মভূমি বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে চাকুরী গ্রহণ করেন। ব্রজমোহন কলেজে দীর্ঘদিন চাকরি করেন, ১৯৪৮ পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালে ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

* নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-[জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ ১ম]-এর ভূমিকা।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়। ১৯৪২-এ কবিতা ভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজে বনলতা সেন এবং ১৯৪৪-এ পূর্বাশা লিমিটেড্ থেকে 'মহাপৃথিবী' প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় কিছুদিন দৈনিক 'স্বরাজ'-এর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনাও করেছেন। এর পরের বছর ১৯৪৮-এ গুপ্ত রহমান অ্যাণ্ড গুপ্ত প্রকাশক কর্তৃক 'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশিত হয়। বরিশাল থেকে দেশবিভাগের ফলে কবি বরাবরের জন্য কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৯৫১-৫২ সালে খড়্গপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫২ সালে সিগ্‌নেট প্রেস্ থেকে 'বনলতা সেন'-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এই বছরই নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক বনলতা সেন (সিগনেট প্রেস সংস্করণ) পুস্তকটি পুরস্কৃত হয়। ১৯৫৪ সালে মে মাসে নাভানা কর্তৃপক্ষ শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশ করেন এবং জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৪৭—১৯৫৪ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা বই বিবেচিত হওয়ায় ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। একই বছরে কিছুদিন বেহালার বড়িষা কলেজে ও পরে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত হাওড়া গার্লস্ কলেজে অধ্যাপনা করেছেন।

একই বছরে, ১৯৫৪ সালে গোড়ার দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত আয়োজিত কবি-সম্মেলনে কবি যোগদান করে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এই বছরেই ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাসবিহারী এভেনিউতে ট্রাম দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি হন। এখানেই ২২ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

জীবনানন্দের আকস্মিক মৃত্যু সেদিন সবাইকে মর্মাহত করেছিল। কিন্তু এই মৃত্যুতে কবির যাত্রা শেষ হয় নি—বরং শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই। জীবনানন্দের পরিচয় তাঁর কবিতাতেই। তাঁর কবিতা একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত সম্পদ। অন্য কোন লেখকের পক্ষে সে রীতিকে অনুসরণ করা সম্ভব নয় এবং ছিল না।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে—'রূপসী বাঙ্‌লা,' (১৯৫৭) 'বেলা অবেলা কালবেলা,' (১৯৬১) প্রবন্ধ সংকলন 'কবিতার কথা' (১৯৫৬)। এর মধ্যে 'রূপসী বাঙ্‌লা' ও 'কবিতার কথা' সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা' নিউ স্ক্রিপ্ট থেকে। জীবনানন্দ প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। যত দিন যাচ্ছে—জীবনানন্দ আমাদের আপন থেকে আপনতর হয়ে উঠছেন। তাঁর কবিতার নব নব

মূল্যায়ন হচ্ছে—যার ফলে জীবনানন্দের জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এবং এই সংকলনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিও এই কারণেই।

এই সংকলনে জীবনানন্দের কাব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকের পর্যালোচনায় ও তাঁর প্রতিভার বিচার করেছেন বর্তমান কালের কবি, অধ্যাপক এবং কবির সমসাময়িক লেখকরা।

'জীবনানন্দের বর্ণচেতনা' ছিল কি ছিল না এই প্রশ্নের শেষে, হয় তিনি বর্ণসচেতন কবি অথবা ধূসরতার কবি! তিনি কি ছন্দ সচেতন? তিনি কি ছন্দকুশলী? যদি ছন্দকুশলী তবে কোন ছন্দে তাঁর কবিত্ব যথার্থ অবলম্বন পেয়েছে—মাত্রাবৃত্তে, অক্ষরবৃত্তে অথবা স্বরবৃত্তে? জীবনানন্দের কবিতার ভাষা কি ছিল? তাঁর বাক্যগঠনের বিশিষ্টতা কি? তাঁর চিত্রকল্পের ধর্ম—আধুনিকতা—বাস্তবতাবোধ—জীবনদর্শন—কাব্যে 'বোধ'—তাঁর কবিতার জগৎ নিঃসঙ্গতা, ইত্যাদি জীবনানন্দের প্রতিভার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, নানান দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে বর্তমান সংকলনের রচনাগুলোতে।

এই সংকলনে মোট ৩৪টি রচনা আছে। এর মধ্যে ৯টি রচনা পুনর্মূদ্রিত করা হয়েছে। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সময়গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ' এক্ষণ পত্রিকায়, রঞ্জিত সিংহ রচিত 'জীবনানন্দ দাশ' লেখকের শ্রুতি প্রতিশ্রুতি পুস্তকের প্রথম রচনা। কবি মণীন্দ্র রায়ের 'কবি জীবনানন্দ দাশ' পরিচয় (শ্রাবণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) থেকে নেওয়া, অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতা' অধুনা লুপ্ত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত। কবি সুনীলকুমার নন্দীর 'দিব্যনীলিমার কবি' অমৃত্ত পত্রিকায় প্রকাশিত। এই পত্রিকায় জীবনানন্দের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে– কয়েকটি ছোটগল্পও। 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' বাণী রায় লিখিত গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ লিখিত 'কবি জীবনানন্দ দাশ-এর জীবনদর্শন' অধুনালুপ্ত 'বারোমাস' পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতা সিংহের রচনাটি কবিজায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, দৈনিক কবিতায় প্রকাশিত। 'জীবনানন্দ স্মরণে' বুদ্ধদেব বসুর রচনা, প্রথমে কবির মৃত্যুর পর 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত পরে 'কালের পুতুল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। জীবনানন্দের প্রতিভা ও জীবনসমীক্ষার এই সংকলন 'জীবনানন্দ স্মৃতি' নামে প্রকাশ করার কারণ পাঠক সমাজে 'স্মৃতি' পর্যায়ের গ্রন্থগুলির সমাদর। কবির সমগ্র রচনার সমীক্ষা এতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না—কারণ গ্রন্থের আয়তন বড় হয়ে পড়বে, ফলে পাঠক ও ক্রেতার অসুবিধে হবে। জীবনানন্দর কবি ও কাব্যবিচার বিষয়ে অপর একটি গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হচ্ছে।

প্রকাশক শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও তাগিদে, এবং 'স্মৃতি' পর্যায়ের' অনেক গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীসুজিতকুমার নাগের আগ্রহে সংকলনের প্রকাশ হল। দুজনকেই আমার ধন্যবাদ জানাই। এই সঙ্গে কবিজায়া শ্রীমতী লাবণ্য দাশ, কবি বন্ধু শ্রীসুবোধ রায়, অধ্যক্ষ শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, অধ্যাপক রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী ছন্দা বসু ও শ্রীনিখিলেশ্বর সেনগুপ্তকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই—নানাভাবে সহযোগিতা ও উপদেশ দিয়েছেন বলে। সবশেষে কবি জীবনানন্দ দাশ-এর প্রতি এইভাবে শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

দেবকুমার বসু

জীবনানন্দের বর্ণচেতনা

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

জীবনানন্দের কবিকল্পনা, শিল্পচিন্তা, কবিতাবলী, মননপ্রকৃতি সব কিছুর মধ্যেই পণ্ডিতেরা একটি শব্দ বার বার খুঁজে পেয়েছেন, একটি শব্দের আভাসেই তাঁর সমগ্র কবিসত্তার ও প্রতিভাধর্মের সংজ্ঞা নির্মাণ করতে চেয়েছেন, সেই শব্দটি হচ্ছে 'ধূসরতা'। এক বাক্যে বলা হয়েছে—জীবনানন্দ ধূসরতার কবি। জীবনানন্দ যাঁর নাম, যিনি প্রধানত গ্রামবাংলার কবি, শহরবাংলার ভাষ্যকার, যিনি দেশগণ্ডীর আলোকে বসে বিশ্ববাহিরের মর্মবাণী শুনেছেন, যিনি জীবন-মৃত্যুর অনেক শুদ্ধ স্বভাব দর্শন করেছেন, যাঁর পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃষ্ণা মেটানোর সাধনা অবারিতও অকৃত্রিম, যাঁকে হেমন্তের রসেতিহাস রচনাকার বলে জানি—তাঁকে ধূসরতার কবিমাত্র বলা কতখানি সমীচীন তা আমরা দ্বিতীয় চিন্তার জন্য ফেলে রাখি নি। জীবনানন্দ স্বল্পবাক্ বহুলব্যঞ্জনার কবি। স্বধর্মের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা তাঁর প্রাবন্ধিক বাক্‌বাহুল্যকে প্রতিহত করেছিল। 'কবিতার কথা' রচনা করেও যিনি বার বার অনুভবচালিত ভাবনায় সচেতন হয়ে ঠিক করেছিলেন নিজের কবিধর্মের ব্যাখ্যা নিজে করবেন, ভ্রান্তিবিলাসী পাঠক ও সমালোচককে আত্মপরিচয়ের গহন পথরেখাটি স্বয়ং দেখিয়ে যাবেন, তাঁর সম্বন্ধে এক বাক্যের সিদ্ধান্ত সরলগ্রাহ্য হলেও, আপাত সত্য হলেও সার্বিক সত্য নয়, সর্বশেষ সত্য নয়।

জীবনানন্দ ধূসরতার কবি বললে সত্য বলা হয় না, বলতে হবে জীবনানন্দ বর্ণসচেতন কবি। বর্ণ, বর্ণালি, বর্ণবিন্যাস, বর্ণলুপ্তি প্রকৃতি ও মানবসংসারের অহরহ বিষয়, অশেষ ঘটনা। বর্ণপ্রেমিক কে নন! রঙের মাতাল রঙের অর্থ না জেনেই রঙ ভালোবাসে। রঙের রঞ্জন মনে দেহে চিত্রে চালচিত্রে চরিত্রে গ্রহণ করতে আমরা অভ্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন নীল রঙ, আর সবুজ রঙের সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে তাঁর কাব্যে। রঙকানা রবীন্দ্রনাথ লাল রঙ তেমন দেখতে পেতেন না। নীল রঙের নীলমণি ফুল ও অপরাজিতা তাঁর মন জয় করেছিল। কিন্তু তাঁর সচেতনতা ও জীবনানন্দের সচেতনার মধ্যে পার্থক্য আছে। পুনশ্চ কাব্যের পাতায় পাতায় রঙের তুলিটান, রঙের আলপনা। সেখানে রঙ কুড়িয়ে কুড়িয়ে তিনি অক্লান্ত। যেমন ধরণীর এককোণে

একটুকু বাসা অন্বেষী কবির আকাঙ্ক্ষা রঙে পড়েছে ধরা—"আমার পাটল রঙের গাই গরুটি/আর মিশোল রঙের বাছুর/ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে। /ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা/খয়েরি রঙের ফুল-কাটা। / দেয়াল বসন্তী রঙের,/তাতে ঘন কালো রেখার পাড়।" (বাসা, পুনশ্চ)। রঙ চাই, রঙ না হলে মন চায় না। আবার রঙছুটকে মন চাইলেও চক্ষু চায় না। আমাদের প্রিয় মমতাঅধিকারী শিল্পী ভ্যাঁসঁ ভান্ গখ্ (Vincent Van Gogh) তাঁর নিজের আঁকা একটি শোবার ঘরের চিত্রপ্রতিম বর্ণনা নিজেই দিয়েছিলেন—

> "এবার স্রেফ আমার শোবার ঘর, তবে এবার রঙই সব কাজ করবে ···আভাস দেবে বিশ্রামের এবং ঘুমের। এক কথায় ছবির দিকে তাকালেই মগজটা বা কল্পনা বিশ্রাম পাবে। দেয়ালগুলি ফিকে বেগনে। মেঝেটা লাল টালির। খাটের আর দেয়ালগুলোর কাঠের রঙ টাটকা মাখনের মতো হলদে, চাদর আর বালিশ খুব হালকা সবুজ হলদে। বিছানা-ঢাকাটা টাটকা টকটকে লাল। জানালা সবুজ। মুখ ধোবার টেবিলটা কমলা রঙের, মুখ ধোবার পাত্রটা নীল। দরজাগুলি লাইল্যাক রঙের।···ছবিতে যখন কোনো সাদা নেই, ফ্রেম হবে সাদা।"[১]

ভান্ গখ্ এইভাবেই বিশ্রামের কাম্য গৃহমুখীন আকাঙ্ক্ষা রঙে ফুটিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও গখ্ দু'জনেই বাসার ছবি এঁকেছেন। একটিতে কল্পনায় রঙের আয়োজন, অন্যটিতে রঙের আয়োজনে বিশ্রামের কল্পনা।[২] এখানে লক্ষণীয়, দুজন মহাকবি-শিল্পী রঙ ব্যবহার করেছেন ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিশ্রামের মূর্ত অভীপ্সায়। রবীন্দ্রনাথ একসময় তুলি ধরে ঐ বাসা পরিকল্পনাটি এঁকেছিলেন,[৩] ভান্ গখের ঐ পরিকল্পিত ছবিটি হয়তো অন্য রূপে এসেছে 'Bedroom at Arles' নামক ছবিতে।[৪]

কাব্যে কবিতায় কেমন করে রঙ এসে পড়ে তার হদিশ অন্বেষণ করতে গেলে ইংরেজী সাহিত্যের মিড্-ভিক্টোরিয়ান কালসীমার অন্তর্বর্তী প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের কথা মনে পড়ে। এই স্মৃতি অবশ্যম্ভাবী জীবনানন্দ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে। প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের পুরোধাবর্তী কবি দান্তে

১ পৃ ১৮০, পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা অশোক মিত্র, ১৯৫৫।

২ বাসাপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের 'বাসা' (পুনশ্চ) কবিতা, শেষের কবিতা উপন্যাস ও চিঠিপত্র ৩এর ৩৬ পত্রটি স্মরণীয়।

৩ পৃ ৩৬, মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৩৩১।

৪ P. 17, Great Painters and Great Paintings. 1965.

গ্রাবিয়েল রসেটি কবিজীবন আরম্ভের পূর্বে ছিলেন চারু চিত্রশিল্পী। ক্রিশ্চিনা রসেটি বা উইলিয়ম মরিসও তৎসঙ্গে স্মর্তব্য। বিশ্বপ্রকৃতিকে ও বস্তুবিশ্বকে ভাসা ভাসা না দেখে, আবেগের ধারা ছড়িয়ে দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভঙ্গিতে দেখতে গিয়ে তাঁরা নব নব অভিনব রঙকে খুঁজে পেয়েছেন, খুঁজে নিয়েছেন। যেমন একটি বর্ণনায় কেমন সহজে বর্ণের গরিমায় বিশেষিত হয়েছে ভোজ্যবস্তু তার খতিয়ান আছে নিম্নের কবিতাংশে —

While on the turf beside them lay
The ashen-handled sickles grey,
The matters of their cheer between :
Slices of white cheese, specked with green,
And green-striped onions and rye-bread,
And summer apples faintly red,
Even beneath the crimson skin ;
And yellow grapes, well ripe and thin,
Plucked from the cottage gable-end.[১]

মরিসের এই কবিতাংশে রঙ খুঁজতে হয় না, রঙের আগ্রহী আমন্ত্রণে আমরা বস্তুগুলিকে প্রিয়তর রূপে, স্বাদুতর রূপে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে কাঙ্ক্ষিত স্বরে পাই। কবিতা এইভাবে পেয়েছে এক নতুন অর্থ, ইঙ্গিত রসসৌন্দর্য ও ভাবসত্তা। গোল্ডেন উইংস, মাই সিস্টার্স স্লিপ, দি পোট্রেট, দি ব্লেসেড ড্যামসেল প্রভৃতি খ্যাত কবিতায় আমাদের বক্তব্যই রূপময় হয়ে ছড়িয়ে আছে। এই রূপময়তা বার বার জীবনানন্দকেই তর্জনী তুলে দেখিয়ে দেয়। যেমন মরিসেরই গোল্ডেন উইংস কবিতার প্রাচীন দুর্গের বর্ণনা—

Many scarlet bricks there were
        In its walls, and old grey stone ;
        Over which red apples shone
At the right time of the year.

On the bricks the green moss grew,
        Yellow lichen on the stone,
        Over which red apples shone ;
Little war that castle knew.[২]

১ P. 446, A Critical History of English Poetry, 1962.

২ কাব্যাংশটি সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন—'This is certainly charming'. P 368, The Pelican Guide to English Literature, 6, 1968.

এখানে যে বর্ণপ্রিয়তার শিক্ষা হয়, তারই সঙ্গতি নিয়ে জীবনানন্দকে অন্বেষণ করতে হবে এবং ফলশ্রুতিতে জীবনানন্দকে ধূসরতার ছায়াকোঠা থেকে উৎক্রান্ত হয়ে আলোর রাজ্যে রশ্মির বৈচিত্র্যে উপস্থিত দেখতে পাবো।

আলোয় আলোয় প্রত্যক্ষে নেপথ্যে ওড়া চঞ্চল রঙের পাখিগুলিকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নিয়ে ধরতে এগিয়ে এসেছিলেন ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকরেরা। তাঁদের সূর্যরঙের খেলায় অদ্ভুত, বিচিত্র, এমনকি বিপরীত ও আপাত অসম্ভব অবয়ব নিয়ে দেখা দিয়েছে। আলোকে ছায়াকে বস্তুকে সময়কে পরিবেশকে নানা রঙ দিয়ে ধরতে গিয়ে ক্লোদ মনে, এদুয়ার মানে, পল সেজান, এডগার দেগা, অগস্ত রেনোয়ার প্রভৃতি কলাবিদেরা আশ্চর্য ছবি সৃষ্টি করেছেন। জীবনানন্দও বিচিত্র, বিশিষ্ট ও বিপরীত রঙের কারবার করেছেন। কোনো একটি রঙের কত যে বৈচিত্র্য ফুটতে পারে, তুলি ইজেল রঙ ছাড়াই, বাণীর বিন্যাসে তা তিনি দেখিয়েছেন। চাপা ঠোঁটের বিশাল মূর্ত চোখের কবি জীবনানন্দের রঙের রূপ ও স্বরূপ প্রদর্শন সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর দীক্ষা কি চিত্রকরদের কাছ থেকে কিছুই ছিল না ?

রঙের চাতুর্য সম্বন্ধে জ্ঞান, রঙের ভাবলক্ষণ সম্বন্ধে ধারণা ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যেও সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের বিরাট প্রেক্ষাপটে রাগরাগিণীর যে চিত্রাবলী অঙ্কিত হয়েছে সেখানে রঙের বাহার ও ব্যঞ্জনা দুই-ই তুল্যমূল্য লাভ করেছে। রঙের ধারণায় সুরের স্বভাব নির্দেশ করার এই রীতি অতি চমৎকার। রাজপুত, দিল্লী, কাংড়া চিত্রাবলীর বর্ণারোপ সচেতনভাবে রঙের নির্দিষ্ট অর্থকে খোঁজ করেছে। সুন্দরের সৃষ্টিতে রঙের ঐ অর্থগুলিকে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছে যাতে কালাতিশয়ী বিস্তৃতি লাভ করতে চিত্রগুলি সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় দেবদেবী মূর্তির পরিকল্পনায় বর্ণের ব্যবহার নির্বোধ প্রয়োজনে ঘটে নি। সেখানেও আছে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতি ভাবনা, পবিত্রতার ভাবনা, মহিমা ও অনন্ততার ভাবনা। দশমহাবিদ্যার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় দশ দেবীমূর্তির দশ বর্ণবিভেদ তারই উচ্চাঙ্গিক প্রমাণ। শাক্তদের পূজাঞ্জলিতে রক্তপুষ্পের অন্বেষণ যে আবেদনের ব্যাখ্যা করে সেখানেও বর্ণের প্রতি বিশেষ দার্শনিকতা ও বক্তব্য কাজ করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণপ্রক্ষেপনের আগ্রহ 'কাদম্বরী'র কবির মধ্যে বিশেষভাবে আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'কাদম্বরী চিত্র' নামক প্রবন্ধটি স্মরণীয়। রঙ ফলাতে 'কাদম্বরী'র কবির কত আনন্দ তার উদাহরণ—

রবীন্দ্রনাথের ভাবান্তর অনুযায়ী—

"একদিন আকাশ যখন প্রভাতসন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর মতো রক্তবর্ণ পক্ষপুটশালী বৃদ্ধ হংসের ন্যায় মন্দাকিনীপুলিন হইতে পশ্চিমসমুদ্রতটে অবতরণ করিতেছেন, দিকচক্রবালে বৃদ্ধ রঙ্কুমৃগের মতো একটি পাণ্ডুতা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইয়াছে ; আর গজরুধিররক্ত সিংহজটার লোমের ন্যায় লোহিত এবং ঈষৎ তপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্যরশ্মিগুলি ঠিক যেন পদ্মরাগশলাকার সম্মার্জনীর ন্যায় গগনকুট্টিম হইতে নক্ষত্রপুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।"[১]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—"রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ ভাবের রঙ আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের কী রঙ শুধু সেই বর্ণনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে।"[২] জীবনানন্দের কাব্যেও আছে ভাবের রঙ এবং কবিত্বের রঙ। তাঁর কাব্যে রঙের কবিত্ব নিঃশব্দে বহন করেছে তাঁর নিভৃত হৃদয়ের অংশ।

জীবনানন্দ নিছক প্রি-র‍্যাফালাইট—ইমপ্রেশনিস্ট নন, তিনি সহজার্থে ভারতীয় ঐতিহ্যেরও আধুনিক সন্তান।

২

জীবনানন্দ বর্ণঅন্বেষী ও বর্ণবিশ্বাসী কবি। তিনি রঙ খোঁজেন না, সহজেই রঙ দেখতে পান। আবার যেখানে সত্যই রঙ খুঁজেছেন সেখানে তাঁর প্রাপ্তির বৈচিত্র্য এমনই বিশিষ্টতায় লগ্ন যার সমান্তরাল উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে নেই। কবিতাকে রঙের ধারায় কত অবলীলায় তিনি স্নান করান তার চকিত নমুনা মহাপৃথিবী কাব্যের 'শব' কবিতাটি—

যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর,
যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর ;
যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে-খুঁটে খায়
সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায় ;

১ পৃ ৬৬, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬৬।
২ পৃ ৬৬-৬৭, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬৬।

নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হ'য়ে আছে চুপ
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ ;
কান্তারের একপাশে যে-নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে-শুয়ে দেখিছে কেবল
বিকেলের লাল মেঘ ; নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ; কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে ছাখো যদি ;
অন্য সব আলো তার অন্ধকার এখানে ফুরালো ;
লাল নীল মাছ মেঘ— ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন ; নীল লাল রূপালি নীরব।

এ কবিতায় এত রঙ কেন ? যেখানে 'মৃণালিনী ঘোষালের শব' চিরদিন ভাসছে সেখানে মৃত্যু, দুর্গন্ধ, শ্মশান-পরিবেশ, হতাশা, সেখানে ধূসরতার জটিলতা দ্রষ্টব্য না হয়ে, লাল নীল রূপালি সোনালির সমারোহে রঙের বিন্যাস করে কবি কোন্ মনোভাব প্রকাশ করেছেন ? বুদ্ধিজীবীরা দেখবেন রঙের তৃষ্ণা এখানে সমগ্র চেতনায় ব্যাপ্ত। মনে পড়বে বিদেশী শিল্পী মিলাসের 'ওফেলিয়া'র ছবি—শায়িত প্রকৃতির নিবিড়তার মধ্যে।[১] কবি জীবনানন্দ তুলি নিয়ে নয়, লেখনী নির্ভরতায় রঙ ছড়িয়েছেন মৃণালিনী ঘোষালের শবের পরিবেশে। শবের পরিবেশে এত রঙ কেন ? মৃণালিনী ঘোষালই বা কে ? লক্ষণীয় 'মৃণালিনী' শব্দটিতেও রঙের ঝংকার ফুটেছে। জনৈক আলোচক বলেছেন—"কোনো এক সন্ধ্যায় জলের উপর মূর্ছিত শ্বেতপদ্ম মৃণালিনী ঘোষালের শবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।"[২] মহাপৃথিবী মৃত্যুচিন্তার কাব্য। মৃত্যুর কাব্যে রঙের ঝর্ণা নির্বাক হবে, স্বভাবত ও ঔচিত্যসম্মত। তবু 'শব' কবিতায় রঙের আয়োজন কবিমানসিকতার ইঙ্গিতে ভরা বলেই মনে হয়। অন্যদিকে যে সব স্নিগ্ধ, বিশ্বাসী, অমল, প্রশান্ত, স্মৃতিসুন্দর, আত্মআস্বাদময় কবিতা লিখেছেন রূপসী বাংলা কাব্যে সেখানেও ধূসরতার রাজ্য নয়, সেখানে সোনালি সাদা নীল সবুজের সমাবেশ স্বতঃলক্ষিত। কবির দেখার ঐশ্বর্য ফলে উঠেছে রঙের ফসলে। যেমন—

১ P. 477, The Outline of Art, William Orpen, 1964.

২ পৃ ২৩৩, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৯.

"দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে
সূর্যের রাঙা ঘোড়া : পক্ষিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে
রাতের কুয়াশা ছিঁড়ে, দেখেছি শরের বনে শাদা রাজহাঁসদের সাধ
উঠেছে আনন্দে জেগে—নদীর স্রোতের দিকে বাতাসের মতন অবাধ
চ'লে গেছে কলরবে ; দেখেছি সবুজ ঘাস—যত দূর চোখ যেতে পারে :
ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিয়াছি অবিরল,—পৃথিবীর ক্লান্ত বেদনারে
ঢেকে আছে ;"

অথবা অন্য একটি কবিতায়—

"ভালো বাসিয়াছি আমি রাঙা রোদ ক্ষান্ত কার্তিকের মাঠে—ঘাসের আঁচলে
ফড়িঙের মতো আমি বেড়ায়েছি ;—দেখেছি কিশোরী এসে হলুদ করবী
ছিঁড়ে নেয়—বুকে তার লাল-পেড়ে ভিজে শাড়ি করুণ শঙ্খের মতো ছবি
ফুটাতেছে ;—ভোরের আকাশখানা রাজহাঁস ভরে গেছে নব কোলাহলে
নব নব সূচনায় ; নদীর গোলাপী ঢেউ কথা বলে—তবু কথা বলে,
তবু জানি তার কথা কুয়াশায় ফুরায় না—কেউ যেন শুনিতেছে সবি
কোন্ রাঙা শাটিনের মেঘে ব'সে—"

রূপসী বাংলার পৃষ্ঠা অনুধাবন সার্থক। কত অদ্ভুত অচিন্তপূর্ব রঙের দেখাই না এখানে মেলে! শালিখের খয়েরী ডানা, তার ধবল রোমের নিচে হলুদ ঠ্যাং। খই রঙা হাঁস, তমালের নীল ছায়া, লাল লাল বটের ফল, ভেরেণ্ডা ফুলের নীল ভোমরা, হলুদ-বোঁটা শেফালি, শ্যাওলার মলিন সবুজ, হলুদ বাদামী পাতা, সকাল সন্ধ্যার নীল ধোঁয়া, পুকুরের লাল সর, শ্যাওলায় নীল ভাঙা মঠ, শাদা ভাঁট ফুলের তোড়া, রূপালি মাছের কণ্ঠ, জামের গভীর পাতামাখা শান্ত নীল জল, সোনালি চিল, কড়ির মতন শাদা হয়ে থাকা দূরের পাহাড়, সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু, ধানী শ্যামাপোকা, বাদুড়ের কালো ডানা, বৃষ্টির রূপালি জল, ঘিয়ের সোনার দীপে লাল নীল শিখা, নদীর গোলাপী ঢেউ, হলুদ করবী, নীল লাল কমলা রঙের ডানা মাছরাঙাটির, সবুজ বাঁশের বন, ঝিঁঝির সবুজ মাংস, শিশিরের নীল জল—এ সবই রূপসী বাংলার রূপপরিচয়ের প্রকাশ চেষ্টায় আশ্চর্য কাব্যশরীর লাভ করেছে। আকাশের আলোর দিকে তাকিয়ে বাংলার কবি আরো উজ্জ্বল বর্ণিমা চয়ন করেছেন এবং নিবেদন করেছেন স্বচ্ছন্দে। 'কোথায় আকাশ অপরাজিতার মতো নীল হয়ে—নীল হয়ে—আরো নীল হয়ে' চলে গেছে তা কবি দেখতে চান। আর কত রঙবেরঙের মেঘ—কামরাঙা লাল মেঘ, ভোরের সিঁদুর মেঘ, রাঙা সাটিনের মেঘ। সেখানে আছে রাঙা

রোদের ডাক। সেখানে নক্ষত্র আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে ডুবে যায়। কখনো দেখা দেয় কালো মেঘ মাঘের আকাশে, কখনো সোনার রোদ নিভতে থাকে। সে আকাশ থেকে নাটার মতন রাঙা মেঘ নিঙড়ে নিয়ে একদল দাঁড়কাক সন্ধ্যার আকাশ দু' মুহূর্ত ভরে রাখে। রাত্রের আকাশে নক্ষত্রের নীল ফুল ফুটে থাকে, অপরাহ্নের রাঙা রোদ সবুজ আতায় নরম হাত রাখে। এমনি করে আকাশবিভোর কবি আলো মেঘ বাতাস জ্যোৎস্নার রঙ নিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন নীল বাংলার তীরকে, গৌরী বাংলাকে। এখানে সাদা রঙেরই বা কত কারিগরি—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে শঙ্খের মতো কাঁদে, হিজলের পাতা শাদা উঠানের গায়, শাদা শুন ঝরে করবীর, শাদা শাদা যেন কড়ি শঙ্খের পাহাড়, রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে দেখিবে ধবল বক, বাসমতী চালে ভেজা শাদা হাতখান, এমন বিজন শাদা পথ—সোঁদা পথ, ম্লান শাদা ধুলো, নীলাভ আকাশ জুড়ে শজিনার ফুল ফুটে থাকে হিম শাদা —রঙ তার আশ্বিনের আলোর মতন, কড়ির মতন শাদা হাতের রূপ, ধর সন্ধ্যাবাতি থোড়ের মতন শাদা ভিজে হাতে, চড়ায়ের শাদা ডিম ভেঙে আছে —এই সব সাদা যে ভাবে আপনাকে হাজির করেছে, যে ভাবে আপন কথা বলেছে তা সাহিত্যে অনাস্বাদিতপূর্ব, অজ্ঞানিতপূর্ব। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পদ্মের সাদায় আমরা ছিলাম মগ্ন। পদ্মের সাদা হৃদয়ে মনে দৃষ্টিতে নিয়ে তাকে মঙ্গল ও শুদ্ধতার প্রতীকমূল্য আমরা দান করেছি। জীবনানন্দের সাদা রঙের আয়োজন সার্থক, এ রঙে তাঁর আবেগ স্ফুটতর, তাঁর সৌন্দর্যাভিসার প্রশংসনীয়। এখন থেকে আমাদের সাদা রঙ ব্যবহারের শিক্ষা নেওয়া উচিত। সাদা রঙের এমন ঐতিহ্য তিনি তাঁর সারা সৃষ্টিতে আরো রেখে গেছেন যার অনুসরণ বাংলার আগামী কাব্যকে রূপবতী করতে পারে নবীন বর্ণচারুত্বে। 'বাসমতী চালে-ভেজা শাদা হাতখানা'র স্মৃতি কি বাংলাদেশ কোনো দিন ভুলতে পারবে? এবং ভুলতে পারবে না বলেই বাংলা কবিতা জীবনানন্দের শিক্ষার গুণে হবে রঙে উজ্জীবিত।

সত্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে রূপসী বাংলায় ধূসরতার মলিনতার অন্ধকারের আয়োজন স্বল্প নয়। কিন্তু জীবনানন্দ রূপসী বাংলার নীল অবয়বে আবিষ্ট হয়ে কতখানি যে সুস্থ তার সংবাদ ধরা পড়েছে অগুবিধ বর্ণবিন্যাসে, সে সত্য গ্রহণ করলেই জীবনানন্দের প্রতি সু ও সমগ্র বিচার করা হবে।

বনলতা সেন আমাদেরও প্রিয়া। বনলতা সেনের কবিও হৃদয়জয়ী, কালজয়ী। এর কবিতায় রঙগুলিকে দেখুন—হৃদয় ভরে যাবে। রঙের

থেকে রঙে বিহার করতে করতে রঙের উল্লাসে আলোড়িত হতে থাকবে বিস্ময়, আনন্দ, মুগ্ধতা আর তৃপ্তি। নীল আর সবুজের কাব্য বনলতা সেন। যেমন নীল লালের কাব্য ঝরা পালক, যেমন নীলিমার কাব্য সাতটি তারার তিমির। হাওয়ার রাত, আমি যদি হতাম, শঙ্খমালা, নগ্ন নির্জন হাত, শিকার, হরিণেরা, দুজনে, আমাকে তুমি, সুরঞ্জনা, আবহমান প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতায় যে রঙ আসন অধিকার করে আবির্ভূত তারা প্রধানত ধূসরতার জগৎ থেকে আসে নি। শ্যামলী আর সুরঞ্জনা নাম দুটিতে বর্ণপ্রেমিক কবির কৃতিত্ব নামপ্রেমে আবির্ভূত। বনলতা নামটির সৌন্দর্যেও কি শ্যামলিমার আভাস নেই? মধুসূদন পয়ারের বেড়ি ভেঙেও চরণান্তিক মিল হরণ করেও পাঠকের শ্রবণেন্দ্রিয় নন্দিত করবার জন্য চরণের মধ্যেই আয়োজন করেছিলেন অনুপ্রাস যমকের। রবীন্দ্রনাথের অবারণ ছন্দ পরিক্রমায় নন্দিত অভিজ্ঞতা নিয়ে পাঠক অগ্রসর হতে হতে ভাবের জগতে পৌঁছে যায় এবং আনন্দিত হয়। জীবনানন্দের ভাব জগৎ গভীর ও সান্দ্র, গোপন ও ধূর্ত, এলোমেলো ও অস্পষ্টবাক্। প্রাথমিক বিভ্রান্ত পাঠকের মন কিন্তু রঞ্জিত হতে পারে কাব্যের চরণে চরণে মুদ্রিত বর্ণের বাহারে। তাঁর কাব্যে ছন্দ ও শব্দের শৈথিল্য যতই থাক, বর্ণের শৈথিল্যে তিনি নিন্দনীয় নন। জীবনানন্দ কঠিন কবিতাকেও তাই সাজিয়েছেন প্রতুল অপ্রতুল রঙে। বনলতা সেন কাব্যের পরিসর স্বল্প কিন্তু বর্ণের পটভূমিকা সীমিত নয়। ক্ষুদ্র একটি কবিতা 'ঘাস'—সেখানে শুনি—

> কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
> পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
> কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
> হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
> আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
> গেলাসে গেলাসে পান করি।

রঙকে সঠিকভাবে ধরবার জন্য কী আনন্দিত প্রয়াস ও অপূর্ব সিদ্ধি তা জোর করে দেখিয়ে দিতে হয় না।

সাতটি তারার তিমির ও বেলা অবেলা কালবেলা কাব্য দুটি মূলত বুদ্ধিপ্রধান কাব্য। কাব্য দুটির ভাবার্থেও কবি নাগরিক। কিন্তু কাব্য দুটি সম্বন্ধেও আমাদের সংশয় দূর হয়, যখন দেখি জীবনানন্দ এ কাব্য দুটিতেও

অনবদ্য বর্ণ শিল্পীরূপে অপরিবর্তিত রয়েছেন। বুদ্ধির নৈরাজ্য তাঁকে বর্ণবিমুখ করে নি, করেছে অনেক বেশী বর্ণ রোমান্টিক।

সাতটি তারার তিমির কাব্যের কবি বসুন্ধরামুখী নয়, কাব্যটির নামের সামঞ্জস্য রেখে অনেক বেশী আকাশ-উন্মুখী। অগাধ নীলিমার কাব্য এই সাতটি তারার তিমির। কাব্যটির মধ্যে নীলিমা সাধারণ ও অসাধারণ রঙ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক নিগূঢ় বক্তব্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে রঙের নিজস্ব দায়িত্বে। নীল বা শুভ্র বলতে আমরা যা বুঝি তাকেই গ্রহণ করা হয়েছে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা না করে। 'সমুদ্রের নীল মরুভূমি'তে রিক্ততার পটভূমি প্রস্তুত। 'অভিভাবিকা' কবিতায় কবি যখন বলেন 'নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই' অথবা 'স্থির-শুভ্র-নৈসর্গিক কথা' তখন রঙ দু'টি প্রতীকার্থে অন্য সামর্থ্য লাভ করে। 'জীবনের মতো নীল হয়ে', 'মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়', 'নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছুই নেই', 'আকাশের মত এক শুভ্রতায় নেমে', 'ফসলের দেশে সূর্য নিরন্তর হিরণ্ময়', 'তাই তারা চলে যায় শাদা নিঃসহায়' প্রভৃতি উক্তির মধ্যে রঙ সরাসরি নিজের ভাষায় কথা বলেছে। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা নামক সংকলন গ্রন্থে সঞ্চিত সাতটি তারার তিমির কাব্যপর্যায়ের কবিতাবলীর মধ্যেও ঐ একই প্রতীকবৃত্তির প্রকাশ। যথা 'মানুষের সব গুণ শান্ত নীলিমার মতো ভালো', 'শাদা কালো রঙ এসে কেবলি মিশছে অন্ধকারে।' যন্ত্র সভ্যতার শিকারী ষড়যন্ত্র আকাশপ্রেমিক কবিকে কতখানি ব্যথা দিয়েছে তার উদাহরণ—

বন্দর সব নীল সমুদ্রের পারে পারে
মানুষ ও মেসিনের যৌথ শক্তিবলে
নীলিমাকে আটকেছে ইঁদুরের কলে। (এইখানে সূর্যের)

আলোচ্য কাব্যে ধবল বাতাস আছে, নটকান-রক্তিম রৌদ্র আছে, সোনালি সিংহ আছে। আছে বেলোয়ারি রোদ, জাফরান আলো, খইয়ের রঙ, হেমন্তের হলুদ ফসল, জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জল, গাঢ় সাদা জোনাকি, সোনার বলের মতো সূর্য। এবং তারই পাশাপাশি 'নক্ষত্রের রূপালি আগুন-ভরা রাতে', 'সোনালি আগুন চুপে জলের ভিতরে', 'যেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের', 'টমাটোর মত লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়', প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি যখন শুনি তখন কবির প্রথিত মানসিকতার বর্ণাকাঙ্ক্ষার ভঙ্গি বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

বেলা অবেলা কালবেলা মিশ্র রঙের কাব্য। এ কাব্যে নীল রঙ বেশ চোখে পড়ে কিন্তু নীল রঙ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়। নীল, সোনালি, হলুদ,

ধূসর, সাদা, রূপালি, কালো, কমলা, সবুজ, খয়েরী প্রভৃতি রঙ এ কাব্যের ভাব প্রকাশে কাজে লেগেছে। শুভ্র কবির কাছে এখন স্পষ্টতই হয়ে উঠেছে বিশ্বাস, প্রীতি ও শান্তির রঙ। কবি তাই 'সময়ের তীরে' কবিতায় একই আগ্রহে বলেন—"যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা সকলের জন্ম"। তাই কবির কাছে সূর্য শুভ্র, 'জয়ী হয় শুক্ল রাতে গ্রামীণ উৎসব' এবং 'রৌদ্রশুভ্র সিন্ধুর উৎসব' সেই একই ইঙ্গিতের প্রতিধ্বনি। কবি এই একই প্রেরণায় বলেছেন—'চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ রয়ে গেছে'। কবি যখন বলেন 'ভাদ্রের জলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে পেয়েছি ধবল শব্দ বাতাসতাড়িত পাখিদের' তখনও একই অর্থদ্যোতনা কাজ করে। 'সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের বিবর্ণ সন্তান হয়েও যা কিছু শুভ্র রয়ে গেছে আজ'—উক্তিটির শুভ্র অর্থে মানবিক সত্য, আশা, আনন্দের খবর। কোথাও সাদা রঙ নীলিমায় রূপান্তরিত হয়েও একই বিশ্বাসকে, প্রতীকব্যঞ্জনাকে বিশেষিত করেছে। কবিব্যবহৃত নীল রঙেও আছে প্রেরণা উদ্দীপনা প্রাণনার বাণী। কবির দৃঢ় প্রতীতি জীবনের কালো রঙা মানে ফুরিয়ে যাবে, 'নীলিমার সফলতা' আসবে। রঙ এখানে চিন্তন মননের তাপ লেগে অনেক ধারালো, ঋজু, বুদ্ধিপ্রসারী। আলোচ্য কাব্যে প্রাকৃতিক রঙ থাকলেও অনেক সময় তা প্রাকৃতিক নয়। তবু যখনই কবি বিশুদ্ধ প্রকৃতিতে দৃষ্টি ফেলেছেন তখনই আগে রঙ এসে ছুঁয়েছে তাঁর দু'চোখ। উদাহরণত 'মানুষ যা চেয়েছিল' কবিতার প্রারম্ভিক চরণগুলিতে—

গোধূলির রঙ লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম;
খয়েরী শালিখগুলো খেলছে বাতাবী গাছে—তাদের পেটের শাদা রোম
সবুজ পাতার নীচে ঢাকা প'ড়ে একবার পলকেই বার হয়ে আসে,
হলুদ পাতার কোলে কেঁপে কেঁপে মুছে যায় সন্ধ্যার বাতাসে।

এই কবিতার ঠিক পূর্ববর্তী কবিতাটিও রঙে রঙে সাজতে চেয়েছে কবিতাটির 'মহাগোধূলি' নাম সার্থক করে।

এখন অন্বেষণ করা যাক সেই দুটি কাব্য যে কাব্য দুটির সাক্ষ্যে জীবনানন্দকে ধূসরতার কবি বলা হয়েছে। 'ঝরা পালক' তাঁর প্রথম কাব্য এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' দ্বিতীয়। কাব্য দুটির নামকরণে বিষণ্ণতার, বেদনার, দুঃখ দুঃসময়ের, নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের মনোভাব কাজ করেছে। ঝরা পালক নিঃসন্দেহে ধূসরস্বরূপ নাম। ধূসর পাণ্ডুলিপি নামে ধূসরতা তো স্পষ্ট উচ্চারিত। কিন্তু 'ঝরা পালক' কাব্যে প্রবেশ করলে দেখতে পাই যে কাব্যটি মূলত নীল ও লাল রঙের প্রাচুর্যবাহুল্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ধূসরতা

যে নেই তা নয়। 'উষর ধূসর মরু' আছে, আছে উষর ধূসর বালুকাপথ, নিভে যাওয়া প্রদীপের ধূসর ধোঁয়া। তারই শামিল হতে এসেছে পাণ্ডুর ঠোঁট, পাণ্ডুর বদন, ধূম্র মৌন সাঁঝ—ধূসরতার ইঙ্গিত নিয়ে। কিন্তু উদাহরণ স্বল্প, অত্যন্ত অল্প। কাব্যটিতে সত্যেন্দ্রনাথ ও বিশেষ করে নজরুলের প্রভাব অনায়াসলক্ষ্য। তাই লালিমা আর নীলিমার বাহার দিয়ে সর্বত্র কবিতাকে সাজানোর চেষ্টা। সেই চেষ্টার পাশাপাশি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাদা রঙের চারু আবির্ভাবও ঘটেছে। কমনীয়, সুন্দর, মনোগ্রাহী, উজ্জ্বল, সপ্রাণ বর্ণচয়নের নিপুণতা এই উদাহরণগুলিতে আছে—হিঙুল মেঘ, মৌন নীল, আরক্ত কঙ্কর, মধ্য নিশীথের নীল, স্ফটিক আলো, শঙ্খ শুভ্র মেঘ, রাঙা অশনি, ধবল কাশ, রক্তিম চন্দন, সুনীল দরিয়া, সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা, জৌলস রাঙা আঁখি, রাঙা নার্গিশ কালো পশমিনা চুলে, ডালিম ফুলের রক্তিম, লাল গাল, খুনরোশনাই প্রদীপ, গিরির গোধূলি রঙিন জটা, নীল বাতায়ন, চুনীর ঠোঁট, টুকটুকে মেঘ, নাসপাতি গাল, শেহালায় ঢাকা শ্যাম, চুম্বনশোণিমা, রূপালি রাত, আপেলের মত লাল গাল, গোধূলির মত গোলাপি রঙিন আঁখি, আকাশের ময়ূর নীলিমা, উলঙ্গ নীল তরঙ্গ, নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ, রক্ত জিভার চুমা, নীহার নীল সমুদ্র, মেঘরক্ত ময়ূখ, রক্তপীত সাগর, রাঙা অঙ্গারমালা, নীলিমার আনন রুধির লাল, নারাঙ্গি ফাটা অধর, নীল মাছি, বকের পাখার মতো শাদা লঘু মেঘ, শ্বেত শঙ্খ ঝিনুক। প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যকলার রীতি অনুসরণ করে তিনি কোন্ রঙের আলিপনা রচনা করেছেন তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য স্ববৈশিষ্ট্যের চিহ্নও এখানে ফুটেছে। যথা—চূণ চোখে চেয়েছিল চাঁদ, বক বধূটির মতো কুয়াশার সাদা ডানা, তরুণীর দুধ ধবধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে, আমারে ডাকিয়া ছিল আলেয়ার লাল মাঠ, সন্ধ্যা ভোরের নটকান রাঙা মেঘে, অনন্তের শুক্র অন্তঃপুরে। 'যে কামনা নিয়ে' নামক কবিতায় কবি স্বীয় কণ্ঠে রঙের উল্লাস উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন—'রঙের মাঝারে হেরি রঙভুরি', বলেছেন 'পিয়াল চুমিয়া পিলাই গো রাঙা পিয়ালার মধু', বলেছেন—'আমি গো লালিমা, গোধূলির সীমা বাতাসের লালা ফুল'।

'ঝরা পালক' কাব্যে সাদা রঙ বেশি আসে নি, ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যে লক্ষণীয় ভাবে বেশি এসেছে; হলুদও এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি, লালও কম নয়। মধুর মর্যাদায় শ্বেতবর্ণের প্রাধান্য দিয়ে 'পরস্পর, নামক কবিতাটি রচিত হয়েছে, যেমন 'জীবন' কবিতাটি রচিত হয়েছে সবুজ হলুদ আর

পাণ্ডুরতার বিন্যাসে। উজ্জ্বল ও প্রবল রঙের তৃষ্ণাও এখানে বেশি। মাছরাঙা ও প্রজাপতির প্রতি আকর্ষণ সেই জন্য। নীল ডিম, রঙিন কীট, রাইসর্ষের ক্ষেত, সবুজ ফসল, লাল আলো, ধানের সোনার ছড়, উজ্জ্বল বিশাল রোদ, মশালের আগুন সেই আকর্ষণকেই বহুগুণিত করেছে। নীল রঙ কী অদ্ভুত ভাবে কথা কয়ে উঠেছে এই পঙ্‌ক্তিটিতে—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে'। সবুজ রঙের ভাবাধিকার 'জীবন সবুজ হয়ে ফলে' বা 'জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল' বা 'তখন সবুজ এই পৃথিবীরে ভালোলাগে' প্রভৃতি উক্তিতে। রঙ থেকে রঙে যাত্রা—'শাদা হাতে ধবধবে স্তন রেখেছে সে ঢেকে', 'জল মেয়েদের স্তন ঠাণ্ডা শাদা বরফের কুচির মতন', 'বাদামি সোনালি-শাদা—ফুটফুট ডানার ভিতরে', 'ঘুঘুদের শাদা ডানা—নীলরাত্রি—কমলা রঙের মেঘ সমুদ্রের ফেনা রোদ', 'বাদামি সোনালি-নীল রোম তার', 'একপাল মাঝরাঙা নদীর বুকের রামধনু' প্রভৃতি পর্ব বা চরণের মধ্যে ঘটেছে। এমনি অনেক গভীর রঙে ভরে আছে ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্য। ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যটি ভাবার্থেও সর্বত্র ধূসর নয়। অবসরের গান, পিপাসার গান, মৃত্যুর আগে, বৈতরণী নামক কবিতাগুলি প্রদীপ্ত জীবনছন্দকে নিবিড় আবেগে বাজিয়েছে।

৩

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবনানন্দের কবিতা 'চিত্ররূপময়'। কি ভাবে কবিতার পর কবিতা, কাব্যের পর কাব্য চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে সে-বিষয়ে আলোচনার পর আমাদের দেখতে হবে জীবনানন্দের কাব্যে ধূসরতার পরিমণ্ডল কি ভাবে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। হেমন্ত ঋতুর রূপকার জীবনানন্দ হলুদ, সোনালি ও ধূসর এই তিনটি রঙকে কাব্যের চিত্রপ্রলেপে বিশেষভাবে আমদানী করেছেন। হলুদ পাতা, ডানা, আলো এবং সোনালি ডানা, আলো, শস্য তাঁর কাব্যে পুনঃপুনঃ স্মরণীয়। হলুদ বা সোনালি রঙের নির্দেশ কি? ভান্‌ গখ্‌ তাঁর বন্ধু গগ্যাঁকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য নিজের ঘরখানিকে হলুদ রঙে চিত্রিত করেছিলেন, কারণ 'To his eyes yellow was a symbol of life'.[১] হেমন্তের কাব্যকার জীবনানন্দ হলুদ সোনালিতে জীবনেরই মানে খুঁজে পেয়েছিলেন। জীবনানন্দের ধূসরতার ভাবার্থ কি তাও আমাদের জানতে হবে। তাঁর ধূসরতার আমেজ ছড়িয়ে আছে হিম শাদা, ধোঁয়ার রঙ, কুয়াশা,

১ P. 16, Great Painters and Great Paintings, 1965.

ফিকে জ্যোৎস্নার রঙ, পাণ্ডুর মুখ প্রভৃতিতে। তাঁর ধূসরতা কেমন বিচিত্র তার পরিচয় নিলে দেখা যাবে সেখানেও কাজ করেছে অতি নিপুণ, অতি প্রখর বর্ণচেতনা। বাংলা কাব্য জগতের প্রত্যকমূর্তি জীবনানন্দ ধূসরতার প্রতীকে বলতে চেয়েছেন যুগসম্ভব বিশেষ অর্থ, ব্যক্তিত্বসঞ্জাত বিশেষ বাণী। তাঁর ধূসরতা এই রকম—উষর ধূসর বালুকা-পথটি বেয়ে, উষর ধূসর মরু গিরিপথ, ধূসর মৃত্যুর মুখ, ধূসর স্বপ্নের দেশে, গোলাপী ধূসর মেঘ, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখ, পেঁচার ধূসর পাখা, সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ, অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি, বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তির মতো, নেউল-ধূসর নদী, আকীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি, যে সব ধূসর হাসি, ধূসর মেঘের মত, তাহার ধূসর ঘোড়া, মাথার সকল চুল হয়ে যায় ধূসর ধূসরতম শণ, ধূসর বাতাস খেয়ে, উঁচু গাছের ধূসর হাড়ে, গণনাহীন ধূসর দেয়ালে, ধূসরিম মহিলার নিকটে সন্নত, বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে, শঙ্খবালিকার ধূসর রূপের কথা, কড়ির মতন ধূসর হাতের রূপ, ধূসর শাড়ীর ক্ষীণ স্বর, ধূসর আলোয় বসে কতদিন, দেখেছিল ধূসর বকের সাথে। এই উদাহরণগুলি তাঁর সারা কাব্যে ছড়ানো আছে। উদাহরণগুলি শ্রবণ করে বলা যায় না যে—"জীবনানন্দের কবিকল্পনার প্রধান রঙ ধূসরতা,—জীবনের অচরিতার্থতার ব্যর্থতার ক্লান্তির অবসন্নতার মৃত্যুর রঙ।"[১] আমাদের অযত্নচয়িত উদ্ধৃতিগুলিতে কেবলই কি মৃত্যুর কথা, অচরিতার্থতার কথা? তাঁর কাব্যে ধূসরতা হয়তো সত্য কিন্তু শেষ সত্য নয়। ধূসরতারও কত প্রকার, কত নিপুণ বৈচিত্র্য। নেউল-ধূসর আর, আতার ধূসর ক্ষীর যখন পড়ি তখন সহজেই বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো বুঝতে পারি কবি ধূসরতার সৌন্দর্য অন্বেষণ করছেন। মন্দিরের ধূসর কপাটে সেই সৌন্দর্য, কড়ির মতো ধূসর হাতে সেই সৌন্দর্য। জীবনানন্দ ধূসরতার নয়, বলা যায় ধূসরিমার কবি।

আমাদের আলোচনা এ কথা প্রমাণ করে যে ধূসরতার জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা নয়, কবির আকাঙ্ক্ষা উজ্জ্বল, প্রস্ফুট, নিবিড়, বিশাল, প্রবল, কল্পনাসুন্দর, বৈপরীত্যবিচিত্র, চারু আবেগে আয়োজিত রঙের প্রতি। যা আছে তার ভাষায় সব সময় কবির পরিচয় নয়, যা আকাঙ্ক্ষা করেন সৃজন করেন চয়নও ভিক্ষা করেন, তার পরিচয়ে কবির পরিচয়। 'জীবনানন্দ ধূসরতার কবি'

১ পৃ ৩৭৫, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪ খণ্ড, সুকুমার সেন, ১৯৬০।

আখ্যাটির মধ্যে পরিচিতির সমগ্রতা নেই, 'জীবনানন্দ বর্ণসচেতন কবি' সূত্রটিই তাঁর প্রতিভা ও সৃষ্টির মূল্যায়নের প্রকৃত সূত্র। যে বর্ণ তিনি এনেছেন, এনেছেন কবির মতো, কারণ সেই সব বর্ণের "হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা" (জীবনানন্দের নিজের ভাষা) আছে। সংস্কৃত আলংকারিকেরা বৃহৎ কাব্যের একটি শ্লোক বিশ্লেষণ করেই সমগ্র কাব্যকে বুঝতেন জানতেন কবির সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন সিদ্ধান্ত নিতেন। সে রকম বিশ্লেষণও নিরর্থক নয়। কারণ সার্থক কবিতার বিশেষ নির্বিশেষ অংশও কবিতা। জীবনানন্দ-কাব্যের বর্ণ উপাদানের আলোচনা কাব্যকর্তন নয়, কাব্যাস্বাদের চরিত্রে একান্ত। জীবনানন্দ সম্বন্ধে এই ধরনের অন্যান্য দিগ্‌দর্শক আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। চিত্রশিল্পীদের ভাবনাপ্রভাবে ও সরাসরি সাহিত্যরচনে যেমন ইংরেজী সাহিত্যে প্রি-র‍্যাফেলাইট যুগ সৃষ্টি হয়েছে, ফরাসী সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে সুররিয়ালিস্ট যুগ, তেমন কোনো চিত্র-প্রভাবিত যুগ বাংলা সাহিত্যে কোনো দিনই আসে নি। বাংলাদেশের নিজস্ব চিত্রশিল্প কাব্যসাহিত্যকে কোনো দিনই প্রভাবিত করতে পারে নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক পুনর্জাগরণ বাংলার নিজস্ব চিত্রকলাকে প্রভাবিত করেছিল, তাই অবনীন্দ্রনাথ-যামিনীরায়-নন্দলাল সম্ভব হয়েছেন, কিন্তু উল্টোটা ঘটে নি। জীবনানন্দ চিত্রের কাছ থেকে যে শিক্ষা নিয়েছেন, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হলে বাংলা কাব্য, আশা করি, অস্থির হবে না, অপটু হবে না।

ছন্দকুশলী জীবনানন্দ

নীলরতন সেন

কবিকে বুঝবার ব্যাপারে তার কবিতার ছন্দ আলোচনার আবশ্যকতা কতটুকু, সঙ্গতভাবেই পাঠক সে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কৈফিয়তস্বরূপ ছন্দোজিজ্ঞাসু সমালোচক বলবেন, কবিতামাত্রেই যখন কোনো না কোনো ছন্দোবন্ধন থাকে এবং পাঠক যখন সেই বন্ধন মেনে নিয়ে কবিতা পাঠ করলে তার ভাব ও ধ্বনিস্পন্দনের মাধুর্য ধরতে সক্ষম হন, সেখানেই কবিতাপাঠে ছন্দবোধের আবশ্যকতা স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। কবিতার ছন্দ মানেই হল, উচ্চারণে ধ্বনি ও যতির আবর্তন। এই আবর্তন আবৃত্তিকারকের মনে কোথায় থামতে হবে, রুদ্ধদল (closed syllable) বা মুক্তদলের (open syllable) উচ্চারণে কোথায় কতটা সময় দিতে হবে তার একটা প্রত্যাশিত নিয়মবোধ মনে জাগিয়ে তোলে। কবি যখন কবিতা লেখেন তিনি এই ধরনের কোনো ধ্বনি ও যতির আবর্তন সৃষ্টি করেন ; পাঠক যখন এই আবর্তন রহস্যটি আবিষ্কার করে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারেন তখন একদিকে যেমন রহস্য আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করেন, অপর দিকে কবিতার ভাবও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। একটি ভাষায়, বিশেষ করে মাতৃভাষায়, নির্ভুল বাক্য ব্যবহারে যেমন বক্তার পক্ষে ওই ভাষার ব্যাকরণ নিয়মগুলি কণ্ঠস্থ করবার দরকার করে না, অভ্যাসের বশেই নির্ভুলভাবে বাক্যের কর্তা কর্ম ইত্যাদি পদবিন্যাস করে থাকেন, যেখানে প্রয়োজন কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি যতি দিয়ে থাকেন, অনুরূপভাবেই কবি ও তার কবিতার পাঠক নিছক কানের সচেতন ধ্বনিবোধের সাহায্যেই নির্ভুল ছন্দে কবিতা লিখতে ও পড়তে অভ্যস্ত হন। ভাল গায়কদের পক্ষেও একই কথা প্রযোজ্য। এদের যথেষ্ট ছন্দবোধ আছে, তবে ছন্দ বৈয়াকরণ নন। বৈয়াকরণ অর্থাৎ ছান্দসিক যখন ওই উপলব্ধ উচ্চারণ ও যতির আবর্তনকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিত্তিতে সূত্রবদ্ধ করেন, কৌতূহলী কবি ও আবৃত্তিকার তাদেরই অনুসৃত ছন্দের বিশ্লেষণটি খুঁজে পেয়ে আরও খুশি হয়ে ওঠেন।

এ-যুগে কবিদের ছন্দবোধ প্রাচীন বা মধ্যযুগের কবিদের তুলনায় সূক্ষ্মতর হয়েছে কি না সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও, তাঁরা যে অনেকে

uniform এবং standardised একটি নীতি নিয়মের দ্বারা চালিত হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। যে-যুগে ছাপাখানার প্রচলন হয় নি, কবি বা কথক নিজেরাই শ্রোতাদের কবিতা পড়ে শোনাতেন।· রামায়ণ পাঠের আসরে যে পাঠের আভাস এখনও শ্রোতারা কিছুটা পেতে পারেন। তখন সুর করে পড়া হত বলেই প্রয়োজনমতো কিছুটা সংকুচিত উচ্চারণে বা প্রসারিত উচ্চারণে মাত্রা সমতা রাখা হত। কবির লেখাতে দু'একটি মাত্রার কমবেশীতে তেমন এসে যেত না। ছাপাখানা প্রবর্তনের পর কবিতা ছাপা বইরূপে প্রকাশিত হচ্ছে, পাঠক ঘরে বসে মনে মনে বা উচ্চকণ্ঠে পাঠ করছেন। কবি বা কথক সামনে বসে ছন্দের রিপুকর্ম করবার সুযোগ পাচ্ছেন না। প্রথম প্রথম হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনদেব পালিত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ কবিগণ গ্রন্থ ভূমিকায়, বা কবিতার শব্দ-বানানে পড়বার নিয়ম-নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর আস্তে আস্তে তিনচার প্রকৃতির standard-ছন্দ বাংলায় পরিণতি লাভ করেছে। সব কবিই সেই ছন্দের উচ্চারণভঙ্গি অনুসারে কবিতা লিখতে অভ্যস্ত হয়েছেন। তার মধ্যেও যখনই কোনো কবি নতুন কোনো ছন্দরীতি আনতে চেয়েছেন তাঁকে যথাসম্ভব বক্তব্য স্পষ্ট করতে হয়েছে। অক্ষরবৃত্তে blank-verse বা অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন করবার সময় মধুসূদনকে অনেকভাবে পড়বার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল। স্বরবৃত্তে সংহত উচ্চারণ চালু করতে দ্বিজেন্দ্রলালও 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় কৈফিয়ত দিয়েছেন, নতুন ঢঙে পড়বার নিয়ম বুঝিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্তের আধুনিক উচ্চারণ বোঝাতে, মুক্তকের এবং গদ্য কবিতার ছন্দোমুক্তি বোঝাতে কম পরিশ্রম করেন নি। গত পঞ্চাশ বছর ধরে ছান্দসিকরাও কবি ও পাঠককে standard বাংলা ছন্দ-প্রকৃতি বিষয়ে যথাসম্ভব অবহিত করতে চেষ্টা করেছেন।

এই কবি ও ছান্দসিকদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা ছন্দের মুখ্য তিনটি উচ্চারণগত শ্রেণীবিন্যাস অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। গদ্য কবিতার ছন্দ সম্পর্কেও কিছুটা আমরা অবহিত হয়েছি। কিন্তু সেখানেও পরিভাষা ব্যবহারে এবং সূত্র নির্দেশে ছান্দসিকদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। জীবনানন্দের কবিতার ছন্দ আলোচনায় এখানে যে সূত্র ও পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সংক্ষেপে সেটা প্রথমেই পাঠককে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করি।

মুখ্য যে তিন প্রকৃতির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে বাংলা কবিতায় একটা উচ্চারণ সুনির্দিষ্টতা লাভ করেছে তাদের পরিচিত নাম হল: মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাদের নামকরণ

করেছেন যথাক্রমে ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান ও শ্বাসাঘাত প্রধান ঢঙের ছন্দ। একদা মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত নামের প্রবর্তক অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বর্তমানে এই তিন ছন্দোরীতিকে যথাক্রমে কলাবৃত্ত, মিশ্রকলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত নামে চিহ্নিত করেছেন। অন্যান্য ছান্দসিকদের ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত অপরিচিত পরিভাষাগুলির আর উল্লেখ করছি না। এ-প্রবন্ধে পরিচিত মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত নাম তিনটিই ব্যবহৃত হল। প্রবোধচন্দ্রের অনুসরণে syllable-কে দল এবং time unit ও syllabic unit-কে যথাক্রমে কলা মাত্রা ও দলমাত্রা নামে পরিচিত করা গেল। পাঠকের সুবিধার্থে এই তিন ছন্দোপ্রকৃতির ও গদ্য কবিতার ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম সূত্রাকারে বলে নিয়ে তারপর জীবনানন্দের ছন্দ আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে।

(ক) মাত্রাবৃত্ত: এখানে মুক্তদল বা open syllable-এর স্বাভাবিক উচ্চারণকালকে এক কলামাত্রা (time unit) ধরে নিয়ে রুদ্ধদল বা closed syllable-কে তার দ্বিগুণ সময় নিয়ে উচ্চারণ করা হয়। যেমন 'ছন্দ' শব্দটি এই পদ্ধতিতে উচ্চারণ করলে ছন্-রুদ্ধদল দুই কলামাত্রা এবং দ-মুক্তদল এক কলামাত্রা হিসাবে মোট তিন কলামাত্রা রূপে গণ্য হবে। সাধারণত চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার পর্ব বা যতি বিভাগ পাওয়া যায়। উদাহরণ অনাবশ্যক। চারমাত্রা পর্বে রচিত সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' কবিতাটা মনে করুন, পাঁচ মাত্রার পর্ব পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের মদনভস্মের পর (পঞ্চশরে দগ্ধ করে···) কবিতায়। ছয়মাত্রার বিখ্যাত কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' বা নজরুলের 'বিদ্রোহী'। রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' (বেলা যে পড়ে এল) সপ্তমাত্রিক (৩-৪ মাত্রার শব্দবিন্যাস) আট মাত্রার আবর্তনে আবার চার-চার মাত্রার যতি ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি ৮-৫ মাত্রা ভাগে লিখিত। সংস্কৃত 'জাতি ছন্দ' থেকে 'জয়দেবী' ও 'ব্রজবুলি' ছন্দ বিবর্তনের পথে এ-ছন্দ বাংলায় প্রবেশ লাভ করেছে বলেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ একে 'সংস্কৃত ভাঙা ছন্দ' বলেছেন। আধুনিক মাত্রাবৃত্তের প্রবর্তক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব কবিগণ ও বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তার পথ সহজ করে দিয়েছিলেন।

(খ) অক্ষরবৃত্ত: এখানে মাত্রাবৃত্তের মতই মুক্তদল এক কলারূপে গণ্য করা হয়। তবে রুদ্ধদল যুক্তাক্ষরে লেখা হলে সংশ্লিষ্ট এক কলা হিসাবে উচ্চারণ করা হয়; যুক্তাক্ষরে লেখা না হলে শব্দ শেষে দ্বিকলা, অন্যত্র কবির পছন্দমতো এক বা দ্বিকলা দুই উচ্চারণেই ব্যবহৃত হয়। যেমন 'বন্ধন' শব্দে 'বন্'

রুদ্ধদল 'দ্ব' যুক্তাক্ষরে লেখার ফলে এক কলা হিসেবে উচ্চারিত হবে, কিন্তু প্রান্তিক 'বন্'—রুদ্ধদল দ্বিকলারূপে গণ্য হবে। 'করছি' তা যুক্তাক্ষরে লেখার ফলে কবি ইচ্ছামতো দুই বা তিন কলা—দু রকমেই ব্যবহার করেন, কিন্তু 'খাচ্ছি' বা 'যাচ্ছি' যুক্তাক্ষর বানানে লেখার ফলে সর্বত্রই দ্বিকলা রূপে গণ্য হয়। এ-ছন্দে ৮, ১০ বা ৬ কলার জোড় মাত্রক দীর্ঘ যতির প্রাধান্য। লঘু যতিভাগেও বিজোড় মাত্রা স্বীকৃতি পায় না। পূর্ব ভারতের তিনটি মুখ্য আর্যভাষা বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে অক্ষরবৃত্ত সবেচয়ে জনপ্রিয় ছন্দ। বাংলার কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, কাশীদাস, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক অধিকাংশ কবিই এ-ছন্দের সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন। ছন্দোমুক্তির মুখ্য পরীক্ষাও এ ছন্দ অবলম্বনে ঘটেছে। জীবনানন্দ তিন রীতির ছন্দই অল্পস্বল্প ব্যবহার করলেও অক্ষরবৃত্ত তাঁর কবিতার মুখ্য ছন্দ বাহন হয়েছিল।

(গ) স্বরবৃত্ত: মাত্রাবৃত্তে বা অক্ষরবৃত্তে যেমন মাত্রা-একক হল কলা (time unit), এ-ছন্দে মূলত মাত্রা একক হল দল (syllabic unit)। প্রথম দিকে গ্রাম্য ছড়া, লোকগীত বা রামপ্রসাদী গানে এ-ছন্দের শিথিলবদ্ধ যে রূপটি মেলে তাতে প্রতি লঘুযতিভাগে কমবেশী চারটি দল এবং পর্বসূচনায় প্রস্বর লক্ষিত হয়। বোধহয় দলবিন্যাসে কিছু হেরফের ঘটলে ছয় কলার স্পন্দনে তার তাল রক্ষিত হত। এ-ছন্দকে আরও সংহত উচ্চারণে এবং অক্ষরবৃত্তের মতো আট, দশ, ছয় মাত্রার দীর্ঘ যতিভাগে ব্যবহার করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্রনাথও মুক্তক লিখতে গিয়ে এ ছন্দের অনেকটা সংহত উচ্চারণ এনেছেন। কবিতার ভাষায় কথ্য সংলাপী আমেজ ফোটাতে এ-ছন্দই সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছে বলে কবিও ছান্দসিকদের ধারণা। জীবনানন্দের কবিতায় এ-ছন্দের স্বল্প কিছু মৌলিক ব্যবহার লক্ষ করা যাবে।

গদ্য কবিতার ছন্দ প্রসঙ্গটিও এখানে সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভাল। এ-ছন্দে আঙ্গিক কলা বা দলের মাত্রাহিসাবে ছন্দের প্যাটার্নটি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে একই ধরনের বাক্য ব্যবহার, প্রচলিত বাক্যগঠন রীতির পরিবর্তন, বাক্ পর্বিক ছোট ছোট যতিবিভাগ, একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পৌনঃপুনিক ব্যবহার ধ্বনিগত অন্তর্মিল এ-ছন্দের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রতি বাক্ পর্বে এক বা দুই প্রস্বর রয়েছে কিনা সেটিও বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথ তার শেষ জীবনে এ-ছন্দের জনপ্রিয়তা দিলেন, পরে আধুনিক কবিরা এ-ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। জীবনানন্দ এই অনুসারকদের অন্যতম।

পঞ্চান্ন বছরের স্বল্পায়ু জীবনে জীবনানন্দের (১৮৯৯-১৯৫৪) প্রথম কবিতার বই বেরোয় উনত্রিশ বছর বয়সে। প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছাব্বিশ বৎসর ধরে লিখিত তাঁর কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা আটটি।[১] সব কবিতাগ্রন্থ এখন প্রাপ্য নয়। প্রাপ্ত ছয়খানি বই থেকে অনুমিত হয় তিনি তিনশতাধিক কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে ২৫০টির কিছু বেশী কবিতা পড়বার সুযোগ হয়েছে। বর্তমান আলোচনাটি তারই ভিত্তিতে রচিত।

মাত্রাবৃত্ত রীতি জীবনানন্দের কবিতায় কদাচিত ব্যবহৃত হয়েছে। 'মহাপৃথিবী'তে তিনটি (মনোবীজ, সূর্যসাগর তীরে, প্রার্থনা) এবং 'সাতটি তারার তিমির'-এ একটি (লঘুমুহূর্ত) এ পর্যন্ত চোখে পড়েছে। তার মধ্যেও আবার 'মনোবীজ' কবিতার শেষ স্তবকটি মাত্র মাত্রাবৃত্ত। মহাপৃথিবীর তিনটি কবিতাই ছয়মাত্রার পর্বভাগে লেখা। 'লঘু মুহূর্ত' কবিতাটি আট মাত্রার পদভাগে রচিত হয়েছে। সবগুলি কবিতাই অসমান মুক্তক পঙ্‌ক্তিতে লেখা, তবে লাইনে নানাধরনের মিল রয়েছে। এর মধ্যে 'লঘু মুহূর্ত' কবিতাতেই কবি যেন বহুলাংশে কথার স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পেরেছেন। ছন্দযতি ও ভাবযতির প্রয়োজনমতো কিছুটা পৃথক অস্তিত্ব দিয়েছেন, প্রয়োজনে আমাদের কেতাবী মাত্রানিরূপণের হিসাবকে কাটিয়ে গিয়েছেন, অথচ ছন্দ পঙ্গু হয় নি। যেমন,—

এখন দিনের শেষে ॥ তিনজন। আধো আইবুড়ো ভিখিরীর ॥
অত্যন্ত প্রশান্ত হলো মন ; I
ধূসর বাতাস খেয়ে ॥ একগাল—। রাস্তার পাশে ॥
ধূসর বাতাস দিয়ে ॥ ক'রে নিলো। মুখ আচমন। I
কেননা এখন তারা ॥ যেই দেশে যাবে তাকে ॥ রাঙা নদী বলে ; I
সেইখানে ধোপা আর গাধা ॥ এসে জলে।
মুখ দেখে ॥ পরস্পরের পিঠে ॥ চড়ে যাদুবলে। I
....
হাই ড্রাণ্ট থেকে কিছু ॥ জল ঢেলে চায়ের ভিতরে ॥
জীবনকে আরো স্থির ॥ সাধুভাবে তারা ॥

১ ঝরা পালক : ১৯২৮, ধূসর পাণ্ডুলিপি : ১৯৩৬, বনলতা সেন : ১৯৪২, ১ম সং, ১৯৫২, ২য় সং, মহাপৃথিবী : ১৯৪৪, সাতটি তারার তিমির : ১৯৪৮, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা : ১৯৫৪, রূপসী বাংলা : ১৯৫৭, বেলা অবেলা কালবেলা : ১৯৬১।

ব্যবহার ক'রে নিতে গেল ॥ সোঁদা ফুটপাতে ব'সে ; I
মাথা নেড়ে। দুঃখ ক'রে ব'লে গেল ॥ 'জলিফলি ছাড়া I
চেৎলার হাট থেকে ॥ টালার জলের কল আজ ॥
এমন কি হ'তো জাঁহাবাজ ? I
ভিখিরীকে। একটি পয়সা দিতে ॥ ভাসুর ভাদ্র বৌ ॥ সকলে নারাজ।' I

[লঘু মুহূর্ত ; সাতটি তারার তিমির]

ছন্দ-বৈয়াকরণ ইচ্ছা হলে স্থূলাক্ষর শব্দগুলিতে কবির দুর্বলতা খুঁজে বার করতে পারেন। কারণ ওখানে মাত্রাবৃত্তের মধ্যে অক্ষরবৃত্তের সংহত উচ্চারণ প্রবেশ করেছে। কিন্তু সেটা সম্ভবপর হয়েছে এ-ছন্দের আট-দশ মাত্রার দীর্ঘ যতি ভাগের ফলে। নিঃসংশয়ে এটি একটি নতুন পরীক্ষা। এ-ছন্দে সাধারণত আট মাত্রার পদভাগে চারমাত্রার লঘুযতি ফুটে উঠতে চায়। কবি ৩-৩-২ মাত্রার শব্দবিন্যাসে সেই প্রবণতা অনেকাংশে এড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া ভাবযতির তাগিদে অনেক সময় তিনি ছন্দযতির কিছুটা হেরফের ঘটিয়েছেন। প্রদত্ত যতিচিহ্ন থেকে তার নিদর্শন মিলবে। এক দাঁড়িতে (।) লঘুযতি, দুই দাঁড়িতে (॥) পদযতি এবং ইংরেজী আই চিহ্নে (I) পূর্ণযতি বোঝানো গেল। কিন্তু জীবনানন্দের বাক্‌ভঙ্গিতে মাত্রাবৃত্ত তেমন খাপ খায় না, কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং এ-রীতিকে পরবর্তী কবিতা রচনায় পরিহার করেছেন।

'ঝরা পালক' থেকে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' পর্যন্ত কবির যথার্থ ছন্দ বাহন ছিল অক্ষরবৃত্ত। 'ঝরা পালকে' সমিল মুক্তক দিয়ে তাঁর কবিতা রচনায় সূচনা। তবে তখনই প্রচ্ছন্ন মিল, চতুর্থাংশ শব্দ ব্যবহারে বিশেষ প্রবণতা, একপদী-দ্বিপদী-ত্রিপদী-চৌপদী-পঙ্‌ক্তির পর পর বিন্যাস প্রভৃতি কবির মুখ্য কয়েকটি রচনা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। স্বচ্ছন্দ ভাব-নিয়ন্ত্রিত যতিবিন্যাসে প্রথম থেকেই কবির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মুক্তকের বাক্‌পর্বে একই বাক্যাংশের আবর্তন, একই প্রশ্নবোধক বা প্রত্যয়বোধক বাক্‌বিন্যাস জীবনানন্দের মুক্তকের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই নানাবিধ বৈশিষ্ট্যসূচক কবির বহু মুক্তক কবিতাই পাঠকের মনে পড়বে। এখানে একটি উদাহরণ তোলা যেতে পারে।—

শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে ?

স্বপ্ন নয়— শান্তি নয়—কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে।

...   .

চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে ;
ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে ;

...   .

অবসাদ নাই তার ?   নাই তার শান্তির সময় ?
কোনোদিন ঘুমাবে না ?   ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি ?   পাবে না আহ্লাদ ?
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন।
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন !
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন !   [বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি]

একই ধরনের বাক্য বা শব্দাবলীর আবর্তন এখানে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। চতুর্মাত্রক শব্দের ব্যবহারে লেখকের প্রবণতাও লক্ষণীয়। পর পর বাক্যবিন্যাসে প্রশ্নবোধক বা প্রত্যয়বোধক clause ব্যবহারও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকাংশে লক্ষ করা যাবে। প্রচ্ছন্ন শব্দমিলও যথেষ্ট রয়েছে। শরীরে / মাটির / জলের/ চাষার, স্বপ্ন/ শান্তি, কোন/ এক/ কাজ/ করে, বা একই ধরনের শব্দে একই ক্রিয়াপদের আবর্তন :

ভালবেসে }
হেলা ক'রে } দেখিয়াছি
ঘৃণা করে }

বা 'পাবে না আহ্লাদ' ক্রিয়া সমন্বিত বাক্যাংশের লেজুড় হিসাবে তিনটি clause যার গঠনে একই শব্দগুচ্ছের আবর্তন :

মানুষের }
মানুষীর } মুখ দেখে কোনোদিন !
শিশুদের }

জীবনানন্দের অক্ষরবৃত্ত মুক্তকে এমন আরও শব্দ-ব্যবহারগত নানা বৈশিষ্ট্য মনোযোগী পাঠক দেখতে পাবেন।

বাংলা কবিতায় বিদেশী Jenre-গুলির ব্যবহারে সনেটের ঐশ্বর্য সব থেকে বেশী। জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'য় এবং অন্যত্র যে অর্ধশতাধিক সনেট লিখেছেন সেখানেও মিল বিন্যাসের ঐশ্বর্য বিস্ময়কর। এক 'রূপসী বাংলা'য় সনেটগুলিতেই মিলবৈচিত্র্য দেখতে গিয়ে লক্ষ করলাম, কবি প্রথম আট লাইনে প্রচলিত পেত্রার্কীয় কখখক কখখক মিল দিয়ে বাকী ছয় (দু-একটি কবিতায় পাঁচ) পঙ্‌ক্তিতে অন্তত তেইশ রকমের মিলবৈচিত্র্য এনেছেন। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য এখানে তাঁর সনেটের ষট্‌ক-মিল-বৈচিত্র্যের একটি তালিকা দেওয়া গেল।—

তোমরা যেখানে সাধ	কখ খক কখ খক	গঘ ঘগ ঘঘ
যতদিন বেঁচে আছি	"	গঘ ঘগ ঙঙ
একদিন জল সিড়ি	"	গঘ ঘগ ঘগ
আকাশে সাতটি তারা	"	গঘ গঘ গঘ
কোথাও দেখিনি আহা	"	খগ খগ গগ
হায় পাখি, একদিন	"	গঘ গঘ ঙঙ
ঘুমায়ে পড়িব আমি (১)	"	গঘ গঘ ঘগ
ঘুমায়ে পড়িব আমি (২)	"	গগ ঘঘ গগ
যখন মৃত্যুর ঘুমে	"	গঘ গঘ গগ
আমি যদি ঝরে যাই	"	গঘ ঘগ গগ
যে শালিখ মরে যায়	"	খগ খগ ঘঘ
তোমার বুকের থেকে	"	গক গক গঘ
ভিজে হয়ে আসে মেঘে	"	গঘ ঘগ গঘ
চলে যাব শুক্‌নো পাতা ছাওয়া ঘাসে	"	গঘ গঘ ঘঘ
এখন ঘুঘুর ডাকে	"	গঘ গঘ গ
তবু আহা ভুল জানি	"	গঘ গগ ঘঘ
এখানে প্রাণের স্রোত	"	গগ গগ গগ
মানুষের ব্যথা আমি	"	গঘ গঙ গঙ
বাতাসে ধানের শব্দ	"	গঘ ঘঙ ঙঘ
একদিন এই দেহ	"	গগ ঘঘ ঙঙ
আজ তারা কই সব	"	গঘ ঙঘ ঙঙ
ঘাসের ভিতরে যেই	"	গঘ গগ ঙঙ
(এই সব ভাল লাগে)	"	গঘ ঙঙ ঘগ

আরও একটু লক্ষ করলে এর মধ্যেও কবির নানা মিলগত কারুকার্য ধরা পড়ে। 'একদিন যদি আমি' (পৃ. ৫০) সনেটটিতে ষট্‌ক মিল : গঘ গঘ গঘ। কিন্তু সেখানে ছয়টি লাইনেই 'ত' ব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাস রয়েছে। অনুরূপভাবে 'পৃথিবীর পথে আমি' (পৃ. ৫৬) সনেটের শেষ ছয় লাইনে 'র' ধ্বনির অনুপ্রাস, 'হৃদয়ে প্রেমের দিন' (পৃ. ৬৪) সনেটে 'ন' ধ্বনির মিল, অথবা 'কোথাও চলিয়া যাব একদিন' (পৃ. ২৮) সনেটের চ, ছ, জ, ঝ তালব্য ধ্বনির অনুপ্রাস দিয়েছেন। এমন আরও কয়েকটি নিদর্শন মিলবে।

সনেটগুলির ভাবগত ঐক্যের বিচার এ-আলোচনার এক্তিয়ার বহির্ভূত। তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে, descriptive এবং reflective অষ্টক-ষট্‌ক স্তবক বিভাগ অধিকাংশ সনেটে রক্ষিত হয় নি। পঙ্‌ক্তি-প্রবহমানতা অষ্টক স্তবক পেরিয়ে ষট্‌কতে পৌঁছানোতেও এই মন্তব্যের সমর্থন মেলে। কবি সর্বত্র পঙ্‌ক্তিমাপের সমতা রক্ষা করেন নি, ভাব অনুযায়ী পঙ্‌ক্তি বড় ছোট রেখেছেন। এ-সনেটগুলিতে সবচেয়ে ছোট মাপের পঙ্‌ক্তি হল ৮-১০ মাত্রাভাগের মহাপয়ার, সবচেয়ে বড়মাপের পঙ্‌ক্তি হল ৮-৮-৮-৬ মাত্রার চৌপদী। অন্যান্য দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিক কবিতার মতো সনেটেও যতি বিভাগে নানা বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। লাইন ডিঙানো প্রবহমানতা এবং বিচিত্র যতির ব্যবহারে কবি অনেকটা স্বাধীনতা নিয়েছেন এখানে অষ্টক-ষট্‌ক ভাবগত ঐক্য রয়েছে এমন একটি সনেট উদ্ধৃত করা গেল।—

তোমার বুকের থেকে ॥ একদিন চলে যাবে ॥ তোমার সন্তান I — ক
বাংলার বুক ছেড়ে চলে যাবে ; I যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে, । — খ
আকাশের । নীলাভ নরম বুক ॥ ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে । — খ
ডুবে যায়, I—কুয়াশায় । ঝ'রে পড়ে দিকে দিকে ॥ রূপশালী ধান । — ক
একদিন ; I—হয় তো বা নিমপেঁচা ॥ অন্ধকারে গাবে তার গান, I — ক
আমারে কুড়ায়ে নেবে ॥ মেঠো ইঁদুরের মতো ॥ মরণের ঘরে— — খ
হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ ॥ লেগে আছে আকাঙ্ক্ষার ॥—তবুও তো চোখের উপরে ॥ খ
নীলমৃত্যু উজাগর ॥—বাঁকা চাঁদ, । শূন্য মাঠ, ॥ শিশিরের ঘ্রাণ I— — ক

কখন মরণ আসে ॥ কে বা জানে I— কালীদহে কখন যে ঝড় ॥ — গ
কমলের দল ভাঙে ॥—ছিঁড়ে ফেলে । গাংচিল শালিখের প্রাণ ॥ — ক
জানি নাকো ; I— তবু যেন মরি আমি ॥ এই মাঠ-ঘাটের ভিতর, I — গ
কৃষ্ণা যমুনার নয় ॥—যেন এই গাঙুরের ॥ ঢেউয়ের আঘ্রাণ ॥ — ক

লেগে থাকে চোখে মুখে I—রূপসী বাংলা যেন ॥ বুকের উপর ॥ গ
জেগে থাকে ; I তারি নিচে ! শুয়ে থাকি যেন আমি ॥ অর্ধনারীশ্বর । গ
[রূপসী বাংলা : পৃ. ২৯]

নানা ধরনের ধ্বনি ও যতির আবর্তন এবং পাঠকমনে তার থেকে প্রত্যাশাসৃষ্টি—ছন্দের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এখানে ৮-৮-৬ মাত্রার পঙ্‌ক্তি বিন্যাসই হল প্রত্যাশিত সাধারণ মাপ ; কবি প্রয়োজনমতো যতি পরিবর্তন করেছেন। তাঁর একটি পরিচিত পরিবর্তনের রূপ হল, লাইন পেরিয়ে পরের লাইনে চার মাত্রায় এসে ভাবযতি দেওয়া এখানে ৪, ৫, ১১, ১৪ পঙ্‌ক্তিতে সেই রূপটি দেখতে পাওয়া যাবে। একই ধরনের ক্রিয়াপদের আবর্তন লক্ষণীয় ; চলে যাবে, পাবে, কুড়ায়ে নেবে, বা লেগে আছে, লেগে থাকে, জেগে থাকে, শুয়ে থাকি ইত্যাদি।—এই আবর্তনও এক ধরনের প্রত্যাশাবোধ সৃষ্টি করে। চতুর্মাত্রিক উপযতিতে শব্দ ব্যবহার প্রবণতার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ কবিতায় চার, তিন ও দুই মাত্রার শব্দে উপযতির হিসাব নিতে গিয়ে দেখা গেল, চতুর্মাত্রিক ৫৩, ত্রিমাত্রক ২৭ এবং দ্বিমাত্রক ১৪টি উপযতির অস্তিত্ব রয়েছে। সনেট রচনায় জীবনানন্দ দান্তে-প্রবর্তিত Terza Rima ত্রিপঙ্‌ক্তি-স্তবকের ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বেই প্রমথ চৌধুরী বাংলায় এই ত্রিক মিলবন্ধের প্রবর্তন করেছিলেন। জীবনানন্দ তাকে সনেট আঙ্গিকে রূপ দিলেন। বনলতা সেনের 'পথ হাঁটা' বা ধূসর পাণ্ডুলিপির 'শকুন' এই পর্যায়ের রচনা। একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে—সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে-আকাশে ক
শকুনেরা চরিতেছে ; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি ; নিস্তব্ধ প্রান্তর খ
শকুনের ; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে ক

আরেক আকাশ যেন—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর খ
কঠিন মেঘের থেকে ; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ গ
প'ড়ে গেছে—প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার খেত মাঠ প্রান্তরের 'পর খ

এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু ; আবার করিছে আরোহণ গ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে—পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে ; ঘ
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন গ

বন্দরের অন্ধকার ভিড় করে, ছাখে তাই ; একবার স্নিগ্ধ মালাবারে ঘ
উড়ে যায়—কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন ঙ
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে ; ঘ

যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ন লেগুন ঙ
কেঁদে ওঠে···চেয়ে ছাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন। ঙ

[শকুন : ধূসর পাণ্ডুলিপি]

লক্ষ করা যাবে, প্রত্যেক ত্রিপঙ্‌ক্তি স্তবকের মধ্য পঙ্‌ক্তিটি মিলহীন। সেই মিল পরবর্তী স্তবকে প্রথম ও তৃতীয় লাইনে ফিরে এসেছে। অর্থাৎ একটি বিনুনি-বিন্যাসের প্যাটার্ন। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে complet rhyme. এখানে সব পঙ্‌ক্তিই ৮-৮-১০ মাত্রক দীর্ঘ ত্রিপদীবন্ধে রচিত। অবশ্য মাঝে মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবে কবি যতির স্বাধীনতা নিয়েছেন।

বিদেশী স্তবকাদর্শের অনুসরণ অন্য কিছু কিছু কবিতাতেও লক্ষিত হয়। ধূসর পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত 'অনেক আকাশ' কবিতায় স্পেন্‌সেরীয় স্তবক আনতে চেয়েছেন। মিল : কখ কখ খগ খগ গ ; প্রথম আট পঙ্‌ক্তি ৮-১০ মাত্রাভাগের মহাপয়ার, নবম পঙ্‌ক্তিটি দীর্ঘতর : ৮-৮-৬ মাত্রার ত্রিপদী। বাহুল্যবোধে আর উদ্ধৃতি তুলছি না। আট, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই—পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে কবি নানাধরনের স্তবক রচনা করেছেন। এখানে মিল সচেতনতার নিদর্শন হিসাবে পঞ্চপঙ্‌ক্তিক একটি স্তবক উদ্ধৃত করা গেল।—

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর · পৃথিবীর নরম অঘ্রান
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না ; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়।

[সিন্ধুসারস : মহাপৃথিবী]

এখানে ক ক ক খ খ—মিল। কবিতাটিতে আরও নটি পঞ্চপঙ্‌ক্তিক স্তবক আছে, সেখানে মিলবিন্যাসের আরও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। পঙ্‌ক্তিও ৮-৮ মাত্রক থেকে ৮-৮-৪-১০ মাত্রক—নানা মাপে রচিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে জীবনানন্দের মাত্রাবৃত্ত রীতিতে লেখা কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে তিনি প্রয়োজনবোধে প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে যুক্তাক্ষর রুদ্ধদলে এককলার উচ্চারণ দিয়েছেন, তেমনি অক্ষরবৃত্ত কবিতাতেও এমন

বহু পঙ্‌ক্তি পাওয়া যাবে যেখানে কবি নিয়ম ভেঙে যুক্তাক্ষর রুদ্ধদলে দ্বিকলার উচ্চারণ এনেছেন। যেমন—

(i) জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো :—
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে !

[আট বছর আগের একদিন : শ্রে. ক.]

(ii) নীলিমাকে যতদূর শান্ত নির্মল মনে হয়
হয়তো-বা সে-রকম নেই তার মহানুভবতা।

[পরিচায়ক : মহাপৃথিবী]

(iii) সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়।
ধীর পদবিক্ষেপে কৃষকেরা হাঁটে।

[বিভিন্ন কোরাস : তিন : মহাপৃথিবী]

(iv) নিজের জলের কাছে ভাগীরথী পরমাত্মীয়।
চেয়েও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিভৃতে।
লাশকাটা ঘরের ছাদের 'পরে একটি দোয়েল
পৃথিবীর শেষ অপরাহ্নের শীতে [দোয়েল : মহাপৃথিবী]

(v) দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্কস্ট্রিটে গিয়ে—টেরিটিবাজারে ;
চিনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

[রাত্রি : সাতটি তারার তিমির]

এমন আরও বহু দৃষ্টান্ত তোলা যায়। এধরনের বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ কবি ইচ্ছাকরেই এনেছেন মনে হয়। কঠিন কোনো নিয়মের বাঁধনে বন্দী হতে তিনি চান নি। স্বরবৃত্তের ব্যবহার কবির অন্য কোনো বইতে দেখা গেল না। একমাত্র 'বেলা অবেলা কালবেলা' বইটিতে অন্তত পক্ষে দশটি কবিতায় স্বরবৃত্তের ব্যবহার চোখে পড়ল। কৌতূহলী পাঠক তাঁর যতিহীন, তোমাকে, সময় সেতুপথে, শতাব্দী, প্রয়াণ পটভূমি, নারী সবিতা, গভীর এরিয়েলে, পটভূমির, যদিও দিন, আজকে রাতে—কবিতাগুলি দেখতে পারেন। মনে হয়, মাত্রাবৃত্তের মতো স্বরবৃত্তেও কবি তেমন স্বস্তিবোধ করতেন না। একটু শিথিলবদ্ধ আঙ্গিকে কথ্য সংলাপী ভাষায় আমেজ মিশিয়ে এই কবিতাগুলি লিখেছেন।

তিনি নিজে কি এ-কবিতাগুলি প্রকাশে পরাঙ্মুখ ছিলেন? যদিও লিখেছেন ১৯৩৪-৫০-এর মধ্যে। প্রকাশিত হয়েছে কবির মৃত্যুর পর (১৯৬১)। একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা যাক।—

ডুবল সূর্য ; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।
এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে॥
রক্ত ব্যথা ধনিকতার উষ্ণতা এই নীরব স্নিগ্ধ অন্ধকারের শীতে
নক্ষত্রদের স্থির সমাসীন পরিষদের থেকে উপদেশ
পায়না নব ; তবুও উত্তেজনাও যেন পায়না এখন আর ;
চারদিকেতে কার্যবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ—সব,
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
গ্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব।

[গভীর এরিয়েলে : বে. অ. কা.]

স্থূলাক্ষর শব্দগুলিতে কিছুটা হোঁচট খেতে হয়। নইলে মোটামুটি কবি ঠিকমতোই ধ্বনিস্পন্দ রক্ষা করেছেন।

গদ্যকবিতার রাজ্যে কবিরা অক্ষরবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত মুক্তক থেকেই ছন্দোমুক্তির তাগিদে পদক্ষেপ করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে ছন্দোজিজ্ঞাসুরা দ্বিমত হতে পারেন, তবে এখানে যে কবিতার ছন্দোমুক্তি বহুলাংশে ঘটেছে সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। জীবনানন্দ বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, বেলা অবেলা কালবেলা বই তিনটিতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতা লিখেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আবর্তন এবং তার প্রত্যাশা থেকেই ছন্দের জন্ম হয়। গদ্য কবিতায় এই আবর্তন দল বা কলা-মাত্রার হিসাবে ধরা পড়ে না। সেখানে ছোট ছোট বাক্যের আবর্তন, এক ধরনের শব্দবিন্যাসের আবর্তন, এবং অনেক সময় প্রচ্ছন্ন ধ্বনিগত আবর্তন লক্ষিত হয়। বাক্রীতিতে কবিরা বিন্যাসগত আবর্তনও রাখতে চেষ্টা করেন। ভাব ও ধ্বনির counter balance এনে পাঠকমনে একধরনের প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলেন। জীবনানন্দের গদ্য কবিতায় কমবেশী উপরোক্ত সব কৌশলই লক্ষ করা যাবে। এখানে একটি ছোট দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে।—

হে নর, । হে নারী, ॥
তোমাদের পৃথিবীকে। চিনিনি কোনোদিন ; I
আমি অন্য কোনো। নক্ষত্রের জীব নই। I
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, ॥ যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ, ।

সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, ॥ কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি ॥
শত শত শূকরের। চিৎকার সেখানে, I
শত শত শূকরীর। প্রসববেদনার আড়ম্বর ; I
এই সব ভয়াবহ আরতি। I [অন্ধকার : মহাপৃথিবী]

তিন ধরনের চিহ্ন দিয়ে এখানে যতির গুরুত্ব বোঝানো হল। তাছাড়া প্রত্যেকটি কমাচিহ্নে উপযতিভাগ রয়েছে। সুতরাং বাক্যগুলি স্বভাবতই ছোট ছোট বাক্পর্বে বিন্যস্ত হতে পেরেছে। নর-নারী, চিনিনি কোনোদিন, কোনো নক্ষত্র, স্পন্দন-সংঘর্ষ, শত শত শূকর/শূকরী—এসব শব্দ ব্যবহারে চমৎকার অন্তর্মিল ধ্বনি সৌকর্য অনুভব করা যায়। যেখানে (দুবার) এবং সেখানে দিয়ে বাক্যবিন্যাস এবং তারমধ্যেও শব্দবিন্যাসের সামঞ্জস্য প্রত্যাশাবোধকে তৃপ্তি দেয়। কবিতাটির পরবর্তী একটি স্তবকে জেগে উঠবনা আর, তাকিয়ে দেখব না, কোনোদিন জাগবে না—এই জাতীয় বাক্যবিন্যাসেও পুনরাবৃত্তির বোধটি পরিস্ফুট।

জীবনানন্দের প্রথম দিকের কবিতার ভাষায়, বিশেষ করে অক্ষরবৃত্ত রীতিতে লেখা কবিতায় চলিত ও সাধুভাষার মিশ্রণ লক্ষিত হয়। পরের দিকে তিনি ক্রমশ বিশুদ্ধ চলিত ভাষার দিকে ঝুঁকেছেন। গদ্যকবিতায় বা স্বরবৃত্ত রীতির কবিতায় ভাষা অবিমিশ্রভাবে 'চলিত'। ছন্দ বিশ্লেষণে দেখা গেল, যদিও তিন রীতির ব্যবহারই তাঁর জানা ছিল তবু মুখ্যত অক্ষরবৃত্ত মুক্তক এবং গদ্যকবিতার ছন্দকেই কবিতার বাহন করেছিলেন। বিদেশী ছন্দোবন্ধের ব্যবহারে ধরা যায়, তিনি ছন্দ সচেতন কবি ছিলেন। তবে প্রয়োজনমতো ছন্দের নিয়ম-শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইতেন। কিছুটা স্বচ্ছন্দ বিচরণের ক্ষেত্র চাইতেন। যিনি নিয়মের পথে চলতে অভ্যস্ত নিয়ম ভাঙা তাঁর পক্ষেই শোভা পায়। জীবনানন্দ ছন্দের নিয়ম যেখানে ভেঙেছেন তার অধিকাংশই 'happy variation'-এর পর্যায়ভুক্ত ধরা যেতে পারে।

কবিতার ভাষা ঃ জীবনানন্দ

ডঃ শিশিরকুমার দাশ

অভিজ্ঞতার নতুন ক্ষেত্র, অনুভূতির অপরিচিত স্তর, কল্পনার আর একটি রহস্যময় বাতায়ন আবিষ্কার কবির প্রতিভার অব্যর্থ লক্ষণ, সম্ভবত কবিজীবনের পরমকীর্তি। সেই আবিষ্কারে কবির প্রধানতম অস্ত্র তাঁর ভাষা, তাঁর শ্রেষ্ঠ সখা এবং প্রচণ্ডতম শত্রু। ভাষা মানুষের প্রাত্যহিক প্রকাশভঙ্গির নির্বিরোধী বাহন, সামাজিক কর্মের উপযোগীতম ভারবাহী মাধ্যম অথচ নতুন অনুভূতির প্রকাশে তার সত্তা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। প্রকাশের মাধ্যমের সঙ্গে সংগ্রাম কবির পক্ষে শুধু অনিবার্য নয়, এই সংগ্রামই তাঁর অদৃষ্টের নির্ধারক। যিনি এই স্বভাব-স্থাবর, পরিবর্তনবিমুখ সংবাদ-বহনের সামাজিক মাধ্যমটিকে বশীভূত করতে পারেন, শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও কল্পনার নতুন জগৎকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তোলা। কাব্যের ইতিহাসে একাধিকবার দেখা গেছে প্রতিভাবানেরা সৃষ্টি করেছেন নতুন ভাষা—সামাজিক দৌত্যকার্যের বিশাল চাহিদা মেটানোর কাজ যার সৃষ্টি এবং পুষ্টি, কালের স্পর্শে যার পরিবর্তন, ক্ষয় এবং বিলয়—সেই ভাষার কিছুটা অংশ তাঁরা অধিকার করেছেন। তাকে নতুন ক'রে নিজের নিয়মে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, যাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি "কবিতার ভাষা"।

কবিমাত্রেই ভাষা-মাধ্যমের বন্দী। ভাষার অন্তর্নিহিত নিয়মকে তাঁকে মেনে চলতেই হয়—সে নিয়ম না মানলে তাঁর ভাষা, ভাষার যে মৌল প্রয়োজন সামাজিক ভাব-দৌত্য তা হারায়। অথচ কবি এই বন্দীত্বকে মেনে নিয়েছেন, যে মুহূর্তে তিনি একটি ভাষায়, যে কোনো ভাষা, বাংলা, ইংরেজী, গ্রীক যাই হোক না কেন, প্রকাশ করতে সম্মত, তখনই অনিবার্যভাবে তিনি সেই ভাষার নিয়মাবলী মানতে প্রতিশ্রুত। কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের অর্থই আত্মবিলয়। অতএব আত্মসমর্পণে তিনি স্বীকৃত নন। ভাষা সামাজিক সম্পত্তি, কবিও সামাজিক, সেই সম্পত্তি তাঁকে ব্যবহার করতে হয়, ভাব-বিনিময়ের মূল্যবান মাধ্যমের প্রয়োজন তাঁর কারো চেয়ে কম নয়; অথচ স্থির, বিধিবদ্ধ নিয়মের রাজ্যে কীভাবে তিনি অভিজ্ঞতার নিষিদ্ধ জগৎ, কল্পনায় একটি রহস্যময় বাতায়ন খুলে দেবেন স্বাধীনতা ছাড়া! সেই স্বাধীনতা তাঁর প্রয়োজন আর সেই

স্বাধীনতা তাঁকে অর্জন করে নিতে হবে। কবিতার ভাষা সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার ফলশ্রুতি-ও বটে। আর সেজন্যেই কবিতার ভাষাই কবির প্রতিভার অব্যর্থ চিহ্ন। সমগ্র কবিতার পরিপূর্ণ, শুদ্ধ শুভ্রতার বিচ্ছুরিত বর্ণালী হল কবিতার ভাষার ভিন্ন ভিন্ন স্তর।

কবিতার ইতিহাসে অসংখ্য কবির সন্ধান পাওয়া যাবে, যাঁরা আজ মৃত তাঁদের সমকালও ক্ষীণপ্রাণ, তাঁরা অভিজ্ঞতার নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারে অগ্রসর হয়ে ভাষার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এক শক্তিমান্ কবির ভাষা যে শুধু তাঁরই ভাষা—এ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি বলেই তাঁরা অন্যের ভাষা আশ্রয় করে বেড়ে উঠতে চেয়েছিলেন, তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের চেয়েও প্রধান হয়ে উঠেছিল পরাশ্রয়ী মনোবৃত্তি। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তার নজীর বড় কম নয়, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের মধ্য পর্যায়ে। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠত্বের অবিসংবাদিত প্রধান কারণই তাঁর স্বতন্ত্রভাষার সৃষ্টি, প্রচলিত কাব্যরীতির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ-সংগ্রামের সিদ্ধি। অ্যারিস্টটল metaphor-এর ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই কবিপ্রতিভার সজীবতার অব্যর্থ চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এই metaphor-কে বৃহত্তর অর্থে "কবিতার ভাষা" নাম দিলে অন্যায় হবে না।

কবিতার ভাষার অন্যতম লক্ষণ, ভাষাতাত্ত্বিকের চোখে। প্রাত্যহিক ভাষার ব্যাকরণের সর্বাতিশায়ী কাঠামোর মধ্যে আর একটি নিজস্ব ব্যাকরণ রচনা; আর ভাষাদার্শনিকের চোখে, যুক্তিশাস্ত্রের "সত্য" ও "ভ্রান্ত"—নামক ধারণার দ্বারা পরীক্ষিত বাক্যগোষ্ঠীর বহির্ভূত। অথবা কবিতার ভাষা সেই ভাষা যেখানে বাক্যগুলিকে সত্য অথবা ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে বিচার করা যাবে না। কবিতার ভাষাকে যদি ব্যাকরণের অন্তঃশায়ী আর এক ব্যাকরণের দ্বারা বিচার করা যায়, তবে বিশেষ কবির ভাষাকে বিচার করতে হবে কবিতার ভাষার ব্যাকরণের দ্বারা, যে ব্যাকরণের নিয়মগুলি অবচেতন ভাবে, কখনও সচেতন ভাবে, সৃষ্টি করেছেন কবি স্বয়ং। অন্যভাবে বলা চলত, সাধারণভাবে বলা হয়েও থাকে, যে কবি প্রাত্যহিক ভাষার নিয়ম লঙ্ঘন করেন। কিন্তু এই লঙ্ঘনের সীমা আছে, এবং তিনি এই ভাষার নিয়ম মানতে প্রতিশ্রুত বলেই সেই নিয়ম লঙ্ঘনের চেয়ে তাঁর প্রয়োজনের জন্যই বিশেষ নিয়ম রচনা করেন, যাকে আরেকভাবে বলা চলে স্বতন্ত্র ভাষা রচনা।

বিশ্লেষণ করে দেখানো অসম্ভব না হলেও অপ্রয়োজনীয়, কারণ এটা সর্বসম্মত যে কোনো কোনো কবির ভাষা এমনই স্বতন্ত্র যে সেটির দ্বারাই তাঁকে চিহ্নিত

করা চলে। মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথের বাক্যগঠন এবং শব্দের অন্বয়ের যে অসামান্যতা এবং স্বাতন্ত্র্য অবিসংবাদিতভাবে তাঁদের নিজস্বতা চিহ্নিত। মাইকেলের দূরান্বয়, অন্তর্বাক্যের (parthesis) ব্যবহার এবং period-এর গঠন যেমন তাঁর কবিতার ভাষার চিহ্ন ; তেমনই রবীন্দ্রনাথের ক্রিয়াপদের অবস্থানের স্বাধীনতা, অসমাপিকা ক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা, সমধর্মী বাক্যের আবর্তনজনিত সংগীত এবং সমতাল বাক্যশ্রেণীর সমান্তরালতা। জীবনানন্দ বাংলা কাব্যের আর একটি সিদ্ধপুরুষ যিনি শুধু তাঁর বাক্যগঠন ও অন্বয়ের বৈশিষ্ট্যে অনন্য এবং পরবর্তী দুই কবির মতোই তাঁর কাব্যশরীরের ছায়া সমকাল এবং অব্যবহিত উত্তরকালে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। জীবনানন্দের প্রধানত ধীর গতি বাক্যের অচপল পদক্ষেপ, অন্যনির্ভর বাক্যগুলির ঘন বুনন, যে, যারা জাতীয় সর্বনামযুক্ত বাক্যাংশের ব্যবহারে সাধারণ নিয়মের লঙ্ঘন, একটি দীর্ঘ বাক্যের দ্বারা একটি কবিতার দেহ নির্মাণ—ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের বিশেষ কৌতূহল দাবি করে।

> ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরকম শীত অসারতা
> নেমে আসে ; —চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ রয়ে গেছে তবু,
> রৌদ্রের ফলনে সোনা নারী শস্য মানুষের হৃদয়ের কাছে,
> বন্ধ্যা ব'লে প্রমাণিত হয়ে তার লোকোত্তর মাথার নিকটে
> স্বর্গের সিঁড়ির মতো ;—

কিংবা

> যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
> সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে
> মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
> টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর শয্যায় কথা ভুলে
> সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডু'বে যেত কোথায় অকূলে।

এই দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে যে বাক্য গঠনের বিশিষ্টতা তা একান্তই জীবনানন্দের। বাংলা কাব্যে আগে এবং পরে এই অন্বয়-রীতির উদ্ভাবনী কৌশল আমরা লক্ষ্য করি নি। কোনো বিশেষ জগৎ-বোধ ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত অথবা ভাষার দ্বারাই জগৎ-বোধ নিয়ন্ত্রিত কি না তা নিয়ে দার্শনিক মহলে তর্ক উঠতে পারে ; কিন্তু কবিতার ভাষার সঙ্গে কবির জগৎ-বোধের সম্পর্ককে অস্বীকার করা সম্ভব কি ? বিশেষ করে প্রশ্ন উঠতে পারে অন্বয় নিতান্তই ব্যাকরণের নিয়ম, অথবা ভাষার অন্তর্নিহিত নিয়মের বিধিবদ্ধ রূপ মাত্র, তার মধ্যে

কী ভাবে কবির জগৎ ও জীবনবোধ প্রতিফলিত হতে পারে? অন্বয় কি শুধুই মাধ্যম মাত্র? না অন্বয় সমগ্র কবিতার একটি উপাদান? অথবা কবিতায় উপাদান ও মাধ্যম শেষ পর্যন্ত পরস্পরে বিলীন—উপাদান মাধ্যমকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করতে করতে মাধ্যমকে এমনই ভাবে প্রভাবিত করতে থাকে যে মাধ্যমের স্বতন্ত্র অস্তিত্বেই তখন সংশয় দেখা দেয়। ভাষার সর্বজন স্বীকৃত অন্বয় পদ্ধতি মাধ্যম মাত্র--সেই মাধ্যমেই কবির সূত্রপাত কিন্তু তার পূর্ণ বিকাশের মুহূর্তে অন্বয়ের হয় জন্মান্তর, তখন মাধ্যম হয়ে ওঠে কবিতার উপাদান। প্রাণ যখন দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত তখন দেহ রমণীয় এবং পূজনীয়। সেই অর্থেই কবিতার ভাষা, বিশেষ করে সেই ভাষার অন্বয় কবিতারই অংশ। কারণ তার সর্বাঙ্গে তখন কবিতার স্রোত প্রবাহিত। কোনো কোনো সমালোচক তাই অন্বয়ের নানা শ্রেণীর মধ্যে 'কাব্য অন্বয়' নামে এক শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। জীবনানন্দের কবিতার অন্বয় তাঁর কবিতার সমগ্রতার মধ্যে একটি প্রধান উপাদান। এই অন্বয়ই কবিতা।

জীবনানন্দের কবিতার বাক্যগঠনে এবং শব্দের অন্বয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। শুধু তাঁর নিজস্বতার একটি গভীর লক্ষণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। জীবনানন্দের কাব্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির সংখ্যা সঠিক জানি না, কিন্তু অনুমান যে তাঁর শব্দভাণ্ডার বিপুল নয়, যদিও বিচিত্র। কবিমাত্রেরই কিছু শব্দের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য থাকে, জীবনানন্দেরও ছিল, কিছু বেশী পরিমাণেই ছিল। কিন্তু সেই শব্দগুলিই কবিতা নয়, সেই শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সংঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠেছে তাই তাঁর কবিতার প্রধান লক্ষণ। তাঁর শব্দ এবং শব্দের ব্যবহারের বিশিষ্টতার চেয়েও যে গভীর লক্ষণটির দিকে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি তা হল তাঁর একটি বিশেষ অনুভূতি—যে অনুভূতিই তাঁর বাক্য, অন্বয় এবং শব্দগুলিকে গড়ে দিয়েছে।

কবিতার ভাষার বহু লক্ষণের মধ্যে আধুনিককালে যে বৈশিষ্ট্য বৈষয়িক ব্যক্তির কৌতুক এবং তাত্ত্বিকের অস্বস্তির কারণ তা হল প্রধানত সর্বজনস্বীকৃত শ্রেণীবিভাগ। যাকে কোনো কোনো শাস্ত্রে category বলা হয়েছে, তা বস্তু জগতেরই হোক বা ভাব জগতেরই হোক—সেই শ্রেণীবিভাগের বিশুদ্ধিকে অস্বীকার। শ্রেণীবিভাগের এই বিশুদ্ধিকে অস্বীকার করা হয়েছে কোনো তাত্ত্বিক প্রেরণা থেকে নয়, কাব্য প্রেরণা থেকে, ঐ শ্রেণীবিভাগ অসত্য বলে নয়, অসম্পূর্ণ বলে। সেখানে বস্তু এবং ভাব, বস্তু এবং বস্তু, ভাব এবং ভাব

ক্রমশই এক থেকে একের জন্ম দিচ্ছে, এক আরেকের মধ্যে বিলীন হচ্ছে, একের সঙ্গে একের সাদৃশ্য ধরা পড়ছে। এবং এক আরেকে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমাদের অতি প্রচলিত অলংকারগুলি কবিতার ভাষার এই বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে। গাছ যেখানে অশ্রু বিসর্জনে সমর্থ, নদী হতে পারে বাণীময়ী, বেদনা হয়ে ওঠে গন্ধময়, খড় হতে পারে বিষণ্ণ, এবং অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে মানুষ জেগে উঠতে পারে, নিস্তব্ধতা উটের গ্রীবার মতো—সেখানেই দেখা যাবে শ্রেণীবিভাগের বিশুদ্ধিকে অস্বীকার এবং তাকে কৃত্রিম বলে কবিতার ভাষা থেকে নির্বাসিত করা। জীবনানন্দের কবিতায় এই অস্বীকৃতি ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তার একটি স্থূল উদাহরণ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাংলা ভাষার যে অংশটা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্ম, বিচার বিবেচনার কাজে লাগানো হয় সেই অংশে বিশেষ্যগুলিকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। এক দলের রূপ হয় তিন রকম, যেমন, পাখি, পাখিকে আর পাখির। আর এক দলেরও হয় তিন রকম, যেমন নদী, নদীর, নদীতে। প্রথম দলের -তে রূপ নেই আর দ্বিতীয় দলের নেই -কে রূপ। এই দু' শ্রেণীর বিশেষ্যের নাম দেওয়া যেতে পারে প্রাণীবাচক আর অপ্রাণীবাচক। নদীর রূপ যদি করা যায় নদীকে, এবং তা কবিতায় করা হয়ে থাকে, তাহলে বলতে পারি এখানে ব্যাকরণের শ্রেণীবিভাগ ভেঙে গেল। অপ্রাণীবাচক শব্দ প্রাণীবাচক শব্দের মতোই ব্যবহৃত হল। সূক্ষ্ম অর্থে এ হল personification, নদী হয়ে উঠল প্রাণীসত্তা। বাংলায়, আবার বলি প্রাত্যহিক কাজকর্মের ভাষায়, একদল শব্দের সঙ্গে -রা/-এরা যোগে আমরা বহুত্ব বুঝিয়ে থাকি, যেমন ছেলেরা, মেয়েরা; কিন্তু নদীরা, পাহাড়েরা, নক্ষত্রেরা, শব্দেরা বলতে শুনি না; প্রাণীবাচক শব্দের বহুত্ব বোঝাতে বিশেষভাবে -রা/-এরা যোগ করি। অথচ কবিতায় "স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায়" এবং "সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা" জীবিত হয়। ব্যাকরণগত একটি শ্রেণী থেকে আর একটি শ্রেণীতে শব্দের যাওয়া-আসার পেছনে রয়েছে কবির একটি বিশিষ্ট অনুভূতি—যে অনুভূতির ফলে ভাবগত শ্রেণী, বস্তুগত শ্রেণীবিভাগ শেষ পর্যন্ত কবির কাছে মনে হয় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়; তাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগের কল্পিত সীমারেখাকে অতিক্রম করে কবি পৌঁছে যান এক সত্যের মধ্যে যেখানে বস্তু ও ভাবের বিরোধ নেই, ভাব ও ভাবে মিলন ও পরিবর্তনের বাধা নেই। অনুভূতির স্থাণুত্বকে কবি শুধু ঘুচিয়ে দেন না। অনুভূতির কোনো সুনির্দিষ্ট

রূপকেই তিনি মানেন না, তার ফলেই অনুভূতির পরিসীমা ক্রমশই বাড়তে থাকে, সেই পরিবর্ধমান জগতের প্রতিবিম্ব কবির ভাষায়।

ব্যাকরণের শ্রেণীবিভাগের লক্ষণ প্রকৃতপক্ষে কবির ক্ষেত্রে ভাবজগতের শ্রেণীবিভাগের কৃত্রিমতার বিরোধিতা থেকে জন্ম নিতে পারে এই উদাহরণ দেবার চেষ্টা করেছি। এবার জীবনানন্দের কবিতার ভাষায় সেই বিরোধিতার অন্য রূপটি দেখাব। বস্তু ও ভাবের গায়ে সমাজ ও চিরকালীন সাহিত্য-ঐতিহ্য যে "লেবেল"গুলি মেরে দিয়েছেন তাকে কবি নতুনভাবে পরীক্ষা করে নিতে চান। জল যে শুধুই তরল, আগুন যে শুধুই উষ্ণ, পর্বত যে শুধু স্থাবর বস্তুজগতের এই বহু পরীক্ষিত সত্যগুলিও কবিতায় পূর্ণসত্য বলে স্বীকৃত না-ও হতে পারে। তেমনই না-ও হতে পারে বস্তু ও মনোজগতের ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্যতা, কিংবা না-ও হতে পারে সমাজে স্বীকৃত মূল্যবোধগুলির চিরস্থায়িত্ব। সেই মূল্যবোধ, হয়তো ভাষাগত, হয়তো রুচিগত, হয়তো সংস্কারগত, কিংবা আরো বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃতিগত। কবির সেই সচেতন পরীক্ষা, তাঁর মাধ্যমকে নতুন করে গঠন করে নেবার প্রয়াসের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন পাব তাঁর ভাষায়, যার মধ্যে কবিতার সামগ্রিক অর্থের প্রত্যেকটি স্তরের, (অর্থের যদি নানা স্তর থাকে) ইঙ্গিত পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

'আলোকের বিশুষ্কতা', 'নির্ধূম আনন্দ', 'কমলালেবুর করুণ মাংস', 'জ্যোৎস্নার মনীষায়', 'রাঙা রৌদ্রে', 'ধবল শব্দ', 'ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিলো মুখ আচমন', 'সহিষ্ণু আলো', 'নিশিত আকাশ', 'সবুজ রোমশ নীড়ে', 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ', 'বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশ'—এই রকম আরো অজস্র উদাহরণ জীবনানন্দের কবিতার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে, যেখানে প্রচলিত ইন্দ্রিয়-বোধের নির্দিষ্ট সীমা শুধু বিধ্বস্ত তাই নয়, বস্তুর পরিচিত সত্তা বা ধর্মের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপটি ছাড়া আরো কোন স্বতন্ত্র ধর্ম আছে তার আবিষ্কার। এই ব্যাপারটিকে আমি 'ইন্দ্রিয়বোধের সচেতন বিপর্যয়' নাম দিতে চাই। সাধারণ উপমা-রূপক সমাসোক্তির কাঠামোয় এই ব্যাপারটি বোঝা যায় না। 'ধবল শব্দ বাতাস তাড়িত পাখিদের'—এই শব্দ-গুচ্ছে 'ধবল শব্দ' আমাদের মন আন্দোলিত করে, শব্দ সহসা বর্ণময়ী হয়ে ওঠে। একথা বলা যথেষ্ট নয় 'ধবল' প্রকৃতপক্ষে পাখিদের বিশেষণ মাত্র; পাখিদের শুভ্রতা বর্ণনাতেই তার ব্যবহার; অথবা যদি কেউ বলেন, ইংরেজী অলংকারের অনুসরণে 'ধবল'-শব্দের এই ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে একটি transfered epithet. কিন্তু 'ধবল শব্দ' ব্যবহারে আসল ধাক্কা আমাদের বোধে। শব্দকে আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ

দিয়ে জানি, তাকে চোখে দেখি না, স্পর্শ করি না, রসনায় শব্দের স্বাদ পাই না। শব্দকে উপলব্ধি করার নির্দিষ্ট পথ আছে। 'ধবল শব্দ' সেই নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-রূপটির বিপর্যয় ঘটাচ্ছে কারণ শব্দ এখন নয়ন পথেও উপলব্ধি করতে পারি। 'রৌদ্রের গন্ধে রৌদ্র ঘ্রাণের' যোগ্য হয়ে উঠল, 'আলোকের বিশুদ্ধতা'য় আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণায় ঘটল বিপর্যয়, আলোক হয়ে উঠল স্পর্শবোধের অন্তর্গত এক বস্তু। অর্থাৎ বস্তু শুধু বিশেষ ইন্দ্রিয়েরই ভোগ্য বা বিশেষ ইন্দ্রিয়পথেই তার অস্তিত্ব নয়, তা সর্ব ইন্দ্রিয়ের পথেই সত্য এবং মূল্যবান। অর্থাৎ বস্তুকে সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়, তার ফলে বস্তুর অজ্ঞাত এবং অপরিচিত রূপটি হয়ে ওঠে পরিচিত, স্পষ্ট এবং সেই কারণেই সত্য। আর তার মধ্য দিয়েই বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হল প্রসারিত। আগেই বলেছি প্রচলিত অলংকারগুলির সূক্ষ্ম শরীরী রূপ এখানে দুর্লক্ষ্য না হলেও, প্রচলিত অলংকারের কাঠামোর মধ্যে এদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে না। রৌদ্র যেখানে গন্ধময়, জ্যোৎস্না যেখানে মনীষাদীপ্ত, আকাশ নিশিত, আনন্দ নির্ধূম সেখানে শুধু আলংকারিক কারুকার্যই চরম নয়, কবির বিশেষ বোধের দ্বারাই ইন্দ্রিয়বোধের শ্রেণীবিভাগ বালির প্রাচীরের মতো দুর্বল এবং শিথিল। একদিকে যেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইন্দ্রিয়বোধের শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তন। অন্যদিকে বৈপরীত্যের categoryগুলিকেও ভেঙে ফেলা। আগুনকে শীতল বলায়: আগুনের উষ্ণতার বোধের সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হল, এবং সেই আগুনে বিপরীত গুণ আরোপ করে ভেঙে দেওয়া হল আগুনের ধর্মের নির্দিষ্টসীমা। বস্তুজগতের মতোই কবি অনুভূতির জগতের সীমা ক্রমশই বাড়িয়ে চলেছেন। 'নির্ধূম আনন্দ'-এর মধ্যে এক "ধূমান্বিত" আনন্দের বৈপরীত্য যদি আনন্দের বোধের স্তর পর্যায় বাড়িয়ে দেয়, তেমনই তার ধূমহীনরূপ আনন্দকে করে তোলে বস্তুর প্রত্যক্ষ; আর জ্যোৎস্নার মনীষায় পদগুচ্ছের সামনে এসে উপলব্ধি করা যায় জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট শরীরী অস্তিত্ব। 'কমলালেবুর করুণ মাংসে' এই ইন্দ্রিয়বোধের বৈপরীত্য বোধের চরম বিপর্যয়। প্রকৃতপক্ষে এই একটি পদগুচ্ছই জীবনানন্দের কবিতার ভাষার চরম বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়ে আছে, কবির জীবনবোধের প্রতিফলন যে কী ভাবে তাঁর ভাষার ওপর হয়, কী ভাবে মাধ্যম তার সত্তা হারিয়ে নিজেই কবিতা হয়ে ওঠে তার উজ্জ্বল অভিজ্ঞান এই পদগুচ্ছ। প্রচলিত বোধের দুটি বিপর্যয় এখানে স্পষ্ট: "কমলালেবুর...মাংস" এবং "করুণ মাংস"। প্রথম পর্যায়ে একটি সুডোল, রক্তিম ফল তার উদ্ভিদ্-সত্তাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর প্রাণীজগতে প্রবেশ করেছে, এবং সমগ্র কবিতার

পটভূমিকায় দেখি মানবপ্রাণ কমলালেবুতে পরিণত হয়েছে, তার দেহ নীল হয়েছে ঐ ফলে, আর সেই জন্যই ঐ ফল-ও আকস্মিকভাবে নিয়েছে নবীন জন্ম। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'করুণ মাংস' 'মাংসের' রূপ, ধর্ম সমস্ত কিছুকেই পরিপূর্ণ ভাবে বদলে দিয়েছে কারুণ্যের স্পর্শ দিয়ে। সমগ্র বিশ্বের সব আপাতঃ শ্রেণীবিভাগ তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, যে কোনো ভাব যে কোনো বস্তুতে, যে কোনো বস্তু, যে কোনো ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কবিতার জগৎ হয়ে উঠেছে এক বিস্তীর্ণ মায়াবী জগৎ। যে আদিম কল্পনা, মহাকাব্যে কিংবা রূপকথায় দেখা দিয়েছিল, যেখানে প্রাণ যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো রূপ নিতে সমর্থ, সেই কল্পনার পুনর্জন্ম শুধু এখানে দেখছি না, দেখছি তার অগ্রগতি—আদিম কল্পনায় প্রাণ শুধু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে, ভিন্ন ভিন্ন দেহে সঞ্চারিত হতে পারে; কিন্তু বস্তুর বা অন্য দেহের পরিবর্তন তাতে ঘটে না, তারা শুধু আধার মাত্র। জীবনানন্দের কবিতায় শেষ পর্যন্ত আধার ও আধেয় উভয়েই উভয়কে পরিবর্তিত করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথে এই কৌশলের একটি রূপ যে দেখা দিয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুপরিচিত 'রৌদ্রময়ী রাত্রি', কথার 'সুরের হোমানলে' জ্বলে ওঠা, 'বেদনার গন্ধ', 'স্বপ্নস্বরূপ···কৃষ্ণ বনের মন্ত্র রবে গেল হারায়ে', 'প্রথম ব্যথার বাঁশী', 'অন্ধকারের কলশব্দ', 'ভীরু বাসনার অঞ্জলি', 'কান্না তাদের রইল পড়ে শীর্ণতৃণের কোলে'—প্রভৃতি কয়েকটি ইতস্তত উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে ইন্দ্রিয়বোধের রূপান্তর, বৈপরীত্যের সম্ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর সুবিস্তীর্ণ কাব্যজগতের বহুবিচিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতার ভাষায়। জীবনানন্দ এই পথে অগ্রসর হয়েছেন এবং ক্রমশই রবীন্দ্রনাথের পথ থেকে আরো দূরে, আরো অপরিচিত, আরো অস্পষ্ট পথে পরিভ্রমণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কবিতার উদাহরণ দিতে চাই।

কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস তেমনি সুপ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ-অন্ধকার থেকে নেমে।

কবির ইন্দ্রিয়ময়তার কোমল এবং নিবিড় স্পর্শ এর প্রতি ছত্রে। সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় এর মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধের দ্রুত উত্তরণ—এক বোধ থেকে অন্য বোধে। ভোরের আলো কবির সঙ্গে বর্ণময় সবুজ; কিন্তু শুধু বর্ণময়ই নয়, তা নরম, একসঙ্গে নয়ন ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সমাহার। স্পর্শ ও দৃশ্যের সমাহার সংহত হয়ে আছে একটি উপমায় 'কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজে'। তার বর্ণকে আরো গভীর, স্পর্শকে আরো স্নিগ্ধ করে তুলেছে 'কাঁচা বাতাবির' প্রসঙ্গ—আর সঙ্গে এসে মিশেছে ঘ্রাণ। কবি দ্রুত গতিতে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন রসনার বোধ একটি ছবিতে—"হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।" এইবার কবি এই দৃশ্য গ্রাহ্য, স্পর্শ এবং ঘ্রাণের জগৎকে পরিবর্তন করতে শুরু করলেন। পদার্থ বিদ্যায় যেমন শুনেছি একটি শক্তির আর একটি শক্তিতে পরিবর্তিত হওয়ার কথা—তাপশক্তি পরিবর্তিত হয় বৈদ্যুতিক শক্তিতে। বৈদ্যুতিক শক্তি পরিবর্তিত হয় চৌম্বক শক্তিতে—সেই রকমভাবে কবি এক একটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়কে পরিবর্তিত করে চলেছেন অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে। 'ঘাসের ঘ্রাণ' পরিবর্তিত হয়ে গেল "হরিৎ মদে'—শুধুই তরল পদার্থে নয়, বর্ণাঢ্যতায়। ঘ্রাণ শুধু স্পৃশ্য নয়। আস্বাদ্য নয়, বর্ণাঢ্য। এই যে ইন্দ্রিয়ময়তা—এক ইন্দ্রিয় থেকে অন্য ইন্দ্রিয়ে উত্তরণ—এখানেই জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথ তথা সমস্ত বাঙালী কবিদের থেকে সচেতন স্বতন্ত্র পথ রচনা করেছেন। এই পথের তিনি অনন্য পথিক। এই ইন্দ্রিয়বোধের সচেতন বিপর্যয় স্বভাবতই তাঁর কবিতাকে জটিল করে তুলেছে, যে জটিলতার মধ্যেই তাঁর জগৎ-বোধ প্রতিবিম্বিত। জীবনানন্দের কালচেতনার অবিচ্ছিন্নতা বোধ, অনন্ত কাল ও সমকালের সমীকরণের চেষ্টা, বর্তমানের হতাশা ও প্রত্যয়ের সহাবস্থান—এই সব মিলিয়ে তাঁর কাব্যকর্মে জটিলতার রেখা। কিন্তু জটিলতার রেখাগুলি অতিক্রম ক'রে যতই তাঁর কাব্য প্রাণের সমীপবর্তী হওয়া যায় ততই তাঁর অভিজ্ঞতার নূতন রাজ্যের সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন তাঁর কবিতার ভাষার মধ্যে এই দ্রুত চাঞ্চল্য, বস্তুবিশ্ব ও ভাববিশ্বের বিরোধ স্তব্ধ হয়ে আসে। এই কবিতার শেষে দেখি, কবি ক্রমশই সেই বস্তু ও ভাবের বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছেন। ঘাস এবার শরীরী, তাকে চোখে প্রত্যক্ষ করি, ঘাস যেন বিশ্বব্যাপ্ত বিহঙ্গমা ('ঘাসের পাখনা') আর কবি সেই ঘাসের সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে চেষ্টিত, শুধু তাকে স্পর্শ করা নয়, শুধু তার ঘ্রাণের মদ পান করা নয়, প্রবল ইচ্ছা 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই।' ছিন্নপত্রের এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "অন্তজীবনের গূঢ় পুলকে একদিন গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম"—এর পেছনে যে বিশ্বাত্ম-

বোধ, বিশ্বপ্রাণধারার সঙ্গে একাকার হয়ে থাকার আনন্দ তার সঙ্গেও জীবনানন্দের প্রভেদ গভীর। রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বের অনিঃশেষ ধারায় ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রকাশ, আমিত্বের অবিরাম 'হয়ে ওঠা'। জীবনানন্দে 'হওয়া' এবং 'হয়ে ওঠার' দ্বন্দ্বের অবসান। নিবিড় ঘাসমাতার শরীরের অন্ধকার, ('সুস্বাদ অন্ধকার' 'অন্ধকার' আবার পরিবর্তিত হচ্ছে অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বরূপে) যা জন্মের আদি রহস্যলোক, সেই জন্মের রহস্যসূত্রে মিলিত বিশ্বজগৎ তাদের বাইরের রূপ-ভিন্নতাকে অধীরভাবে অস্বীকার করতে চাইছে, সেই ভিন্নতাকে ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি পথে পরীক্ষা করতে চাইছে এবং শেষ পর্যন্ত এল আত্মবিলয়ের প্রবল বাসনা—যা অবসানের নয়, পরিপূর্ণতার; 'হওয়া' এবং 'হয়ে-ওঠার' দ্বন্দ্ব যেখানে শেষ। চেতনার সব categoryর প্রকাশ ভাষাতেই, আর অনুভূতির জগতে যখন শ্রেণীবিভাগের প্রাচীর ভেঙে পড়ে, তখন তার প্রতিফলন ঘটে ভাষাতেই। সেইজন্য কবিতার ভাষা তাঁর অনুভূতির সব সংগ্রাম ও সিদ্ধির পরিচয়॥

সময়গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র হেমন্তের জগতে স্বভাবতই ফুলের প্রসঙ্গ প্রায় অনুচ্চারিত। ইএট্স যে অর্থে ডরোথি ওয়েলেসলিকে বলেছিলেন, Why can't you English poets keep flowers out of your peotry?—কবি জীবনানন্দের এই ফুল-বিমুখতার সঙ্গে সে অর্থের কোনো সংযোগ নেই। এই অনুচ্চারণ একটা অস্তিবাচক সত্য। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ নজরুলের রৌদ্ররাগ এবং পুষ্পরাগের পরিমণ্ডল পেরিয়ে সেই ধূসর ম্লানতায় প্রথম প্রবেশ করলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। যে সন্ধ্যায় মনে হয়, সূর্যাস্তের ওপারের স্বর্গের কথা, এ সন্ধ্যা সে সন্ধ্যা নয়। এ হেমন্তের সন্ধ্যায় যেন কোনো দুর্মর অন্ধকারের বার্তা পাওয়া গেল। তাই ধূসর পাণ্ডুলিপিতে কবিসত্তার স্বনিয়মী স্বাভাবিকতায় ফুলের ব্যবহার ঘটে নি বললেই হয়। ক্বচিৎ এক আধটি শসাফুল, বিনষ্ট শসার পাশে, অথবা বাসি বকুল বা ছেঁড়া করবীর এক আধটি পাপড়ি ফুলের বিস্মৃতিকে রোধ করার জন্ম প্রয়াসী। নতুবা ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে ফুল নেই। ফুল নেই সে সন্ধ্যায়—সে অভবিষ্য অস্পষ্ট অনালোকে মৃত প্রেমিকাদের মুখের মতো বিমর্ষ নক্ষত্রেরা ফুটে উঠেছে। জীবনানন্দের সমগ্র কবিজীবনে অতঃপর নক্ষত্র স্থায়ী কাব্যপ্রসঙ্গ। ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে এবং কমবেশী তারপরেও জীবনানন্দ শুধু হেমন্তের কবি নন—হেমন্ত সন্ধ্যার কবি। কেবলমাত্র হেমন্তের অনুষঙ্গ, অন্তত বাংলাদেশে কিছুতেই বিষণ্ণতাবাচক নয়। হেমন্তের অনুষঙ্গে ফসল তোলার আশা আনন্দই বাঙালী কৃষকের মনে জড়িত। কিন্তু হেমন্ত সন্ধ্যার নিরুত্তমতাকে জীবনানন্দ অন্যতর অর্থে নিযুক্ত করতে পেরেছেন। বিশ্বব্যাপী যে স্লাম্প বাঙালী যুবকেরও উত্তাপ ও উৎসাহকে জুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল জীবনানন্দের হেমন্ত-সন্ধ্যা কতকাংশে সেই নিরুত্তমতার প্রতীক। আর গভীরতর অর্থে ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে ক্রমশই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জীবনানন্দ মানুষের বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের কবি। আক্ষরিকভাবে বাস্তববাদিতাকে যদি বেশী প্রশ্রয় দেওয়া যায় তাহলে আবারও বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যার জন্ম প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জীবনের মন্দস্রোতের কথা ওঠে। কিন্তু এ সৌন্দর্যবোধের বিপন্নতারও ইতিহাস আছে। হয়তো

তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রোমান্টিকতার ভাবসংকটের জের; জড়িয়ে আছে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী ব্যক্তির আত্মচ্যুতির অভিজ্ঞতা; জড়িয়ে আছে ক্রমবর্ধমান আত্মসংবিতের ফলে সঞ্জাত ব্যক্তির নৈঃসঙ্গের চেতনা। হয়তো শেষ পর্যন্ত এই সবকিছুরই ফলে কবিচেতনার তরঙ্গ এক উপলব্ধির তটে প্রহত হয়েছে— মৎস্যকন্যাদের গান আমাকে উদ্দেশ্য করে নয়। কবি জীবনানন্দের মধ্যে মানুষের সেই বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের চেতনা নক্ষত্রের প্রতীকে রূপস্থ হয়ে উঠেছে। 'বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল', আর, নারকোল নাড়ু বিতরণকারিণী, বাসমতী চাল-ধোয়া-হাতে বিনুনি-বাঁধা মেয়ে সেই চেতনারই ইঙ্গিত নিয়ে পরে দেখা দিয়েছে।

বিষণ্ণ হেমন্তের যে অন্ধকার প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের এবং সভ্যতার তৎকালীন নিরাশ্বাস উদ্যমহীনতার ছায়া, সে-অন্ধকার, সচেতন-ব্যক্তির আত্মসংবিতের যে সুযোগই দিক, তার বিষণ্ণতায় কোনো সন্দেহ নেই। এ অন্ধকারে নক্ষত্রই একমাত্র আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের সূর্যের আলোকে যে অনাহত সৌন্দর্যচেতনা পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে বিকীর্ণ হয়েছে, আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা এঁকেছে, জীবনানন্দীয় জগতে সে প্রত্যয় নেই—থাকার কথাও নয়। অন্ধকার সেখানে সমাসন্ন, কুয়াশায় কম্পমান নক্ষত্রটুকুই সেখানে ভরসা। তখন আমরা কেউ কেউ ভেবেছি যে সূর্যের আলোকে সেখানে জীবনের প্রসন্ন পাঠ সম্ভব নয় নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোকেই সেই অন্ধকারকে যথাসম্ভব এড়াতে হবে। এই নক্ষত্র প্রেমের প্রতীক, এই নক্ষত্র শাশ্বত জীবনের প্রতীক, এই নক্ষত্র ব্যর্থ মানুষের সন্ধ্যায় নিজের কাছে (নীড়ে) ফিরে আসার প্রতীক। ধূসর পাণ্ডুলিপি-র এই কম্পমান নক্ষত্রকে দেখলে একথা মনে না হয়ে পারে না যে জীবনানন্দ যতটা নূতন চেতনার উন্মেষের কবি, তার চেয়ে তিনি অনেক বেশী পুরাতন চেতনার বিদায়ের কবি। সৌন্দর্যের মতোই মানুষের সম্ভোগের বিপন্নতাকে জীবনানন্দ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয়-বাসনায় জীবনের স্বাদুতার স্মৃতি দুর্মর, কিন্তু মুমূর্ষু।

(১) বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ…বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

(২) ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

নীলাভ নোনার বুকে রস ঘন হয়ে আসা, অথবা 'মেয়েমানুষ' শব্দটির প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সেই গুণ প্রকাশমান বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন শারীরিকতা। কিন্তু এ শারীরিকতাকে কোনো অর্থেই পঞ্চেন্দ্রিয়পরায়ণতা বলা যাবে না। বরঞ্চ একে বলা যাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্মৃতিসচেতনতা। উদ্ধৃত অংশ দুটিতে পঞ্চেন্দ্রিয়-পরায়ণতার লক্ষণ যতটা পরিস্ফুট, তার চেয়ে বেশী ফুটে উঠেছে পঞ্চেন্দ্রিয় আকুলতা। যৌবনের অস্তায়মান রক্তরাগকে দেখে ক্লান্ত প্রৌঢ়ের যে করুণ স্মৃতি এক অশরীরী আকুলতার জন্ম দেয় এই আকুলতা সেই জাতীয়। এখানেও সন্ধ্যার স্মৃতি অনিবার্য কাব্য-প্রসঙ্গ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই সন্ধ্যার আকর্ষণেই ফুটে উঠেছে জীবনানন্দের নক্ষত্রেরা।

(ক) তুমি আর আমি
ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মত চুপে থামি
সেইখানে রব পড়ে
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝরে।

(খ) মানুষের অন্তরের অবসাদ—মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায় ;—নক্ষত্রের সাথে কয় কথা
যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাতে—
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন সে এক অধীরতা
তাই লয়ে সেই উষ্ণ আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘ, নক্ষত্রের মত রব নক্ষত্রের সাথে।

(গ) জীবন পুড়িয়া যায়—আমরাও ঝরে পুড়ে যাই
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জলিবার মত শক্তি—তবু শক্তি চাই।

(ঘ) তোমার পায়ের শব্দ গেল কবে থামি'
আমার এ নক্ষত্রের তলে!
—জানি তবু—নদীর জলের মত পা তোমার চলে ;—

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে যে অন্ধকার এবং নক্ষত্রের ছবি ও প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে তার সঙ্গে জীবনানন্দের নক্ষত্র প্রসঙ্গের অমিলটুকুও লক্ষণীয়।

(ক) যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে ॥

(খ) প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার মাঝে অমনি ফোটে তারা।

(গ) আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মত রাজে।

(ঘ) আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।

রবীন্দ্রনাথের গানে 'তারা' এক নিঃসন্দিগ্ধ আশ্বাসের বার্তাবহ। অন্ধকারের পরাভবের ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর নক্ষত্ররাজিতে, তাঁর নিশীথ আকাশের তারার মেলায়। জীবনানন্দের নক্ষত্রের ভিতরে এই আশ্বাসের প্রেরণার চেয়ে আশ্বাসের জন্য কবির আকুলতাই ফুটে উঠেছে বেশী। সেখানে নক্ষত্রের দীপ্তি অপেক্ষা তার শুদ্ধ প্রশান্তিই প্রধান কথা। তাই বুদ্ধদেবের অসামান্য কবি-পরিচিতির প্রথম চরণ যতটা সত্য, (সে পথ নির্জন যে পথে তোমার যাত্রা,) ঐ কবিতাটির শেষাংশ—(একটি জলন্ত তারা আকাশের জলন্ত হৃৎপিণ্ড যেন এঁকে যায় সেই পথ…)—ততটা জীবনানন্দের কবিত্বের পরিচয়বাহী হয় নি। আকাশের জলন্ত তারা জীবনানন্দের নয়। সে আকাশ অধিকাংশ সময়ে কুয়াশায় আত্মলীন এবং ম্লানতায় স্বপ্নগাঢ়। নক্ষত্রে সেখানে শুশ্রূষার সংকেত।

নক্ষত্রের সংকেতের সাহায্যে যে সন্ধ্যাকে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় গাঢ় করে তোলেন সেই সন্ধ্যারই আকর্ষণে জীবনানন্দ সৃষ্টি করেছেন তাঁর আর এক গূঢ়ার্থসঞ্চারী কাব্য-প্রসঙ্গ। এ কাব্য প্রসঙ্গটি হল নীড়। এখানেও দেখা যাবে যে-নীড় রবীন্দ্রনাথের সে-নীড় জীবনানন্দের নয়। রবীন্দ্রনাথ নীড়ের প্রতি মমতাসম্পন্ন নন। রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পিপাসায় যে অর্থ-গৌরব তারই বিপরীত ব্যঞ্জনা 'নীড়' শব্দটিতে ধ্বনিত। প্রেমপাত্রীকে চিরবিদায় দেবার মুহূর্তেও তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নায়ক নীড়ে-ফেরা পাখির বিক্ষোভে নিজের বিবর্ণ মনের ছবি খুঁজে পায়। 'নীড়ে ফেরা পাখি যবে/অস্ফুট কাকলি রবে/দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে'—প্রভৃতি অংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু জীবনানন্দ যে নীড়-প্রসঙ্গ সৃষ্টি করেন সে নীড় বহুলাংশে আশ্রিত-বৎসল। জীবনানন্দেরই সৃষ্ট সন্ধ্যার অনুষঙ্গ-বাহী সেই নীড়। আকাশ পরিক্রমায় যেখানে নিরর্থকতা-জনিত ক্লান্তি, নীড়ের জন্য বিধুরতা সেখানে অনিবার্য। এখানে আবার স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পিপাসা রেনাশাঁসের জাগ্রত ব্যক্তির ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আত্মীয়তাবদ্ধ। স্বভাবতই প্রথম মহাযুদ্ধের পরে উনিশের শতকের বাঙালীযুবকের সেই ব্যাপ্তির বাসনা নানা নিরুত্তাপে হিম হয়ে গেছে। জীবনানন্দ এই সময়ের পটে দাঁড়িয়েই সন্ধ্যার ম্লান কুয়াশায় নীড়ের কল্পনা করেছেন। নীড় নক্ষত্রের মতোই কবির আবেগের, স্মৃতির, কল্পনার আশ্রয়। যেখানে প্রত্যক্ষ-

ভাবে 'নীড়' ব্যবহৃত হয় নি সেখানেও প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ বা আশ্রয়ের প্রসঙ্গ নীড়ের কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। যেমন :

(ক) আমাদের অবসর বেশি নয়—ভালবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—
আমাদের ডেকে লয়—তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা—অবসন্ন হাত।

(খ) পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

(গ) সন্ধ্যায় কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে।

(ঘ) সূর্যের আলোর পরে নক্ষত্রের মতো আলো জ্বেলে
সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে।

(ঙ) ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চলে যাই ; কোন এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে ?
পাখীর মায়ের মত আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে—অন্ধকারে—অন্য কারো আকাশের থেকে।

এইবার এর সঙ্গে রূপসী বাংলার নীড়—মমতায় মাখা কবিতাগুলির কথা এবং বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের নীড় প্রসঙ্গকে যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে একথা দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হয় যে জীবনানন্দের কল্পনার প্রবল আশ্রয় সন্ধ্যার নীড়। অথচ জীবনানন্দ জানেন এ নীড় নিয়তির মতো উদাসীন এক বিরুদ্ধ শক্তির হাতে কত সহজে ভেঙে যায়।

(ক) —চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা ঠাণ্ডা কড়কড়—

(খ) ধানকাটা হয়ে গেছে কবে যেন ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত

তাই এ অনুমান নিরর্থক নয় যে নীড়ের আকর্ষণে পাখি এবং পাখির জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার অনুষঙ্গে ব্যাধ, আবার ব্যাধের অনুষঙ্গে হরিণের প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কবিজীবনের প্রথম অধ্যায়ে এক চমৎকার কল্পনা-বলয়ের সৃষ্টি করেছে :



ধূসর পাণ্ডুলিপি-র ক্যাম্পে এবং বনলতা সেনে-র শিকার কবিতা দুটি এইসূত্রে পৃথকভাবে স্মরণীয়। দুটি কবিতাতেই মৃত্যুর একটা বিমর্ষ পরিবেশ সৃষ্টির করা হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় অস্তিবাদের যে প্রভাবটুকু অনুভব করা যায় তার সূত্রপাত এখানে। তবু এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে জীবনানন্দের কবি-কল্পনায় মৃত্যু-চেতনা শেষ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। মৃত্যুকে জীবনানন্দ যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা অস্তিত্ব-বাদীর দৃষ্টি নয় বলেই এমনটা ঘটেছে। জীবনানন্দ মানুষকে বিশ্ব-জীবনের মাঝখানে অকারণে নিক্ষিপ্ত এক সত্তা বলে মনে করেছেন বটে, কিন্তু তাকেই চূড়ান্ত বলে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পেরেছেন এ ধারণার যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া যায় না। এ কথার প্রমাণ-স্বরূপেই উল্লেখ করা চলে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'সুচেতনা' কবিতাটি :

মাটি পৃথিবীর টানে মানব জন্মের ঘরে কখন এসেছি
না এলেই ভালো হ'ত অনুভব করে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;

উদ্ধৃত অংশের শেষ দুই পদে যে-উপলব্ধি তা কিছুতেই মানুষের নিরর্থকতার অঙ্গীকার নয়। মানুষের চেতনার অগ্রাধিকার অবশ্য ওখানে স্বীকৃত। কিন্তু তার পরম প্রেমে সেই চেতনারই সারাৎসার। তাই সেই প্রেমের প্রতীক যে-নারী সে সুচেতনা। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের 'আমি' ধূসর পাণ্ডুলিপি-র 'আমি' অপেক্ষা সত্তার গভীরতার ধ্বনি আরো বেশি ঝংকৃত করেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যে ছিল দ্রষ্টামাত্র—'বনলতা সেন'-এ সে নিজের পথিক অস্তিত্বের

আবহমানতা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে 'আমি পথ হাঁটিতেছি' এ কথার চেয়ে আরো সত্য 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর/ কেন যেন ; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর'। তাই 'বনলতা সেন'-এ পথিক এবং নাবিকের শ্রান্ত রক্তের মন্থরতায় সংবিতের অনাসক্ত মূল্যায়ন কবির অভীপ্সা। বারে বারে ভূমধ্যসাগরের কূলবর্তী নিবে-যাওয়া-সভ্যতাগুলির কথা মনে পড়েছে। সমুদ্রগামী সেই সব নাবিকদের দূরাগত ক্লান্ত গুঞ্জনে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের অন্তহীন প্রয়াসের কথা। এই সব প্রয়াসের অন্তহীনতা এবং হয়তো নিরর্থকতা, শেষ পর্যন্ত আর এক সাধ্য খুঁজে পাবে প্রেমে। এই সাধ্যসাধন-মীমাংসা 'বনলতা সেন'-এর কবিকল্পনার উপজীব্য :

মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

সেই সাধনারই লক্ষ্য সুচেতনা—যার অপর নাম ; 'মানুষের তরে এক-মানুষীর গভীর হৃদয়'। নিজ কবিজীবনের এই অংশে জীবনানন্দের মুক্তি ঘটেছে প্রারম্ভিক শারীরিকতার হাত থেকে। এই মুক্তিই পরিণতি পেয়েছে বনলতা সেন পেরিয়ে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য়। তখন ধূসর পাণ্ডুলিপি-র সেই ইন্দ্রিয় সচেতনতা আর নেই। 'মেয়েমানুষ' শব্দটি এখন অনুচ্চার্য। বেলা অবেলা কালবেলা-য় প্রধান কল্পনাসঞ্চারী শব্দ 'মহিলা'। এই মহিলা যিনি মননলোককে স্পর্শ করেন—যিনি অপূর্ববস্তু রচনা করেন প্রত্যেক মানবহৃদয়ে, তাঁর শক্তিকেই প্রতিভা বলা হয়েছে। এই চেতনা আকাশীনতার মতো দ্যুতিময় বলে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় মহিলারই সংস্পর্শে নক্ষত্র শব্দটিরও ব্যঞ্জনাগত পরিবর্তন ঘটেছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে বনলতা সেন পর্যন্ত সৃষ্টি পর্যায়ে জীবনানন্দের কবিতায় এক বিশেষ স্বরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। 'হাওয়ার রাত' বা তার মতো দু একটি কবিতা বাদ দিলে এই সময়ের জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতার পাঠ-জনিত প্রতিক্রিয়ায় এক বিষণ্ণ পঞ্চমাঙ্ক নাটকের শেষ দৃশ্যের আবহাওয়া, ও অনুভূতি তুলিত হতে চায়। যেন শুধু কোনো শত শতাব্দীব্যাপী প্রয়াসের অন্তহীনতাকে জানা গেল, যেন অপরিহার্য নিরর্থকতাকে মেনে নিতে হল—নায়কের কণ্ঠে তারই বিষণ্ন স্বগতোক্তি। আসন্ন যবনিকাকে উপেক্ষা করে কথাগুলি নীরব প্রেক্ষকের উদ্দেশ্যে বিনা সম্বোধনে অন্ধকারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক একটি কবিতা আছে যাকে মনে হয় কোনো আন্তরিক কাহিনীর শেষাংশ। ধূসর পাণ্ডুলিপির 'পঁচিশ বছর পরে', বনলতা সেনে-র 'কুড়ি

বছর পরে,' 'ধান কাটা হয়ে গেছে,' 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' এবং 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' এ জাতীয় কবিতা। এই দুই ধরনের কবিতার আত্মায় জড়িয়ে রয়েছে এক সমাপ্তি-বোধ। ধূসর পাণ্ডুলিপি-র নক্ষত্র-প্রসঙ্গের সেই জনক। সমাপ্তি-বোধ স্থায়ীভাব। সঞ্চারী হিসেবে দেখা দিয়েছে কখনো নির্বেদ, কখনো ক্লান্তি, কখনো বা শান্তির নির্লিপ্তি। এই সমাপ্তি বোধের পিছনে রয়েছে কবির প্রচ্ছন্ন আত্মজ্ঞান। সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাঁর দর্শন-স্থবির অহমের অন্তর্গত করে নিয়েছেন। এর ফলে জানার সমাপ্তি ঘটেছে। যে সমাপ্তি-বোধ জীবনানন্দের কবিতায় 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে কখনো কখনো ক্লান্তির স্বরও বাজিয়েছে তারও মূলকথা ঐ জ্ঞানের সমাপ্তি। নায়ক বলছেন—আমার জানা শেষ হয়েছে এই কারণে, যে অবিরাম জেনে চলার সাধ আর আমার নেই।

সুতরাং কবি ঠিকই জেনেছিলেন যে এই সমাপ্তির অনুভূতিকে সঞ্চারিত করার জন্যে এক কালগত সুদূরতার অভিব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা দরকার। এই শৈল্পিক উপলব্ধির সূত্রেই জীবনানন্দের কবিতার আবয়বিক রহস্যও উন্মোচিত হতে পারে। স্থানগত এবং কালগত সুদূরতাকে ব্যঞ্জিত করার জন্যই দীর্ঘস্বর-ধ্বনির প্রতি জীবনানন্দের পক্ষপাত। দীর্ঘ স্বরধ্বনি, বিশেষ 'আ'-স্বর জীবনানন্দের উক্ত উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষ সহায়ক।

(ক) প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের পর
এই সব ত্যক্ত পাখী কয়েক মুহূর্তে শুধু :—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে,—পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে ;

(খ) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ;

(গ) কাল তারা অতি দূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘবর্শা হাতে
করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—

(ঘ) মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;

(ঙ) মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী-শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা
আর তুমি নারী—

ভাবছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের সাযুজ্য জীবনানন্দের স্বভাবতই অন্যতম অন্বেষা। যেসব মুহূর্তে তাঁর কাব্যছন্দ কথ্যছন্দকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি সে সমস্ত মুহূর্তে তাঁর ভাবছন্দের চারিত্রই অধিকতর আধিপত্যপরায়ণ। পূর্বে কথিত সমাপ্তি-বোধকে সার্থক করে তোলার জন্য নাবিক-ক্লান্তি এবং পথিক-ক্লান্তির যে-পটভূমিকা দরকার 'আ' ধ্বনি কালদৈর্ঘ্যকে ফুটিয়ে তুলে সেই ক্লান্তিকে মূর্ত করছে। এই প্রয়োজন মেনে নিয়েই জীবনানন্দ লৈখিক ক্রিয়াপদকে একেবারে বিদায় দিতে পারেন নি। বনলতা সেন কবিতাটির প্রথম এবং শেষ চরণের লৈখিক ক্রিয়াপদ দুটি এখানে স্মরণীয়। 'হাঁটিতেছি'-র বিলম্বিত স্বরধ্বনি ছাড়া হাজার বছরের ক্লান্তিকে ধ্বনিত করা যেত না। আবার শেষ চরণের 'বসিবার' ক্রিয়াপদটিই সমস্ত পাঠকহৃদয়কে এক অন্তহীনতার মাঝে নিক্ষেপ করে গেল। এবং এই প্রকরণের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই জীবনানন্দ বলেন :

…তাই বলে কবিতার মানে পাঠকসমাজে নির্বিশেষে বিমুক্ত করতে গিয়ে যে যুগে ও যে দেশে আমি রয়েছি সেখানকার মানুষের মুখের ভাষায় কবিতা লিখব এরকম, বা যে কোনো রকম সংকল্পে কবিতা উতরায় না, সংকল্পের সঙ্গে কবিতার সংস্রব নেই বলে নয় ; সংস্পর্শ রয়েছে ; সার্থক কবিতা হয়তো মুখের ভাষায় ফুটে উঠবে, কিংবা ঠিক মুখের ভাষা নয় এমনি কোনো ভাষায় ; কিন্তু কোনো বিশেষ বাগ্‌রীতিতে বা অর্থে লেখা উচিত এই সংকল্পের ভিতর থেকে নয়।

[—কবিতার কথা ; মাত্রাচেতনা : জীবনানন্দ দাশ।]

নিজ কবিজীবনে জীবনানন্দ যে কারণে তাঁর কবিস্বরের বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার ব্যাখ্যা এখানে তিনি দেন নি। তিনিও একটি সংকল্পই নির্মাণ করেছেন মাত্র। এবং এই সংকল্প তাঁকে সব সময়ে শৈল্পিক সার্থকতার পথ দেখায় নি। ধূসর পাণ্ডুলিপি-তেই এই বাক্‌ছন্দ-সংক্রান্ত ভ্রান্ত পদক্ষেপের নিদর্শন তুলনাগতভাবে বেশী।

(ক) হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ মরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর
বিছানার পর

(খ) কারণ,—অনেক অশ্রু—রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে
আমরা রাখিতে আছি, জীবনের এই আলো জেলে

(গ) সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাত্রির মতন
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বারবার।

এই রকম আরো কিছু জায়গায় লৈখিক ক্রিয়া ও মৌখিক ক্রিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা শৈল্পিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপন্থী হয়েছে। 'বিয়োবার দেরী নেই

আর'—এখানে 'বিয়োবার' শব্দে আপত্তি নেই। যে নারীর রূপ ঝরে যাবে তার সম্বন্ধে আচম্বিত অপভ্রম তাৎপর্যবিহীন নয়। কিন্তু 'বিয়ায়ে গেছে' এই উদ্ধৃত অংশে লৈখিক ক্রিয়াভঙ্গীর সঙ্গে একান্তই প্রাকৃত ক্রিয়াটির মিলন সাধন সম্ভব হয় নি। 'রাখিতে আছি' এবং 'উঠিতে আছে' একদিকে লৈখিক ক্রিয়াপদ আবার অন্যদিকে জেলা বিশেষের বাগ্‌রীতির বিশেষত্বের স্মারক। এই অবৈধমিলনও কার্যকর হয় নি।

কিন্তু তাই বলে আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে জীবনানন্দের কানে কথাছন্দের গুরুত্ব ধরা পড়ে নি। শাব্দিক বিন্যাসে জীবনানন্দের পারঙ্গমতা বহুশ্রুত। তাঁর কোনো কোনো কবিতার অংশাবশেষ এক্ষেত্রে আলোচ্য হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ছন্দের প্রতিমুখেই যেন কথ্যছন্দকে ধরে দিয়েছেন জীবনানন্দ। যেমন :

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি. হে সূর্য, হে মাঘ নিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন ?

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আর ; উদ্ধৃত অংশটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটির দীর্ঘ স্বরধ্বনি জীবনানন্দের ঈপ্সিত ক্লান্তিকে ধারণ করে রয়েছে। আত্মহত্যার বাসনা অস্তিত্বের নিরর্থকতা থেকে উদ্ভূত। সে অস্তিত্ব সকল সংগ্রামে বীতরাগ। তার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ। তার ক্লান্তিও দীর্ঘ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির সটান কথ্যভঙ্গি শেষ নিদ্রাতুরের বিরক্ত প্রতিবাদ। প্রথম চরণে নিদ্রাচ্ছন্ন স্খলিত গতি—দ্বিতীয় চরণে রূঢ় চমক। এ প্রতিবাদ তাদের প্রতি যারা অস্তিত্বের সার্থকতার কথা কাব্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে স্মরণ করিয়ে দেয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির দীর্ঘস্বরগুলির সঙ্গে যোগ দিল মহাপ্রাণ বর্ণের স্তিমিত প্রয়োগ—দীর্ঘশ্বাসের ব্যঞ্জনা এল। অতঃপর পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে আবার দ্বিতীয় চরণটিই ফিরে এল—শুধু 'কেন' শব্দটি স্থানবদল করে একটা আর্ত মিনতিকে ধ্বনিত করেছে। এর পরেই অরব অন্ধকারে অপরিচিত-বিলুপ্তির বাসনা—'অরব' বিশেষণটি নীরবের পারিবর্ত শব্দ মাত্র নয়। 'অরব' শব্দে নীরবের মিষ্টতা নেই। বিশেষণটিই ইতিপূর্বে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি বলেই অপরিচিত। তার কাজ হল অন্ধকারের কঠিন অব্যাখ্যাত শূন্যতাকে ফুটিয়ে তোলা। এই শূন্যতার অনুভূতিকে বারে বারে জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় নানাভাবে মূর্ত করতে চেয়েছেন।

'অন্ধব অন্ধকার', 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে', 'পাখির নীড়ের মতো চোখ', 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ', 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো', প্রভৃতি বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় শব্দচিত্রের মধ্যে তাঁর কবিভাষার গূঢ় রহস্য স্পন্দিত। এগুলি তাঁর কাব্যের স্বতন্ত্র স্বরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এই স্বর-স্বাতন্ত্র্য, সকল কবির ক্ষেত্রেই যেমন তাঁর ক্ষেত্রেও তেমনি, তাঁর জীবন-দৃষ্টির দান। 'অন্ধব অন্ধকার' এবং 'উটের গ্রীবার মত কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে'—এই দুই ক্ষেত্রেই অন্ধকার বা নিস্তব্ধতা লক্ষ্য নয়, কবি-লক্ষ্য ছিল এক অনির্দেশ্য শূন্যতার পাত্রবস্তু নিরপেক্ষ অনাত্মীয়তাকে মূর্ত করা। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' এই উপমায় স্বভাবতই 'চোখ' কবির উদ্দিষ্ট নয়। উদ্দিষ্ট কবির নিজেরই আশ্রয়াকুল মন। আবার, যে ক্লান্ত মেয়েটির চোখ ম্লান, তার ম্লানতার অন্তর্গত স্বরূপকে আমরা জানি না বলেই বেতের ফলের উপমার সার্থকতা। 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো' আকারে উপমা, প্রকারে প্রতীক। করুণ শব্দটিই সেই প্রতীককে ধরিয়ে দিচ্ছে। ক্লান্তি, নিরর্থকতা, উদ্বেগ প্রভৃতি নানা কারণে মাতৃকল্পনা এবং মৃত্যুকল্পনা জীবনানন্দের কবিমানসকে কখনো কখনো প্রভাবিত করেছে। মাতৃজঠরে প্রত্যাবর্তন ও মরণাশ্রয়বাসনা একার্থক। মাঝে মাঝে জীবনানন্দ অতি আগ্রহে ব্যাখ্যা করে বলতে চান। তখন তাকে বাহুল্য বলে মনে হয়: 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি'। এখানে 'অনন্ত মৃত্যুর মতো' এই উক্তির আর প্রয়োজন ছিল না। করুণ শঙ্খের মতো স্তন নিঃসন্দেহে জীবনানন্দের মাতৃকল্পনের প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত প্রতীক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ধূসর পাণ্ডুলিপি-র প্রেমিকা-কল্পনা এবং বনলতা সেনের প্রেমিকা-কল্পনার মধ্যে যে পার্থক্য অনুভূত হয় তাও এই সূত্রেই বিচার্য। বনলতা সেনের প্রেমিকা-কল্পনায় জীবনানন্দের মাতৃ কল্পনার প্রভাব নাতিপ্রচ্ছন্নভাবে কার্যকর থেকেছে। প্রেমিকা সেখানে আশ্রয়দাত্রী। অন্যদিক থেকে আবার মৃত্যুর ভিতরেও সেই আশ্রয়ের ব্যঞ্জনা। তাই নারীর মাথার চুলের প্রসঙ্গ জীবনানন্দের মৃত্যু-চেতনার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে তাঁর আশ্রয়াতুর মনোভাবকে স্পষ্টতা দিয়েছে। ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে প্রেমিকা-কল্পনার এই বৈশিষ্ট্য ছিল না।

কিন্তু এত সত্ত্বেও জীবনানন্দের যে সমাপ্তি-চেতনার কথা আমরা পূর্বে বলেছি তা কিছুতেই পূর্ণতার চেতনা নয়। পূর্ণতার চেতনার জন্য যে দার্শনিক স্থিরীভবন প্রয়োজন তার অভাব জীবনানন্দে ছিল না। কিন্তু এই স্থিরীভূত দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি কোনো সংকটের সংঘাতে অর্জন করেন নি। করেন নি

বলেই এটা তাঁর কাছে সহজ আশ্রয়ের ব্যাপার ছিল। দান্তে বা রবীন্দ্রনাথ যেমন করে তাঁদের আবেগগত বিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধিক বা দার্শনিক বিশ্বাসের সাযুজ্য ঘটাতে পারেন, জীবনানন্দ তেমন পারেন নি। মানুষের প্রক্ষিপ্ততা, নিঃসঙ্গতা, তার গ্লানি ও উদ্বেগের কথা তিনি ঠিকই বলেন। তা থেকে উত্তরণের আশাও একজন মানবতামুখী ভবিষ্যৎবিশ্বাসী আবহমানতা-সচেতন ব্যক্তির মতোই তিনি প্রকাশ করেন কিন্তু এই দুই প্রান্তকে মেলাতে পারেন না। বনলতা সেন এবং অনুরূপ কয়েকটি কবিতার অসামান্য সার্থকতা সত্ত্বেও একথা সাধারণভাবে সত্য যে, জীবনানন্দের প্রায়-কবিতাতেই ভাবের কোনো অগ্রসরণ নেই। প্রথম স্তবকে বা কয়েক চরণেই কবিতাটির মূল কাজ শেষ হয়ে যায়। স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায়ই এ লক্ষণ ছিল। কিন্তু কবিতার ফুলটির চারপাশে রবীন্দ্রনাথ যে পুঞ্জিত পল্লবের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতেন তার সজীবতাও অভিনন্দনীয়। সে ক্ষেত্রে জীবনানন্দের ভরসা ছিল তাঁর মননলব্ধ বিশ্বাস। এর যে সীমাবদ্ধতা তার দায় তাঁকে ভোগ করতেই হয়েছে। হ্রস্ব কবিতায় এবং দীর্ঘ কবিতায় সমানভাবেই এই শৈল্পিক বিচ্যুতি ঘটেছে। আমরা অবশ্যই রিচার্ড-কথিত আবেগগত বিশ্বাস এবং বৌদ্ধিক বিশ্বাসের পার্থক্যের সারবত্তা এবং এলিঅটের মতান্তর এখানে আলোচনা করতে চাই না। বরঞ্চ এলিঅটকে আমরা এখানে রিচার্ডের বক্তব্যের বিরোধী হিসাবে দেখি না। বিশ্বাসের গাঢ়তম মুহূর্তে বিশ্বাস সমগ্র চৈতন্যেরই বিষয়। আবেগের ভূমিকা সেখানে স্বতঃই গণনীয়। রিচার্ড থেকেই সে সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে। বিশ্বাসের একমাত্র নিরিখ তা কবিকল্পনাকে সক্রিয় রাখতে পেরেছে কিনা। 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় বিশ্বাসের সেই ভূমিকা ম্লান। অথচ 'বেলা অবেলা কালবলা'-য় জীবনানন্দের দার্শনিক অভিপ্রায় আরো স্পষ্টতা লাভ করেছে, সেই অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য কবির প্রয়াসও শুরু হয়েছে। বস্তুত 'আট বছর আগের একদিন'-এর সেই শূন্যতা-সঞ্চারী ক্লান্তিবোধ, সেই নিঃসঙ্গ-চেতনা থেকে 'বনলতা সেন'-এ 'সুচেতনা' কবিতার বক্তব্যে পৌঁছে জীবনানন্দ আপন কবিসত্তার প্রতি অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় সেই অবিচল নিষ্ঠাই বক্তব্যের দিক থেকে তাঁকে আরো অগ্রসর করে দিয়েছে। কিন্তু কবিতা তো শুধু নিষ্ঠা নয়, শুধু বক্তব্য নয়। 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় এখানে ওখানে নিঃসঙ্গ কয়েকটি শিল্পিত কাব্যোক্তি অসংহত স্তবকগুলির পৃথুল কলেবরের পাশে পাশে রুদ্ধশ্বাস। সে পৃথুলতা আপন বিবৃতিতেই ক্লান্ত। 'আট বছর আগের একদিনে'ও শৈল্পিক বিচ্যুতি

ঘটেছে, কিন্তু সে বিচ্যুতি অন্য জাতীয়। এই কবিতাটির প্রধান অসঙ্গতি দৃষ্টি-কোণ-সংক্রান্ত অসঙ্গতি। যে সব দীর্ঘ কবিতায় দ্বিতীয় স্বরের সফলতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেখানে উত্তমপুরুষের উক্তি, 'তার' এই সর্বনামের প্রসঙ্গ এবং নৈর্ব্যক্তিক বক্তব্যগুলি পারস্পরিকতায় সমগ্র কবিতাটিকে পূর্ণতা প্রদান করে। প্রসঙ্গত আমরা এলিঅটের বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা The Love Song of J. Alfred Prufrock-এর কথা স্মরণ করতে পারি। 'আট বছর আগের একদিন'-এ প্রারম্ভে, মধ্যে কোথাও উত্তমপুরুষের নিজের কাহিনী বা কথা নেই। 'শোনো' বলে যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার ভূমিকাও স্বভাবতই গৌণ। সমস্ত কবিতাটিই 'তার' কথা। এই কবিতায় যাকে 'তুমি' বলা হয়েছে এবং যাকে 'তার' এই সর্বনামে উল্লেখ করা হয়েছে এরা এক ব্যক্তি। 'শোনো' যাকে বলা হয়েছে সেই টেবিলের ওপারের বন্ধু শ্রোতা। কবিতাটির শেষে 'আমি' এসেছে। একেবারে শেষে এসেছে 'আমরা'। 'জানি' বলে যে কথা বলেছে তার দার্শনিক উক্তি এবং পরিশেষে 'আমরা' যে উক্তি করেছে সেই 'আমরা'-র অন্তর্বর্তী আমি এক নয়। 'তবু' শব্দটিই তার প্রমাণ। 'আমরা' শব্দে যে অস্মিতা-বিচ্যুতি তার প্রস্তুতি কবিতাটিতে নেই। আবার যে দ্বি ব্যক্তিত্বের কল্পনা শেষে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তার অনিবার্যতা জীবনদর্শন-সংক্রান্ত পূর্বোক্তির জন্য রচিত হতে পারে নি। এইভাবে কবিতাটি দ্বিধাখণ্ডিত হয়েছে। তথাপি যে কবিতাটি দাঁড়াতে পেরেছে সে 'তার' জন্য। কিন্তু 'বেলা অবেলা কালবেলা'-র যে শৈল্পিক খণ্ডতা তার ক্ষতিপূরণের কোনো ব্যবস্থা কবির হাতে ছিল না। 'মাঘ-সংক্রান্তির রাতে' কবিতাটি 'বেলা অবেলা কালবেলা'-র কবি-অভিপ্রায়ের সাক্ষ্য বহন করছে। আমরাও সচেতন হয়ে উঠছি এই ভেবে যে হৈমন্তিক বিষণ্ণতার অন্তে কোন্ বাসন্তী আশ্বাসের তোরণে কবি পৌঁছলেন দেখা যাক :

মহাবিশ্ব তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি আর সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে— তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

নিঃসন্দেহে এই অমেয় আশার বাণীতে কাব্যগ্রন্থটি ধন্য। কিন্তু এই আশার বাণীকে কবিতার ভাষায় রূপান্তরিত করতে গেলে যে প্রকরণ প্রয়োজন সেখানে কাব্যর শৈথিল্য ঘটেছে। কেননা, যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য-ধারণার সঙ্গে জীবনানন্দের ইতিপূর্বের মূল্যানুগতা গ্রথিত ছিল তার সবটুকু না হলেও অধিকাংশই ছিল অতীত-নির্ভর। তিনি সন্ধ্যার বিষণ্ণতার কবি, শেষরৌদ্ররাগ মুছে যাবার

বেদনায় নীড়ের জন্য বিধুর কবি। আমরা আগেই বলেছি যে হেমন্তের যে মাঠের ধান কাটা হয়ে গেছে যার সম্মুখে সর্বৈব শূন্যতা, তা কবি জীবনানন্দের প্রিয় প্রসঙ্গ। এইখান থেকে মাঘ সংক্রান্তির রাতে উত্তরণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এই উত্তরণের প্রকৃতির দিকে জীবনানন্দের তেমন দৃষ্টি ছিল না। দ্বিরুক্তির আশঙ্কা মেনে নিয়েও একথা আর একবার বলা দরকার 'সুচেতনা' জীবনানন্দের কবিজীবনের সন্ধিলগ্নে লিখিত কবিতা। এইখানে আর সেই বিপন্ন বিস্ময়ের কথা নেই যা আমাদের ক্লান্ত করে। অন্য এক বিস্ময়ের কথা আছে, যা আমাদের মূক করে রাখে। তবু সে বিস্ময়কে উপেক্ষা করেই চারিদিকে রক্ত-ক্লান্ত কাজের আহ্বান। কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতার কথা জীবনানন্দ এর আগেই বলেছেন। কিন্তু 'সুচেতনা' কবিতায় দেখা গেল ঐ বিবর্ণতাই সব কথা নয়। এই পথে আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে—এই দূর শতাব্দীমুখী এক অসংহত ভবিষ্য-বিশ্বাসও এই কবিতায় প্রথম দেখা গেল। 'সূর্যোদয়' কথাটিকে এর আগে এমন করে জীবনানন্দ আর কখনো উচ্চারণ করেন নি, যেমন করলেন সুচেতনায়। 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে'—এ অনুভূতি এবার বিদায় নিল। তথাপি এই কবিতাতেই আমরা উপলব্ধি করি যে জীবনানন্দ তাঁর আবেগময় বিশ্বাসের সব ফাঁকটুকু মননের সাহায্যেও ভরাট করতে পারছেন না। যেই তিনি কর্মনিষ্ঠ মানবতার সূর্যের সঙ্গে নক্ষত্ররূপা নারীপ্রেমের মিলিত আশ্বাসকে খুঁজতে যান, তখনই তাঁকে বর্তমানের প্রসঙ্গকে অপরিহার্য বলে মেনে নিতে হয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সেই সুদূর অতীতের ব্যঞ্জনাসঞ্চারী ভাষার ভূমিকা পঙ্গু হয়ে পড়ে। তখনই তাঁর ভাষার শৈল্পিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখে আমরা ব্যথিত হই। জীবনানন্দের বাগ্‌ভঙ্গিতে যে ত্রুটি ক্ষীণভাবে বরাবর বিদ্যমান তা অসতর্কতার প্রশ্রয় পেয়ে এবারে প্রকট হয়ে উঠল। দীর্ঘান্বিত বাক্য কথ্যছন্দ, ভাবছন্দের সীমা ছাড়াল। 'প্রয়াণ পটভূমি' কবিতার নবম পঙ্‌ক্তি থেকে সপ্তদশ পঙ্‌ক্তি এর একটি সাধারণ প্রমাণ বলে উপস্থাপিত করা চলে। জীবনের যে বিস্তৃতির দিকটি কবি কোনোদিন দেখেন নি—মানুষের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে গিয়ে সেই বিস্তৃত জীবনের কথাই তাঁর মনে পড়েছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিকে আয়ত্ত করতে গেলে তাঁর দরকার ছিল নতুন করে টেকনিকের রহস্য মোচন। দুর্ঘটনা তাঁকে সেই সময় দেয় নি। জীবনানন্দ তাঁর সাফল্যের ভিতর দিয়ে মানুষকে শিখিয়েছেন: ভালবাসা। আর তাঁর ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে শিল্পীকে শিখিয়েছেন: থীম্ অথবা আঙ্গিক এককভাবে এর কোনোটাই যেন শিল্পীর কাছে চরম বা absolute না হয়।

আধুনিক কবিতা এবং জীবনানন্দ দাশ

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। কিন্তু তা স্পষ্ট নয় রূপ-রীতি এমন কি ভাবের ব্যাপারেও। তাই আধুনিক কোনো কবি সম্পর্কে আলোচনার আগে আধুনিক কবিতার সামগ্রিক রূপ বিচার করা যেতে পারে।

কবিতা লেখার মূল সূত্র কি সে সম্পর্কে কবি এবং সমালোচকগণের বক্তব্যের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এলিঅট য়েট্স রবীন্দ্রনাথ এমন কি অতি আধুনিক কবিগণ যে-মন্তব্যই করুন-না কেন আসলে মূল মন্ত্রটি সকলেরই প্রায় এক। এলিঅট সাহেব বা রবীন্দ্রনাথ কবিতার এমন কোনো সংজ্ঞা নির্ধারিত, স্থাপিত এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে, যে রীতি গ্রহণীয়, এবং রস বিকৃতি ঘটায় না কিন্তু তা সকলেরই জানা; তবু আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে, যা রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত চিঠিতে বলেছিলেন যে, কবিতার স্বাধীনতা প্রয়োজন, কবিতার চলার পথে যেন কোনো বন্ধন না থাকে। দিগন্ত প্রসারিত অন্ধকারময়ী রাত্রিকে ছিন্ন করে উষার রক্তিমালোককে সকলেই অভ্যর্থনা জানায় সর্বান্তঃকরণে, কিন্তু খুঁজলে এমন দু'একটি ব্যক্তিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে যাঁরা কর্ম-বিমুখ এবং অলস, তাঁরা নবাগত সূর্যের প্রতি বিরক্ত কারণ তাঁরা রাতের অন্ধকারেই আত্মগোপন ক'রে থাকতে ভালবাসেন, বিকশিত হতে চান না—ঠিক সেই রকমই বাংলা গদ্য কবিতা তথা আধুনিক কবিতার বিকাশের বেশ কয়েক বছরের মধ্যেও পাঠক তৈরী হয় নি এবং তাঁরা কবিতাকে দুর্বোধ্য অর্থহীন ইত্যাদি গালভরা বিতৃষ্ণা সূচক বিশেষণ ব্যবহার ক'রে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট—কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁরা আধুনিক কবিতার অখ্যাতি গেয়ে বেড়ান তাঁরা সাধারণত কোনো কালের কবিতাই বোঝেন না। তাঁদের সামনে কবিতার কোনো ইমেজ তৈরী হয় নি। নতুনকে গ্রহণ করার মতো উদারতাও নেই। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আধুনিক যুগের কাব্যচর্চায় যারা চিত্রকল্প, ধ্বনি, রঙ এমন কি শব্দের জাদুতে কবিতাকে এমন একটি স্তরে নিয়ে যেতে উৎসাহী, যা শুধু মাত্র বিচ্ছিন্ন 'প্রতীক' ছাড়া আর কিছুই নয়, যার ফলে কবির মন্ত্রোচ্চারণ

বা বক্তব্য প্রকাশে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটে এবং সেজন্যই পাঠক তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। ভয়ের বিষয়, এ ধরনের কবি, যাঁদের মধ্যে শুদ্ধ কাব্যচর্চা অপেক্ষা প্রিটেনশন অত্যধিক, তাঁদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু সত্যি-কারের কাব্যচর্চায় ভঙ্গী বা ভান কখনোই খ্যাতি এনে দিতে সক্ষম নয়, কারণ অর্থহীনতার পেছনে কোনো পাঠকই অক্লান্তভাবে দীর্ঘদিন ছুটে চলতে পারেন না, কিন্তু লক্ষণীয়—এ সমস্ত কবিতা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে চলেছে। সত্যিকারের কাব্যচর্চা হয় নি তা নয়, তবে কবিতায় উন্নতি যত দ্রুত হয়েছে পাঠক তেমন হয় নি। মালার্মে বোদলেয়র এলিঅট কবিতা-চর্চার ক্ষেত্রে যে-নজীর তুলে ধরেছেন তার সঙ্গে অনেক বাঙালী কবির কবিতা-চর্চার মিল লক্ষণীয় হলেও নিজস্বতার ছাপ আছে স্বীকার না করে উপায় নেই। কবিতা অন্তরের ব্যাপার। পারিপার্শ্বিক ঘটনার যে প্রতিফলন মনের প্রতিবিম্বে পড়ে তারই বহিঃপ্রকাশ কবিতায়। কবিতায় যেমন স্যুপার ন্যাচারালইজ্‌ম আছে তেমনি আছে রিয়ালিজ্‌ম।

দ্য স্টোলেন চাইল্ড-এ য়েট্‌সের শান্ত এক অদ্ভুত কল্পনা রাজ্যের যে ছবি পরিস্ফুট তার সঙ্গে এলিঅটের দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য লক্ষণীয় হলেও কবিতা হিসেবে একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। কারণ দুটিই কবিতা, যদিও টেকনিক ও ফর্মগত পার্থক্য লক্ষণীয়, ভাবের দিক দিয়ে ঠিক সমধর্মী নয়, তবু ভাব প্রকাশ হয়েছে ঐ একজাতীয় মাধ্যম দ্বারা, অর্থাৎ কবিতায়। দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ডে আধুনিক সভ্যজগতের অবক্ষয়িত রূপকে রূপ দেওয়া হয়েছে। সমালোচক তাই উক্ত কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন "The West Land goes beyond a mere diagnosis of the spiritual distempers of the age ; it is a lament over man's fallen nature, a prophecy and a promise." এ দিকে য়েট্‌সের 'দ্য লেক আইলি অব ইনসফ্রি'তে গৃহ-বিরহের চিত্র পরিস্ফুট। হয় কি, আমরা, অনেক সময়েই কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা কালে একের সঙ্গে অপরের মিল বা অমিল, প্রভাব বা অপ্রভাবের কথা চিন্তা করি, কিন্তু এ কথাটি বেমালুম ভুলে যাই যে একজনের সঙ্গে আরেকজনের ভাবগত বা ঐশ্বর্যগত মিল বা অমিলের বিচার করাটা কবি কিংবা কবিতা সম্পর্কে আলোচনার মূল সূত্র নয়। কারণ, কবিতা কবিতাই, ফর্ম বা টেকনিক একের কাছে যা' ভাল অন্যের কাছে তা নাও লাগতে পারে, যাদের ভিন্নতা থাকাই সম্ভব। কবিদের ভাবগত ও ঐশ্বর্যগত চিন্তার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা চলে। যেহেতু আর্কিমিডিস ও নিউটনের

সূত্রের মতো কবিতার কোনো নির্দিষ্ট সূত্র বা সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় নি, ঠিক সেই কারণেই কোন্‌টি কবিতা আর কোন্‌টি নয় তা নির্ধারণ করা সহজ নয়—একজনের কাছে যা কবিতার মর্যাদা পায় অন্যের কাছে তা নাও পেতে পারে।

কবিতায় শব্দের মূল্য বেশী। চিত্রে রঙ মূল্যবান। কবি শব্দ দিয়েই কারুকার্য অর্থাৎ শিল্প করেন। চিত্রকরের সমস্ত কাজ রঙ আর তুলি দিয়ে। শব্দ আর চিত্র সম্পর্কে বলতে গেলেই জীবনানন্দের নাম মনে আসে—শব্দের ব্যবহারে যেন জীবন্ত চিত্র কথা বলে, তেমনি মোনালিসার হাসি যেন রক্ত-মাংসে গড়া নারীর। যে-কোনো কবি অথবা যে-কোনো শিল্পীর রচনায় যে অভিব্যক্তি পরিবেশিত, তা শব্দ বা তুলি-রঙ যাতেই ধরা হোক, সেটি কবির কবিতা, শিল্পীর শিল্প। কবিতায় বাস্তবতা প্রসঙ্গেও সমালোচকগণ একটা সাধারণ উপসংহারে উপনীত হন নি—কারণ বাস্তবতার সংজ্ঞা আজও নির্দিষ্ট হয় নি। শিল্পে দেহতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা' চিন্তনীয়—গ্রহণীয়ও বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে শিল্প-ক্ষেত্রে যে-বক্তব্যকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে তা কবিতায় সম্পূর্ণ রূপ নিতে পারে কিনা, কারণ কবিতা ও অন্যান্য শিল্প অর্থাৎ পেইন্টিংস ও স্কাল্পচার প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে ভিন্ন—তাই অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সতর্কতার প্রয়োজন। যখন কবিতায় বাস্তবতার কথা উঠলই তখন বলি, সাম্প্রতিককালের কবিতা যা "আধুনিক কবিতা" হিসেবে চিহ্নিত তাতে পারিপার্শ্বিক চিত্র সাধারণত প্রস্ফুটিত হয়েছে। সমাজ মানুষকে নিয়েই গড়ে ওঠে, কবি সামাজিক মানুষ, তাই কবিতায় সমাজ সম্পর্কিত প্রশ্ন বা সমাজের প্রচ্ছায়া থাকা প্রয়োজন।

আধুনিক কবিদের কবিতা গদ্যধর্মী। যাকে গদ্যকাব্য বলা হলেও বহু ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তার দোলায় দোলায়মান। এই জন্যেই অতি আধুনিক-কবিদের কাব্যে গদ্যধর্মিতা কাব্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য নয়। গদ্য-কবিতা আমাদের কাছে কখনো কখনো কাব্যের স্বাদ এনে দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আধুনিক কবিতার পরিধি গদ্যকাব্যের গণ্ডীর মধ্যেই শুধু আবদ্ধ নয়, এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। কবিদের ভাব-ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈপরীত্য লক্ষণীয়। নিপুণ চিত্রকল্প রচনায় জীবনানন্দের সমকক্ষ কবি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাঁর কণ্ঠে গ্রাম-বাংলার একটা স্বতন্ত্র সুর বেজে ওঠে :

> দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাঙালীর মন
> আজ রাতে ; একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে
> অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে,

তবুও সে-ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন
মউরির মৃদুগন্ধে ভ'রে র'বে ;—কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হয়ে যেমন নদীর ঢেউয়ে গলে
পৃথিবীর সব দেশে—সব চেয়ে ঢের দূরে নক্ষত্রের তলে
সব পথে এই সব শান্তি আছে : ঘাস—চোখ—শাদাহাত—স্তন —
কোথাও আসিবে মৃত্যু—কোথাও সবুজ ঘাস
আমায়ে রাখিবে ঢেকে—ভোরে রাতে দু'পহরে পাখির হৃদয়
ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে রবে—রাতের আকাশ
নক্ষত্রের নীল ফুল ফুটে রবে ;—বাংলার নক্ষত্র কি নয় ?
জানিনাকো ; তবুও তাদের বুকে স্থির শান্তি—শান্তি লেগে রয় :
আকাশের বুকে তারা যেন চোখ—শাদাহাত—যেন স্তন—ঘাস— ।

অথবা,

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—খেতে মাঠে প'ড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত ।
এই সব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড় ।

তখন গ্রামের একটা স্পষ্ট ছবি, গন্ধ, আমাদের সামনে উদ্ভাসিত। জীবনানন্দ শুধু গ্রামীণ রোমান্টিক কবি নন, তাঁর সমাজ-সচেতন মনের পরিচয়ও পাওয়া যায় '১৯৪৬-৪৭' প্রভৃতি কবিতায় ।

জীবনানন্দের কবিতার ভাষা আবেগ এবং চাতুর্যময়। এই গুণটি কবিতার পক্ষে দোষের নয়। অমিয় চক্রবর্তীর আত্মকথনাত্মক ধ্যানময় ভাষণে সংক্ষিপ্ত পোষাকের মধ্যে গুরুগম্ভীর একটা বাচনক্ষমতা বর্তমান এবং আবেগবর্জিত তবু তিনি কবি। অন্তরের ডাকে যে-ভাষা কোলাহল থেকে একটু দূরে, এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম—তিনি জীবনানন্দ দাশ—কবি হিসেবে সার্থক ; কারণ তার কবিতায় মানুষের হৃদয়ের বেদনাও পরিস্ফুট।

বাইরের বীভৎসতা, যা বিশ্বযুদ্ধের ফলে পরিলক্ষিত হয়, আধুনিক কবির কবিতাকে না কি বিশেষ গতিপথে চালিত করেছে, সমালোচকের এমন মন্তব্য অনস্বীকার্য কারণ আধুনিক গতিপথ কোনো বিশেষ ফলশ্রুতি নিরপেক্ষ নয় ; কবিচিন্তায় সমাজ-চিত্র, সৌন্দর্য অথবা অবক্ষয়িত রূপ প্রতিফলিত হবেই—সুতরাং বিশ্বযুদ্ধের জন্য কবিতায় বিশেষ নতুন স্রোত আসতে পারে। বর্তমান যুগের চিন্তাধারা যে কবিতায় পাওয়া যাবে তাকে আধুনিক কবিতা বলব।

রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করলেই যেমন আধুনিক হওয়া যায় না তেমনি তাঁকে ধরে বসে থাকারও কোনো অর্থ হয় না। গদ্যছন্দের সাবলীলতা ও বলিষ্ঠতা এবং বলার ভঙ্গী সমর সেনকে অমর করে রাখবে বাংলাকাব্যের ইতিহাস। সমর সেনের কবিতায় নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের যেন কিছুটা আত্মিক যোগ আছে। টেকনিক ও ফর্মগত কিছুটা মিলও দেখা যায়। জীবনানন্দ একটু ভিন্নপথের যাত্রী। অন্তত রচন-পদ্ধতির দিক দিয়ে। তিনি শান্ত নীড়ের স্বপ্নই চিরকাল দেখেছেন নীড় ভাঙা লোকেদের কথা তাঁকে ভাবায় নি এ যেমন সত্য নয়, ঠিক তেমনি সুকান্ত-নজরুলের মতো চড়া সুরও কোনোদিনই শুনি নি। শ্লেষ ও সমাজচিন্তার দিক দিয়ে জীবনানন্দের সঙ্গে সমর সেনের পার্থক্য নির্ণয় অর্থহীন। বরং কিছুটা মিল পরিলক্ষিত।

জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশের কবি। তিনি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ-রসকে আস্বাদন করেছেন ; আর তার ফসলই হচ্ছে কবিতা। রাজ-অর্থ-সমাজনীতিক চিন্তায় ভারাক্রান্ত আধুনিক কোনো কবির সঙ্গে কষ্ট-কল্পিত মিল খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। সমাজের চতুর্দিক সম্পর্কে কবির অনীহা কাম্য নয়। বরঞ্চ তাঁর কিছু দায়িত্ব থেকেই যায় সমাজের জন্য। কিন্তু কবি তাঁর কবিতায় সমাজ-তাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থিসিস বা সংবাদ পরিবেশন করেন না ; তাঁর শাণিত তীক্ষ্ণ বক্তব্য পেশ করেন একটু স্বতন্ত্রভাবে। সেখানে ধ্বনি, চিত্রকল্প, রঙ এবং শব্দের নিপুণ ব্যবহারের সঙ্গে প্রয়োজন কল্পনা ও অনুভূতি। আর অনুভূতির তীব্রতা ও সমাজ চিন্তা উভয়ই জীবনানন্দের কবিতায় উপস্থিত। প্রসঙ্গত বলতে পারি : "কেউ কেউ কবি, কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।" সমস্ত যোগ্যতাই জীবনানন্দে বর্তমান ছিল বলাই বাহুল্য। তাঁর নির্জন একাকিত্বে ছিল সংযম ; তার ফলে কাব্যের মহিমা হয়েছে উজ্জ্বলতর। এই উজ্জ্বলতার সৃষ্টি ইন্দ্রিয়বোধে ও রূপদক্ষতায়।

জীবনানন্দ প্রকৃতি-প্রেমিক। মানুষকেও ভালবেসেছেন আন্তরিকভাবে। প্রকৃতি সখ্যতা ও নির্জনতা তাঁকে কিছুটা অন্তর্মুখী করে তুললেও জীবনের রসোপলব্ধিতে সাহায্য করেছে তার প্রত্যয়, যা অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীলতা থেকে উদ্ভূত। জীবনানন্দের নির্জনতায় ও প্রত্যয়ে মানুষের রূপ ছিল স্বচ্ছ,

শান্ত, মাটির সঙ্গে নিবিড় একাত্মতায় বা আকাশের অসীম অন্তরঙ্গতায়। মানুষের প্রতি ভালবাসায় সমাজ-আর্থনীতিক চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি, তবে ভাবিয়ে তুলেছে। সমসাময়িক সমাজের যন্ত্রণা, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি ক্ষোভ —কারণ মানুষই ক্রমে যন্ত্র হয়ে উঠছিল—প্রভৃতি প্রকাশিত তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের যুগে আবির্ভূত হয়েও স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত জীবনানন্দ শুধুমাত্র ধূসর পাণ্ডুলিপির বিষণ্ন নির্জনতায় হারিয়ে যান নি। জীবনকে জানার জন্য নরেন্দ্রীয় চিন্তা তাঁকে হয়তো সচেতন করে। তাই মৃত্যুবোধের ভেতর তিনি জীবনের মানে নতুন ক'রে খুঁজে পান। ঝরা পালক-ধূসর পাণ্ডুলিপির যুগে শুধুমাত্র তৎকালীন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা নতুন সমাজ চেতনায় কবিকে উদ্বুদ্ধ করে নি। এর পেছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের মন্ত্র—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন। সাধারণ মানুষের প্রতি জীবনানন্দের একাত্মানুভূতি বিশেষ করে এই সময়েই জেগে ওঠে। মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালবাসা তাঁর কবিসত্তাকে আলোকিত করে। সমসাময়িক বোধ-যন্ত্রণা ও সমস্যার প্রকাশে তাঁর কবিতা আধুনিক হয়ে উঠতে পেরেছে। তার ফলে তাঁর চিন্তাধারায় নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আসলে প্রত্যেক যুগই সে-যুগে আধুনিক—আর এই আধুনিকতার সমস্যা যুগ-সমস্যা বা যুগ-যন্ত্রণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। রবীন্দ্রনাথ মূলত কোনো অখণ্ড যুগের ধারক নন। তাঁর চিন্তাধারায় স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত। জীবনানন্দ মহাযুদ্ধোত্তর কালের কবি। অবিশ্যি কাব্যচর্চার শুরু যুদ্ধের সময়েই। সুতরাং এ সময়ের কাব্যে এক বিশেষ মানসিকতার ছাপ পড়বেই। কারণ আধুনিক অনেক সমস্যার সূত্রপাত হয় এ-সময় থেকে। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে আধুনিকতা'তে বলেছেন "আমরা প্রথম যখন ইংরেজী সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া-ভাঙবার নাড়া।" এই এক একটা আঘাতই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনে কালান্তর। তেমনি বিশ্বযুদ্ধ, যার ফলে বহু সমস্যার সৃষ্টি, বিশ্বযুদ্ধোত্তর চিন্তায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে। বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারায় নতুনের স্রোত এল মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালীন সাহিত্যে। রবীন্দ্রছায়ায় পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত কবি নতুন চিন্তায় উদ্ভাসিত হল, কিছুটা মুক্তিও এল ভাবে ভাবনায়। রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারীরা তাঁদের কাব্য-সাহিত্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের সাধনা এবং রক্ষা রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিতে করলেও পাশ্চাত্যের নতুন চিন্তা অনেক ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ পূর্ণতা এনেছে এদেশের ঐতিহ্যগত বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে। অবিশ্যি এর অর্থ এই নয় যে, পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য

এদেশের ঐতিহ্যে প্রতিফলিত; বরং অমিলটাই অত্যধিক বেশী। তবে ট্রাডিশন সম্পর্কে আলোচনায় নতুন সূত্রের বা ধারার পরিচয় পাই। জীবনানন্দ আত্মসচেতন রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারী। এবং ঐতিহ্যগ্রাহী কবি।—জীবনানন্দের যুদ্ধকালে লিখিত কবিতা, যার অধিকাংশই ঝরা পালকে গৃহীত, আধুনিকতার সূচনা করে, যেমন এলিঅটের 'দি ওয়েস্টল্যাণ্ড' ইংরেজী সাহিত্যে। কিন্তু তিনি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যন্তও এলিঅট অনুগামী নন; বরঞ্চ য়েট্‌সীয় প্রজ্ঞার আলোকে কিছুটা আলোকিত।

জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে দেখেছি সেখানে সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার প্রচ্ছায়া পড়েছে। এমন কি মানুষের সামাজিক বৃন্তচ্যুতি, যার ফলে সে বিচ্ছিন্নতা বা একাকিত্বের যন্ত্রণায় কাতর, বেশ স্পষ্ট-ভাবে ফুটে উঠেছে। জীবনানন্দের এই সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টি-প্রসঙ্গ প্রায় অনালোচিত—সকলেরই লক্ষ্য তাঁর রোমান্টিকতার দিকে।

১. আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
কেবলি শিথিল হ'য়ে যায়; তবু তুমি
সেই শিথিলতা নও,...(তবু)

২. মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো।
এইখানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই;
তাদের হৃদয়ে কোন সভাপতি নেই;
শরীর বিবশ হ'লে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের
কংগ্রেসের মতো কোনো আশা হতাশার
কোলাহল নেই। (এই সব দিনরাত্রি)

উদ্ধৃতি আরো দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতে প্রবন্ধের আয়তন হবে দীর্ঘ। যাই হোক উদ্ধৃতাংশ দুটিতে আমার মতে, রোমান্টিকতা নয়, আছে সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম দিকে রাজ-সমাজ-অর্থনৈতিক চিন্তায় চিন্তিত কবির সাফল্য সম্পর্কিত যে প্রশ্ন উঠেছিল তা স্বাধীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়: সামাজিক দায়িত্বহীনতা যদি কবির পক্ষে শোভন হয় তবে তিনি শুধু মাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত হন রাজ-সমাজ-

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা না ক'রে। বরিশালের আকাশ-বাতাস, ফল-ফুল ও বিভিন্ন পাখি জীবনানন্দকে যেমন সুন্দর অনুভূতিপ্রবণ ক'রে তুলেছে তেমনি 'লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে / মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে নর্দমার থেকে শূন্য ওভার ব্রিজে উঠে / নর্দমায় নেমে'— তাঁর হৃদয় ব্যথায় বিদীর্ণ হয়েছে। দেখা গেছে মানুষের ক্ষুধা-যন্ত্রণা সুকান্তের কবিতায় স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান কিন্তু জীবনানন্দে ঠিক সেভাবে নয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অসম বণ্টনের ফলে, মার্কস সাহেব কথিত, অ্যালিয়েনেশনের রূপ জীবনানন্দের কাব্যে দৃষ্ট। এই সমস্ত সমস্যা ও যন্ত্রণা আছে বলেই অস্তিবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়। এই সমাজব্যবস্থায় মানুষের অস্তিত্বের যন্ত্রণা :

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ; কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোন খাদ,
... ...
জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;··· (আট বছর আগের একদিন)

এই বিপন্ন বিস্ময় কি ? বেঁচে থাকার নিরর্থকতা কেন ব্যথাতুর ক রে তোলে ! 'ঘুম কেন ভেঙে গেল তার ?' 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে' তাকে জড়িয়ে ধরল অক্টোপাসের মতো। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা কেন ? আসলে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় একটি শিকার কাহিনী এই কবিতাটি। এখানে অর্থ-কীর্তি-সচ্ছলতায় অ-স্থির অবস্থা তার ফলে অনাস্থা এই সমাজের প্রতি— এর ফলে উদ্ভূত বিপন্ন বিস্ময় আরেকটি প্রভাতের ইশারায় স্থবির ব্যাং-এর মতো বাঁচতে চায় না শূন্যতায় ক্রমশ তলিয়ে যায় বলে। তখন অস্তিত্বের যন্ত্রণা প্রকট। এরিকসনীয় পদ্ধতিতে এর বিচার তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য আনতে পারে। কবির চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত সামাজিক সংকট স্বাভাবিক কারণেই আলোকিত হয়, কারণ আবেগঋদ্ধ সচেতনতায় গৃহীত যুক্তি সমাজ পরিস্থিতি

নির্ণয়ের অনুকূল। যদিও আধুনিকতায় বিশ্বকে 'নির্বিকার তদ্গতভাবে' দেখার মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উচ্চারিত তথাপি এই সত্য স্বীকার করা উচিত যে, সেখানে ব্যক্তি নির্বিকার থাকতে পারে না সমসাময়িক সংকটের আবর্তে। তাই জীবনানন্দের কাব্য চিন্তায় সমসাময়িক সংকট প্রতিফলিত।

১. দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ
মাঝখানে আজ এই সময়ের ক্ষণিকের আলো
যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো
... ...
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নিচে
জ্বালিয়ে শ্যামলনীল ব্যথা হ'তে চায়। (দু-দিকে)

২. কী ক'রে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়—বিনি দামে—তবে কার লাভ—
এই নিয়ে চারজনে ক'রে গেল ভীষণ সালিশী।...(লঘু মুহূর্ত)

৩. সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
... ...
অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে ছাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা
পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আঁধারের খাত বেয়ে;...
(বিভিন্ন কোরাস)

অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনাকে ভারাক্রান্ত করা অর্থহীন। কম বেশী প্রায় সব কবিতাতেই জীবনানন্দ সমাজ সম্পর্কে চিন্তিত। সামাজিক সমস্যা এই চিন্তায় তাকে উদ্দীপ্ত করেছে।

জীবনানন্দকে অনেকেই শুধুমাত্র প্রকৃতির বা ইন্দ্রিয়বোধ ও রূপদক্ষ কবি হিসেবে চিহ্নিত করেন; কিন্তু তাঁর সমাজ-চেতনার কথা ভুললে চলবে কি করে:

শিশিরের শব্দের কবি জীবনানন্দ

ডঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত সমালোচক ব্যাবেট ডয়েশ তাঁর Poetry in our Time সমালোচনা গ্রন্থখানির এক জায়গায় কাব্যের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে সংগীতের কথাও তুলে বলছেন, "As poetry can express what is beyond the power of any other words, so music can express whatever poetry is too clumsy to say. On opposite shore lies the other realm, more substantial, more immense, that of silence. There men go in their extreme moments, when they leave that region, they are fortunate if they can turn to poetry."

সমালোচক এখানে, যে আত্মসমাহিত, নির্জন, স্তব্ধতার কথা বলেছেন, সেখানে আমরা সকলেই কোন না মুহূর্তে গিয়েছি। কিন্তু সেখান থেকে ফেরার মুহূর্তের কবি বোধ করি বেশী নেই।

আধুনিক বাংলা কাব্যে, যদি এ প্রসঙ্গে কারুর নাম প্রথমেই মনে পড়ে, তবে সে কবি জীবনানন্দ দাশ।

কবি নিজের কথা বলতে গিয়ে নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন। কারণ তিনিই বলেছেন, "আমার কবিতাকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেয়া হয়েছে।" আর কবি যেখানে "নির্জনতম" কবি সেখানেই মাত্র সার্থকতা পায়, "শিশিরের শব্দ" তা না হলে, কথাটা শুধুমাত্র অর্থহীন কথার কথাতেই পর্যবসিত হয়ে যেত।

আধুনিকতার সর্বগ্রাসী কোলাহল, ভিড়ের চাপ, বিজনতা বিরোধী আবহাওয়া, উদ্দাম পপ্ সংগীত, মাইকের সরব কণ্ঠ আস্ফালনের জগতে জীবনানন্দের কবিতা ও তাঁর ব্যক্তিত্ব এক অসাধারণ ব্যতিক্রম।

জানিনা, হয়তো তিনি নিজে এই ব্যতিক্রম ছিলেন বলেই ছোটখাট জনসমুদ্র বয়ে নিয়ে যাবার যন্ত্র, অর্থাৎ ট্রামগাড়ির দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর জীবন, তাঁর কবিতা এমনকি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মনে করিয়ে দেয় যে তিনি ছিলেন একা, একক, নির্জন, অনন্য।

বর্তমানে নাগরিকতা ও আধুনিকতা প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছে। আধুনিক কবি বলতে, তাই আমরা বুঝি যে কবির কবিতায়, উৎকট নাগরিকতা রূপ

পেয়েছে, তাকেই। জীবনানন্দ যে আধুনিক কবি এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আশ্চর্য আধুনিক কবি হওয়া সত্ত্বেও, জীবনানন্দ নাগরিকতার কবি নন, আর তার জন্যই শিশিরের শব্দের কবি, আত্মসমাহিত স্তব্ধতার কবি জীবনানন্দ। তাই আধুনিক কবিদের জীবনানন্দের পক্ষেই বলা সম্ভব :

"দূরে-দূরে—আরো দূরে চলিলাম উড়ে,
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা—অন্তরের শুক্র অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে॥"

মানবশিশু নিঃসহায় একা। হয়তো একা বলেই সে নিঃসহায়। আর একা বলেই তার মন পাড়ি দিতে চায় অসীমের মধ্যে, দূরত্বের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে।

এ পাড়ি নাগরিক কোলাহলের পথের থেকে দূরে, সেই যেখানে

"সুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ"

বিজনে, সবুজে ঢাকা, গ্রামের পথে জীবনানন্দের পদক্ষেপ। পরবর্তী জীবনে তিনি ছিলেন কলকাতা শহরেরই বাসিন্দা। কিন্তু চিরদিন তাঁর মন পদচারণা করেছে গ্রামের সবুজ বিজন পথে প্রান্তরে। তাই শহরের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও 'রূপসী বাংলার' গ্রাম বাংলার কবি ছিলেন জীবনানন্দ। সেইখানে ছিল তাঁর শান্তি। তাই তিনি বলতে পেরেছেন,

"একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো
—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায় ; যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।"

"নির্জন স্বাক্ষর" কবিতার কবি জীবনানন্দ, শুধু গ্রাম বাংলারই কবি নন। গ্রাম বাংলার মাধ্যমে তিনি বৃহত্তর বিশ্বপ্রকৃতির সুরে একাত্ম। যেখানে তিনি বলতে পেরেছেন

"নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝরে—
ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মত শব্দ করে।
জান নাকো তুমি তার স্বাদ
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ।"

নির্জনতার সাধনায় কবি সন্ধান পেয়েছেন "অবাধ, অগাধ জীবনের"। এইখানেই তো জীবনানন্দের কবি হিসাবে অনন্ত সার্থকতা।

রূপসী বাংলা, আর তারই মধ্যে দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার প্রেরণায় জীবনানন্দ, শহর-বন্দর-বস্তি-কারখানা ছেড়ে পালাতে চেয়েছেন। নেমে আসতে চেয়েছেন শ্যামল মাটিতে, "শিশিরের ভেজা পথ ধরে"। তাই তিনি লিখছেন,

"সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে
শহর-বন্দর-বস্তি-কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে
আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে
শরীরের অবসাদ হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।"

জীবনানন্দের বিশ্বপ্রকৃতিকে এই যে ভালবাসা, এ ভালবাসা শুদ্ধতারই উপলব্ধিজাত। কিন্তু সে শুদ্ধতার উপলব্ধি কবি লাভ করেছিলেন রূপসী বাংলাকে ভালবেসে। বাংলাদেশকে কবি ভাল করে দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন তাই সারা বহির্বিশ্বের রূপ, তাঁর কাজে সহজে সাবলীলভাবে ধরা দিয়েছে। তাই তিনি বলতে পেরেছেন,

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাইনা আর: অন্ধকারে জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ"

সেই বাংলাকে যে দেখেছে সে আবার পারে অমরায় গিয়ে নৃত্যগীত দেখাতে

"একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার নেচেছিল পায়।"

বাংলার কবি, তাঁর নিজস্ব একাকীত্বের বিজনে বসে বাংলাকে ভালবেসে যা রচনা করেছেন, তাই তাঁকে দেবে বিশ্বের ইন্দ্রসভায় আসন। এতদিন পরে আজ তো শুরু হয়েছে মাত্র তার।

নির্জনতার কবি, হয়তো এই শহরেরই কোনো এক ধারে একা বসে, সন্ধ্যায় দেখেছেন, কেমন করে আকাশে সাতটি তারা ফুটে উঠেছে। কেমন করে কামরাঙা লাল মেঘ, গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে যায়। আর সেই সঙ্গে 'কলমীর ঘ্রাণ", "সর", "হাঁসের পালক", "কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত", সব একাত্ম হয়ে যায় সেই একাত্মতায় কবি অনুভব করেন "ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা"। তাই তিনি বলেন,

"ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ :
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।"

জীবনের সর্বস্তরে শান্ত স্তব্ধতা, যা আমরাও উপলব্ধি করি, তাই জীবনানন্দের কবিতার প্রাণবস্তু। স্তব্ধ দুপুরে ঝিঁঝি ডাকার মতো সেই স্তব্ধতার প্রতিধ্বনিই আমরা শুনি জীবনানন্দের কাছে। যেমন,

"সাদা ছিট ছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়, রাত্রি ;
নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
অতীত নিস্তব্ধতা।
মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার
এই সব আলো প্রেমও নির্জনতার মতো।'

বাংলাদেশের মাটিতে শিকড় অনেক কবি সাহিত্যিকের। যাঁদের লেখায় গ্রাম বাংলার জীবন ফুটে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। এ কথা বলতে গেলে বোধকরি সব চেয়ে আগে আমাদের মনে পড়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। অন্ধকার স্তব্ধ প্রকৃতির অপরূপ রূপের প্রতি আমাদের মনকে টেনেছেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। কিন্তু তবু স্তব্ধ, বিজন, ঘুমন্ত প্রকৃতির কবি যদি কেউ থাকে, তবে তিনি জীবনানন্দ। যেখানে তিনি লেখেন :

"কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে গঙ্গাফড়িং সেও ঘুমে ;
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছো তুমি।"

যে স্তব্ধতায় কাঁচ পোকা, গঙ্গাফড়িং ঘুমে অচেতন, সেই বিজন স্তব্ধতার বাণীরূপ যদি কেউ দিতে পেরে থাকেন, তো তিনি কবি জীবনানন্দ। অন্ধকার তাই তাঁর কবিতায় আমাদের মনে জাগায় স্বপ্ন। তাই তাঁর একটি অনবদ্য কবিতা হল "অন্ধকার"। যে কবিতায় তিনি বলছেন :

"গভীর অন্ধকারের
ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত,"

এমনি করেই দেখা যায় জীবনানন্দের রচনায় নির্জনতা আর একাকীত্ব যেন সর্বত্র উঁকি দেয়। নদী, সেও যেন সেই নির্জন একাকীত্বের রূপকল্প। উদাহরণ স্বরূপ :

"নির্জন মাছের রংয়ে যেইখানে হয়ে আছে চুপ
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ ;
কান্তারের একপাশে যে নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে শুয়ে দেখিছে কেবল

বিকেলের লাল মেঘ ;"

কিংবা আবার,

"তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনোনাকো ; অথবা
রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
জানোনাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার
মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;"

জীবনানন্দ আধুনিক কবি। তাই তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে বাস্তব চেতনা। সেই বাস্তব চেতনায় কবির দৃষ্টি এড়ায় না যেখানে সৌন্দর্য ক্ষুধার বিবরে হাত রেখে, ভিক্ষা চায় হয়তোবা। কিন্তু তবু সেই অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে হাত রাখা সৌন্দর্যেও আছে এক বিষণ্ণ স্তব্ধতা। সেই বিষণ্ণ স্তব্ধতার কবি জীবনানন্দ। কবি জীবনানন্দের পটভূমিকা ছোট নয়। ইউরোপীয় সাহিত্যে বিদগ্ধ, ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক, কবি জীবনানন্দর কবিতার জগতেও পরিক্রমা কম নয়। "ঝরা পালক।" "ধূসর পাণ্ডুলিপি," 'রূপসী বাংলা," "বনলতা সেনের" কবি, "মহাপৃথিবী," "সাতটি তারার তিমির" "বেলা অবেলা কালবেলা"র। বিবর্তনের পথে এগিয়েছেন। বিবর্তনের যাত্রাপথে কবির ভাষা, ব্যঞ্জনা, বিষয়বস্তু সবকিছুরই বিবর্তনসূচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ নিয়ে আলোচনাও আজ কম হচ্ছে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ জীবনানন্দের উপরে একাধিক থিসিসে ছাত্ররা ডক্টরেট ডিগ্রীও অর্জন করেছেন। কাজেই বলা যেতে পারে, জীবনানন্দ লোকান্তরিত হবার পর তাঁকে তাঁর জীবনে যে সম্মান দিই নি, তা দিতে শুরু করেছি। এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দের বিবর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাও হয়েছে অনেক। কিন্তু সারা জীবন-ব্যাপী জীবনানন্দ যে "নির্জনতার" কবি, কবির সে মেজাজ কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাই এই প্রবন্ধে সেই মেজাজেরই পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শুধু বোধহয় নির্জনতার কবি বললে জীবনানন্দের, এ দিকটি থেকেও পূর্ণ মূল্যায়ন করা হয়ে যায় না। হয়তো অনেক কম বলা হয়, যদিও কবি নিজের সম্পর্কে এই কথাই বলেছেন। কম বলা হয় বলছি এই জন্য। যে নির্জনতাকে উপভোগ সময় বিশেষে করে সকলেই। তাই কয়েক দিনের জন্য ছায়াসুনিবিড় শান্ত গ্রামে, নদীর জনহীন কিনারায়, গহন অরণ্যে কি শৈল শিখরের নির্জনতায় অনেকেই কবি হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনানন্দের যে নির্জনতাবোধ, অনন্ত গভীর একাকীত্ব, তা ছিল বেশ একটু তফাত। তাই জন্য

জীবনানন্দের কাব্যের এই দিকটির কথা লিখতে গিয়ে নামটা দিয়েছি জীবনানন্দেরই কবিতার থেকে শব্দ গ্রহণ করে "শিশিরের শব্দের" কবি। এইখানে আসে কবি জীবনানন্দের স্তব্ধতাকে উপলব্ধির কথা।

যে স্তব্ধতার উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যায়, "দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে," যেখানে "প্রিয়ার কপোতগুলি" শান্ত পরিবেশে, "নীড়ে ফিরে" আসে যেখানে কবি "নবীন আষাঢ়ের নব মাল্যরচনা "করে বাল্মীকি ব্যাসের যুগে শুদ্ধ পদচারণায়. কবি আমাদের নিয়ে যান। যে বিজন পরিক্রমা "প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে "আর একটু মধু" ঢেলে দেয়। আমাদের "স্নেহ-সুধা-মাখা" ঘরখানি আর একটু সুমধুর করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের সেই "সঙ্গীবিহীন বিজন সাধনার, যদি কেউ উত্তরসূরী থাকেন, তবে তিনি বাংলা কাব্যে শুধু জীবনানন্দই। তাই অতি সার্থকভাবেই জীবনানন্দ শিশিরের শব্দের কবি।

নির্জনতার উপলব্ধি তাই জীবনানন্দকে নিয়ে যায়, মরুপ্রান্তরে স্তব্ধ ইতিহাস বুকের ভিতরে রহা পিরামিডের কল্পনায়। শুদ্ধ আকাশে শকুনরা যেন সারা এসিয়াকে দেখতে পায় এক লহমায়।' সে বিজন স্তব্ধতার পরিক্রমা যেন হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অতীতের পরিক্রমা। সে অভিসার কবিকে, আর কবির সঙ্গে আমাদের বিম্বিসার, অশোকের জগতে, বিদিশা আর শ্রাবস্তীতে।

স্তব্ধতার কবি বলে, শিশিরের শব্দের কবি বলে জীবনানন্দের "বনলতা সেন" বিশ্বের যে কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে একটি রেখে দেবার মতো কবিতা রূপে জন্মগ্রহণ করে। আমরা ভুলতে পারি না কিছুতে সেই শিশিরের শব্দ সঞ্জাত বনলতা সেনের লাইন গুলি :

হাজার বছর ধরে' আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।
সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল
সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

জীবনানন্দ কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব

ডঃ সুপ্তি সেন

নিজেকে বেশীমাত্রায় পাশ্চাত্য প্রভাবিত কবি হিসেবে চিন্তা করতে জীবনানন্দ অস্বীকৃত ছিলেন। তাঁর জবানীতে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে বিদেশী অনুভবের কাছে ভিক্ষাপাত্র হাতে হাজির হওয়ায় আধুনিক ফ্যাশন থাকলেও যৌক্তিকতা নেই কিছু। কবির নিজস্ব রচনায় অবশ্য রবীন্দ্রপ্রভাব অস্বীকারের চেষ্টা যেমন দেখি না, তেমনি কোনো সংকোচও লক্ষ্য করি না বিদেশী চিত্তের অমূল্য মুহূর্তগুলি আহরণ করে রাখার ব্যাপারেও। এ আহরণ অবশ্য হরণ নয় কিংবা অনুকরণ। যে ভাব বা ইমেজ বিদেশী জমি থেকে স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে রূপসী বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, কষ্ট করে তাদের বর্জন না ক'রে সমাদরেই গ্রহণ করেছেন কবি। সচেতন ইমিটেশন না হয়ে এ অনেকটা স্বাভাবিক অ্যাসোসিয়েশন ব'লে মনে হয়।

এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড সম্বন্ধে কবির সুচিন্তিত মন্তব্য যদিও যে বিশেষ যুগের কাব্য ব'লে আজ না হোক, তার রস 'কাল অন্তত ফিকে হয়ে যাবে', তবুও যুগচিত্তের নিখুঁত বিম্বন বলেই হয়তো তাঁর কাব্যেও এলিঅটের আংশিক ছায়া না পড়ে পারে নি। জীবনানন্দের ধূসর পৃথিবী ওয়েস্ট ল্যাণ্ড নয়— 'এই বুড়ী পৃথিবী', আর 'বুড়ো' 'মেঠো চাঁদ— কাস্তের মতো বাঁকা' অস্তিত্বের রহস্য রাতের পর রাত জানিয়ে এসেছে তাঁকে। আকণ্ঠ তৃষ্ণার জ্বালা নয়, জ্বলন্ত কার্থেজ নগরীর চূর্ণপ্রায় ইমেজ নয়, বরঞ্চ এত অশ্রুসিক্ত বিষণ্নতাই জীবনানন্দ কাব্যের ভাব। তবু কখনও কখনও ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের একোও শোনা যায়, অস্পষ্ট, কিছুটা বা সুদূর। সাধারণত মানুষকে 'hollow man' বা 'stuffed man' মনে করেন নি কবি, কারণ, তার অন্তরের শূন্যতা নয়, ব্যথাভরা ভালোবাসাকেই অনুভব করেছেন তিনি। তবে 'পরস্পর' কবিতার ঘুমন্ত সুন্দরীর বর্ণনায় অনেকটা যেন খড়-মাটি দিয়ে ভেজাল প্রতিমা তৈরির ইমেজ মনে আসে, যা অনেকটা 'স্টাফ্‌ড্‌ ম্যানে'র সমতুল্য। কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

'এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর—মানুষের দেশের মতন ;
রূপ ঝ'রে যায়,—তবু করে যারা সৌন্দর্যের
মিছা আয়োজন—

যে-যৌবন ছিঁড়ে ফেঁড়ে যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে !—
...   .
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
ঠোঁটে চোখে অসুবিধা—ভিতরে অসুখ।'

পৃথিবীর সৌন্দর্য তো এই—ক্ষণস্থায়ী আয়োজন—আর ভালোবাসা ? কবিকে প্রশ্ন করেছে সেই নারী ; 'ভালোবাস ?' উত্তরে তাঁর—'হাসি পেল,—হাসি !' তারপর—

'চলে এল কাছে,—
জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে,—
আজো এত চুল।
চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, ক'খানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি ;
চোখ দুটো চুণ-চুণ,—মুখ খড়ি—খড়ি।
থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি !'

এর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় বুঝি এলিঅটের আক্ষেপ—'উই আর দ্য হলো মেন, উই আর দ্য স্টাফ্‌ড্‌ মেন' ইত্যাদি।

তবে, জীবনানন্দকাব্যে আধুনিক কবিবর্গ অর্থাৎ এলিঅট পাউণ্ড ইয়েট্‌সের চেয়ে ইংরেজী রোমান্টিক কাব্য এবং রোমান্টিসিজ্‌মের আদি জনক শেক্সপীয়ারের প্রভাবই বেশী। ইংরেজী রোমান্টিক কাব্য তার ভাবালস, স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্য বিস্তার করেছে প্রধানত কবির চিত্রধর্মী নিসর্গ কবিতায়। যে ঘাস-মাটি-জল জীবনানন্দের জীবনের নিবিড় আনন্দ সে বাংলাদেশেরই বটে, তাতে বিদেশের ভেজালমাত্র নেই। কিন্তু কখনও কখনও সে সৌন্দর্য আস্বাদনে বিদেশী কবির পরিচিত ভঙ্গী এসে পড়ে, কখনও অতি রোমান্টিক শেলীর বিশাল প্রাকৃতিক শক্তির কাছে আত্মবিহ্বল আত্মসমর্পণ, কখনও বা সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মেদুরতা, মৃত্যুপথযাত্রী তরুণ কীট্‌সের সমাপ্তির ছায়া পড়া অতি কোমল—স্বপ্নালু এক জীবনপিপাসা।

কতগুলি বিখ্যাত কবিতায় শেক্সপীয়র ও রোমান্টিক কবিদের ছায়া এত স্পষ্ট, (প্রায় 'একো' বলা যায়), যে উল্লেখ না ক'রে পারছি না। (অবশ্য

ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পক্ষে এইসব অতিপরিচিত প্রিয় লেখকের প্রভাবমুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল বলা যায়।)

'অবসরের গান', যেমন, পুরোপুরি একটি বাঙালীরই অবসরের গান, প্রসূতি মাটি, ফলন্ত ধান আর ভিজে শৈশবের গন্ধ দিয়ে ভরা। অথচ, এই স্বল্পস্থায়ী অবসরের অস্পষ্ট সৌন্দর্যচ্ছায়াকে চিত্রবদ্ধ করবার জন্যে কবি মাঝে মাঝেই সাহায্য নিয়েছেন পরিচিত বিদেশী ইমেজে, বিদেশের রীতিনীতি কিংবা প্রচলিত কাহিনীর। এতে অবশ্য কাব্যের রস গাঢ়ই হয়েছে। সমৃদ্ধ হয়েছে কবির বক্তব্য।

এখানে 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপর মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে',

এই ক্ষেত নিঃসন্দেহে রূপসী বাংলার ক্ষেত,—রূপ যার শীগগিরই যাবে ঝরে,—যখনই 'শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে'। কিন্তু, 'মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দে' কান ভ'রে অবসর পাওয়া কবির মনে বিচিত্র সাধ জাগে :

'গাছের ছায়ার তলে মদ লয়ে কোন্ ভাঁড়
বেঁধেছিল ছড়া !
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া ;
ভুলে গিয়ে রাজ্য -জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিলো তুলে নেবো তার শীতলতা ;
ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব ,—
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে,—
সুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব ।'

গাছের ছায়ার তলে' ছড়া বেঁধেছিল যে ভাঁড়টি সে শেক্সপীয়র সৃষ্ট জাক্ ছাড়া আর কে হবে? (আর্ডেনের বনে সেই তো ভাগ্যদেবীর চপলতা নিয়ে মনের দুঃখে গান বেঁধেছিল!) 'অনেক মাটির তলায় চাপা প'ড়ে ঠাণ্ডা-হওয়া মদ নাইটিংগেল-গীতমুগ্ধ কীট্সের কল্পিত রক্তিম সফেন সুরার পাত্রটি ছাড়া আর কী-ইবা মনে পড়িয়ে দেয়। বাংলা বিহারের 'পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েরা' হয়তো বা নবান্ন উৎসবে ফসলের নাচ নাচে, তবে যে বিশেষ বর্ণনাটি কবি দিয়েছেন—'হাতে হাত ধ'রে ধ'রে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে', তা কিন্তু পাশ্চাত্য পল্লীর একটি অতি প্রাচীন উৎসবকেও ভয়ানক কাছে এনে দেয়—এ উৎসবে (এও মাটি শস্যবতী হওয়ারই উৎসব) কুমারীর দল 'ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে' গাছপালাকে পরিক্রমা করে নাচে, গায়।

এখানে লক্ষণীয় সবকটি ইমেজ কিন্তু আনন্দোচ্ছল নয়। জাকের ছড়াবাঁধার মধ্যে আনন্দ বা কৌতুকের প্রকাশ নেই কিছু,—সে তো গদিচ্যুত ডিউকের ভাগ্য পরিবর্তনে সমবেদনাই শুধু জানিয়েছে। তেমনি কীট্‌সের ওই অতিমধুর মদও কল্পনামাত্র, নাইটিংগেলের গানের মতোই তার আনন্দও তীব্র এবং ক্ষণস্থায়ী, একটি মৃত্যুমুখী তরুণের ব্যর্থ বাসনারই প্রকাশ। বেদনাতুর বলেই বুঝি দৃশ্যগুলি জীবনানন্দ কাব্যের বিশেষ উপযোগী—কেন না, তাঁর দৃষ্টিতে সব সৌন্দর্যই তো মৃত্যুর করুণ শান্তিতে পরিসমাপ্ত—হেমন্তের এই পূর্ণগর্ভ ফুপুরটি—যাকে ঘিরে অবসরের এ উৎসব—সে-ও তো এক অর্থে অবসানেরই প্রতীক্ষায়। কবির ভাষায়—'এ সুন্দরীর বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে!'

নিসর্গচিন্তার চেয়ে গভীরতর উপলব্ধির স্বাদ জীবনানন্দ কাব্যে পাই কবির মৃত্যুচিন্তায়। মৃত্যু এক অনিবার্য পরিণাম, অনতিক্রম্য শান্তি; 'সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ'। কবি তাই,

'তারপর মৃত্যু তাই চাহিলাম—মৃত্যু ভালো—
মৃত্যু তাই আর একবার,

*　　　　*　　　　*

বৈতরণী—বৈতরণী—শান্তি দেয়—শান্তি—শান্তি—
ঘুম—ঘুম—ঘুম
অবিরত তারি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।'

সুধীর শান্ত এ মৃত্যুর করুণ মুখ ফলন্ত মাটির পরিপূর্ণ যৌবনের আড়াল থেকেও উঁকি দিয়ে যায় আবার প্রেমের নিবিড় মুহূর্তেও ('নির্জন স্বাক্ষর')। এ করুণ মৃতির ধ্যানকল্পনায় রবীন্দ্রপ্রভাব অস্বীকার করার যেমন কারণ দেখি না, তেমনি কীট্‌স্ শেক্সপীয়ারকেই বা বিস্মৃত হওয়া যায় কী ক'রে।

জীবন প্রেমিক ব'লেই বুঝি বা কবির মৃত্যুসম্ভাষণে এতখানি মাধুর্য—

'মৃত্যুরে বন্ধুর মতো ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন,
চিত্তে শিশুর মতো তার কোলে লুকায়েছি মুখ' ('জীবন')

তবু এ সম্ভাষণকে এক একান্ত রৈবিক 'শ্যামসমান' সম্বোধন মনে করলে কবিমনের ব্যাপ্তিকেই অস্বীকার করা হবে—বিশেষত এর পরের লাইনটিতে যখন কীট্‌সের সুস্পষ্ট একো শোনা যায়:

'মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধ'রে'।

আবার

'তাই আমি প্রিয়তম ;—প্রিয়া বলে জড়ায়েছি বুক—
ছায়ার মতন আমি হয়েছি তোমার পাশে গিয়া !
যে-ধূপ নিভিয়া যায় তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক,—
যে-ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমোনো গন্ধের মতো স্বপ্ন হয়ে তার ঠোঁটে চুমো দিও, প্রিয়া !'

ইংরেজ তরুণের মনেও এই রোমাণ্টিক মৃত্যুচেতনাই প্রেমের অস্পষ্ট লাবণ্যে আবৃত হয়ে ছায়ালোকে জৈব অস্তিত্বের সমাপ্তি কামনা করেছে– নাইটিংগেলের গান শুনতে শুনতে সেও বহুবার

'Called him (Death) soft names
in many a mused rhyme
To take into the air my quiet breath
Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain', ইত্যাদি।

উভয় কল্পনাতেই 'রোগীর জ্বরের মতো পৃথিবীর পথের জীবন' (the fever and the fret here, where man sit and hear each other groan) আর তাই তো সুকুমারী মৃত্যুর 'তাপবিমোচন করুণ 'কার' এত লোভনীয় এবং তাই তাকে প্রিয় সম্বোধনের আকুলতায় আবিষ্ট ক'রে শূন্যলোকে যন্ত্রণাহীন নির্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা।

ক্ষেত্রবিশেষে আবার এই কোমল নস্ট্যালজিয়াই পরিণত হয়েছে কর্কশ কঙ্কালের কবর-ই কল্পনায়—যেমন 'অবসরের গান' কবিতায়। এ অংশের ভাবটুকু 'হ্যাম্‌লেটে'র কবর খুঁড়িয়েদের কথাবার্তাকেই মনে আনবে। এবারে মৃত্যু সেই নির্দয় দয়াময় হাত, যা রাজার মাথা থেকেও কেড়ে নিয়েছে মুকুট আর মিশিয়ে দিয়েছে তারও দেহাবশেষ ভাঁড়ের অস্থির সঙ্গে—

'আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়—
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নিচে পৃথিবী তলে !'

এখানে শেক্সপীয়ারের সঙ্গে মামুলী পরিচয় আছে এমন লোকেরও মনে পড়ে যাবে 'হ্যামলেটে'র বিখ্যাত 'গ্রেভ-ডিগার' দৃশ্য। মনে পড়বে বিপদ বায়ুগ্রস্ত কুমার হ্যামলেটের কবরের মাটিতে একই সঙ্গে সিজার ও রাজবাড়ির পুরনো ভাঁড়টির করোটি খুঁজে পাওয়া। যে ওষ্ঠে সে শিশুকালে বার বার চুম্বন করেছে

তার জায়গায় আজ শুধুমাত্র বিরাট এক গহ্বর দেখেছে সে—পুরাতনের পূতি-গন্ধে তার নাসিকা কুঞ্চিত হয়েছে! জীবনানন্দ কাব্যে মৃত্যু কখনও কখনও ওই শেক্সপীয়ারীয় মৃত্যুও বটে—বাস্তব, কর্কশাঙ্গুলি, সত্য।

শেক্সপীয়ারীয় রচনার ছায়া আর কত লেখনীবদ্ধ করব?' এইসব ভাঁড়েরা কবির ভাষায়, নেহাতই পাড়াগেঁয়ে,

> শৌখিন 'প্রণয়ীর মতো তারা ছেঁড়েনি হৃদয়
> ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে;'

শেক্সপীয়ার-পাঠকের এক্ষুনি মনে পড়ে যাবে, এলিজাবেথীয় যুগে 'প্রণয়ের রীতি' ছিল ওই,—এবং স্বয়ং প্রিন্স হ্যাম্‌লেটও ছড়া বেঁধে প্রণয় নিবেদনের চাপল্য প্রকাশ না ক'রে পারেন নি ওফেলিয়ার প্রিয় নামে।

তবু সবশেষে এই কথাই বলব যে জীবনানন্দের রচনায় পাশ্চাত্য কাব্যের যে অনুসরণ দেখি তা নেহাতই আকস্মিক ইচ্ছাকৃত নয়। কারণ মনীষীদের চিন্তা-ধারা প্রায় একই পথ ধরে চলে। তাই জীবনানন্দ কাব্য আজও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্ব আসরে সমুজ্জ্বল।

জীবনানন্দের বাস্তবতাবোধ

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

জীবনানন্দকে সচরাচর নির্জন কবি বলেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। লৌকিক অথবা ব্যাবহারিক জীবনে তিনি নির্জন ছিলেন—এ কথা সত্যি কিন্তু কবি হিসাবেও যে তিনি নির্জন—এ কথাটার অর্থ আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি না। কবি মাত্রই তো নির্জন। কবির একটি সামাজিক সত্তা থাকে—যে সত্তায় তিনি দৈনন্দিন জীবন ব্যাপারগুলি সমাধান করে থাকেন, এই সত্তার দিক থেকে হয় তিনি খুব মিশুক, নয় লাজুক, নয় নির্জন, নয় খোস-গল্পে—ইত্যাদি নানা ধাতুর বা ধরনের হতে পারেন। কিন্তু কবি-সত্তায় তাঁকে সম্পূর্ণ একাকীত্ব বোধ করতেই হবে, তাকে তো নির্জন হতেই হবে। সুতরাং আমার মনে হয় 'নির্জন' বিশেষণটি অকারণ ও বাড়তি। তবে জীবনানন্দ সম্পর্কে নির্জন বিশেষণটির অন্য এক ব্যঞ্জনা আছে। কবিত্বের আবেগ ও আবহাওয়ায় তাঁর চিত্ত সদাই মশগুল থাকত, ব্যাবহারিক ও প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিবিম্বিত সামাজিক সত্তাই তাঁর অন্তর-লোকের কবিসত্তার দ্বারা সর্বদাই গ্রস্ত থাকতো,—সেই জন্যেই মনে হয় 'নির্জন' পদটি তাঁর কবি-সত্তার পূর্বে বসিয়ে তাঁকে সংক্ষেপে অথচ সুচারুরূপে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

এতে হয়েছে আর এক মুশকিল। নির্জন কথাটি থেকে ক্রমে ক্রমে এই রকম একটা ধারণা করে নেওয়া হল যে কবি যখন নির্জন তখন বোধহয়, বাস্তব-সংসার থেকেই তাঁর এ নির্জনতা। আর বাস্তব-সংসার থেকে নির্জনতার ভুল অর্থ ধরে নেওয়া হল বাস্তব-বিমুখতা। ফলে কবি জীবনানন্দ দাশ বাস্তববিমুখ কোনো স্বপ্নলোকের কবি হয়েই চিত্রিত হয়ে রইলেন। তাঁর সম্পর্কে এই ধরনের কতকগুলি বিশেষণ প্রযুক্ত হতে লাগল। জানি না এই বিশেষণ-বিভূষণের পরিপূর্ণ সার্থকতা কোথায়।

জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করলে সহসা তাঁকে স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণশীল কবি বলেই কারুর কারুর মনে হতে পারে। এই বাস্তবলোকের মাটি ছেড়ে তিনি যেন আকাশচারী হয়ে উঠেছেন। দূর, অস্পষ্ট, ধূসর কোন্ জগৎ ও জীবনের এক কল্পনা-রঙীন ছবি বুঝি তিনি এঁকেছেন,— স্নিগ্ধ, কোমল অভিরাম, রমণীয় বর্ণাঢ্যতামোড়া কোন্ প্রকৃতি তিনি বিচিত্রিত করেছেন—তাঁর চিত্রলোক

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ-ছোঁয়া কোনো বাস্তব জগতের স্থান নয়, নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার কোন্ এক আলাদা রাজ্য বুঝি বা—হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা ক্লান্তপ্রাণ মানুষের বিচরণ ক্ষেত্রে বুঝি সে, বুঝি সেখানে নরম নদীর নারী কুয়াশার ফুল ছড়ায়। তাঁর কবিতা থেকে এ ধরনের আরো হাজার উল্লেখ করা যেতে পারে।

এতৎ সত্ত্বেও—এই পলায়নপর ভাবকল্পনা-সমৃদ্ধ হয়েও জীবনানন্দ রবীন্দ্রোত্তর যুগের এক বিশিষ্টতম কবিরূপেই স্বীকৃত। এবং বলাও বোধকরি নিষ্প্রয়োজন যে এই স্বীকৃতির তিনি যথাযোগ্য এবং একান্ত উপযুক্ত অধিকারী।

আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয় কিন্তু জীবনানন্দের সামগ্রিক মূল্যায়ন নয়। তিনি প্রধানত রোমান্টিক কবি ছিলেন। আর এই রোমান্টিক শিল্প-কৌশলই তাঁর কাব্যনির্মাণের প্রাণবস্তু ছিল বলেই হোক আর অপরূপ শব্দ-চয়নের জহুরিপনাতেই হোক বা একান্ত অপরিচিত বাস্তবকে কোনো এক জাদু-বলে বাস্তবাতীত মোহে রূপান্তরিত করে তুলবার আশ্চর্য ক্ষমতার জন্যেই হোক —তাঁকে কোনো কোনো মহলে স্বপ্নলোকের নভোশ্চারীরূপেই বিচিত্র করে রাখা হল। তাঁকে যাঁরা নিছক স্বপ্নচারী কল্পনালোকের অভিযাত্রী বলে স্বতন্ত্র করে রাখতে চান বা রেখে থাকেন—আজ আমি শুধু তাঁদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদের কথা তুলবো। অর্থাৎ জীবনানন্দের মধ্যেও যে বাস্তব জগৎ ধরা পড়েছে, এর জনসাধারণ—আর সেই জনসাধারণের স্বাভাবিক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-প্রীতিও যে তাঁর কাব্যে রূপ লাভ করেছে, আবর্তিত হয়েছে আমি সেই ঠিকানাই এখানে নির্দেশ করতে চেষ্টা করবো।

আমি বিশ্বাস করি জীবনানন্দ রোমান্টিক কবি। কোন্ কবি না রোমান্টিক? বাস্তব ব্যাপারকে বাস্তবাতীত করে পরিবেশন করাই রোমান্টিক মনের কাজ—আর তা না করলেও তো ঘটনা সাহিত্যের মানে উন্নীত হয় না। তবে কাব্যের উপজীব্য বিষয়ের ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই আমরা প্রধানত বিচার করি কবির মনন কোন্ ভাবনায় ভাবিত। এই নিরিখে দেখলে বলতে হয় যে জীবনানন্দ মূলত বস্তুধর্মী নন। কিন্তু ঠিক তা নয়। তিনিও সমাজ-সচেতন কবি, তার প্রমাণ ও পরিচয় যথেষ্ট আছে।

তাঁর গোড়ার দিকের সমস্ত কবিতার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তিনিও অপূর্ব কৌশলে তাঁর স্বপ্ন, বাসনা ও বিশ্বাসকে কল্পনার রসায়নে অপূর্ব কাব্যত্বে মণ্ডিত করেছেন; তাঁর মন প্রকৃতিমুখী এবং অতীতচারী—এ কথা মেনে নিয়েও বলা চলে যে এই মনেরও একটি বিবর্তন দেখা যায়। তাঁর

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' থেকে সর্বশেষ প্রকাশিত রচনা পর্যন্ত সুচিন্তিত ধৈর্যশীল পাঠ-পরিক্রমার দ্বারা এটুকু অন্তত নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হবে যে তিনিও সমাজ-সজাগ এক চিত্তের অধিকারী এবং ক্রমে তিনিও মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। কবি-জীবনের পূর্বাহ্ণে তাঁর যদিও 'পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়'—তথাপি মধ্যাহ্নে তিনি না বলে পারেন না যে—'আমরা তো তিমির বিনাশী হতে চাই।' তিনি বলেন—

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

তাঁর একক মানুষ সামাজিক সত্তার রূপ পেয়েছে, নভোচারী মন মাটিতে নেমে এসেছে। কবির ব্যক্তিক অনুভূতি ঐতিহাসিক চেতনার তটে আবর্তিত হয়েছে।

জীবনানন্দের এই বাস্তবতার বীজ রয়েছে এই বিবর্তনে। প্রকৃতির নানা রাজ্যে নানা দিকের চেনা অচেনা নানা জিনিসের প্রতি তাঁর যেমন গভীর দৃষ্টি ছিল, ঠিক তেমনি এই জগতের মানুষের নানা মনোভাবের প্রতি বুদ্ধিগম্য ও অসাধারণ নানান উপলব্ধির প্রতিই তাঁর মনোনিবেশ ছিল একান্ত। ইদানীং কালের প্রায় সব কবিতাতেই এই রকম একটা জীবনোপলব্ধি লক্ষ্য করা যায়—তাঁর কাব্যে জীবনের খুব কাছাকাছি তিনি কবিতাকে পরিচ্ছন্ন করে গ্রথিত করতে প্রয়াস পেতেন, জীবন-সম্পর্কিত যা কিছু তাঁর কথা—তা কাব্যিক সুষমায় তিনি প্রকাশ করেই কাব্য সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি জীবন-বোধকেই কাব্যের মাল-মশলা বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতেন—পৃথিবীতে দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে, যুদ্ধ, বিভীষিকা, স্বার্থবাদ, জুলুমবাজী প্রভৃতি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক মহামারী এসে গ্রাস করছে মানব সভ্যতাকে, 'পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম।' তিনি বললেন—

ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হয়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হলো মানুষের বৃত্তি আদায়।
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহ দরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিম্বের মতন।

জীবনানন্দের 'আবহমান' ও 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতা দুটির মধ্যে দিয়েও ধরা পড়েছে তাঁর জীবনের উপলব্ধি—আর তিনি এই উপলব্ধিকেই কবিতায়

উপজীব্য বিষয় করে নিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'জীবনের খুব কাছে কবিতা ও তার সংজ্ঞাকে নিয়ে আমার প্রয়োজন।' এই বিশ্বাসেই তাঁর মন ভরপুর ছিল। তিনি ধূসর পাণ্ডুলিপিতেই সমস্ত বাস্তব উপকরণ ও উপলব্ধিগুলিকে কবিত্বের অপরূপ জাদুস্পর্শে অপূর্ব করে তুলতে পেরেছেন।

আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দল
জোনাকিতে ভরে গেছে যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে।

এই চিত্রের পাশে সাম্প্রতিক কালের কবিতায় তিনি যে কথা বলেছেন তা তুলে ধরলে দেখা যাবে তাঁর মন কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে।

আমরা জটিল ঢের হয়ে গেছি বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে· ·
আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যু পরস্পর ছিল ইতিহাসে ;
বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অব্‌লঙ্‌ ছবি ;
নানারূপ ক্ষতি সয়ে নানাদিকে মরে গেছি।

এই বিবর্তনই জীবনানন্দের বাস্তবতাবোধের ভিত্তি। রূঢ় বাস্তবতার কাব্য রূপায়ণে কয়েকটি নিদর্শন বা পরিচয় না উপস্থিত করলে কবির প্রতি অবিচার করা হবে ভেবে আমি তাঁর কয়েকটি বাস্তব-চিত্র কাব্যের উল্লেখ করেছি মাত্র। তিনি আদৌ আধুনিক জগৎ ও আজকের জীবনধারা সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞান ছিলেন না। তিনি বলেছেন—

মেশিন প্রতিম অধিনায়ক বলে :
সকল ভূগোল নিতে হবে নতুন করে গড়ে
আমার হাতে গড়া ইতিহাসের ভেতরে
নতুন সময় সীমাবলয় সবই তো আজ আমি ;
ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আমার স্বত্বাধিকারীকামী।

কিংবা,

সবাই তো আজ যে যার অন্তরঙ্গ জিনিস খুঁজে
মানব ভ্রাতাবোনকে বুকে টেনে নেবার ছলে.
তাদের নিকেশ করে অনির্বচন রক্তে এই পৃথিবীর জলে
নানারকম নতুন নামের বৃহৎ ভীষণ নদী হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়। ১৯৪৬-৪৭ সালের বাংলাদেশে যে ঝড়, যে দুর্যোগ—তাতেও কবি-চিত্ত রীতিমতো আলোড়িত হয়েছে। সম্প্রদায়গতভাবে যে দু-একজন

আপাততঃ সৌভাগ্যবান মানুষ বহুকে বঞ্চিত বা প্রতারিত করে নিজেদের স্ফীত করে তোলেন—তাদের প্রতিও কবির তীব্র ঘৃণা।

অনেকেরই উর্ধ্বশ্বাসে যেতে হয়, তবু
নিজেদের ঘরবাড়ি আসবাব— অথবা যা নিজেদের নয়
সে-সব জিনিস।
বহুকে বঞ্চিত করে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে।

তারা মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে পণ্যরূপে গণ্য করে। বাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রাম আজ নৈরাশ্যের আলোহীনতায় নিস্তব্ধ ও নিস্তেজ, কবির দৃষ্টি তা এড়ায় নি। যে গ্রামে রাত্রি একদিন আলপনার মতো, পটে আঁকা ছবির মতো 'সুহাস্য' ছিল, সেই গ্রাম রাত্রির অমেয় ঔজ্জ্বল্য আজ নিভে গেছে ; এমনকি সেদিনেও বাংলার গ্রামে গ্রামে নবান্নের ঘ্রাণে—নতুন চালের রসে কত স্বাদ ও সৌরভ ছিল, কত কাক সেই সৌগন্ধ আস্বাদের আশায় জড়ো হতো আর আজ এখন টুঁ শব্দ নেই আর।

মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয়
সময়ের হাতে অন্তহীন।

সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন-ব্যবস্থার স্নিগ্ধ একটি চিত্র এঁকে প্রাচীন গ্রাম্য জীবনের ছবিকে স্পষ্টতর করেই কবি বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে অত্যাচার ও জুলুমবাজি চলেছে তার কদর্থতায় পূর্বতন সেই স্নিগ্ধ জীবন আজ কি রূপ গ্রহণ করেছে—তা দেখিয়েছেন—

ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হতো
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মায়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে—বিবাহের কিছু পরে সন্তানের জন্মাবার আগে।
সে-সব সন্তান আজ এ যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোক সমাজের ভীড়ে চাপা পড়ে—মৃত প্রায়।

সমাজের নীচু স্তরের হৃতসর্বস্ব ও বঞ্চিতবুদ্ধি মানুষের বর্ণনায় কবির দরদের অভাব নেই।

জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব ; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকা কাটা জিনিসের কেনা-কাটা করে ;

অথবা,

অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে
সঠিক শ্রমিক নয় তারা।
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নঃশ্রেণী মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিধি থেকে ঝরে
এরা তবু মৃত নয়, অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।

এরা জীবনের সকল নির্দেশ বুঝি বা হারিয়ে ফেলেছে। গৃহ, নীড়, আশা, ভালবাসা সকল কিছুর খেই হারিয়ে ফেলে জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে।

জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে,
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।

এদের জন্যেই কি মেডিকেল কলেজের ক্যাম্বেলের বেলগাছিয়ার যাদবপুরের বেড কাঁচড়াপাড়ার বেড মোতায়েন থাকে? কবি জিজ্ঞাসা করেন—যত বেড রয়েছে সকলের জন্যেই কি সুব্যবস্থা? তিনি জবাব পান না।

বেড আছে বেশী নেই—সকলের প্রয়োজনে নেই।
যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।
বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত ধরে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলেছে
তাদের আকাশ কোন্‌দিকে?

কবি স্পষ্টই বলতে পেরেছেন যে তাদের আকাশ সর্বদাই ফুটপাতে। মাঝে মাঝে অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ির ভেতরে জীবনের রণে ক্লান্ত নাবিকেরা যেন ঘরে ফিরে আসে। এইভাবে দিন যায় রাত আসে। পদচিহ্নময় পথ দিকচক্রহীন হয়ে যায়, কেবলি পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে 'হা-ঘরে হা-ভাতেদের তরে অনেক বেডের প্রয়োজন।' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কবি সমাজকল্যাণকামীদের প্রতি যাঁরা এই পচা গলা ক্ষতকে সারিয়ে দিতে চান—যাঁরা তুচ্ছতম আর্তের শরীরেও সান্ত্বনা এনে দিতে চান—তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন—

যারা এই সব মৃত্যু রোধ করে এক সাহসী পৃথিবী
সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—

তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।

জীবনানন্দের সমাজ-সচেতনাও খুব তীক্ষ্ণ ছিল। বঙ্গ বিভাগের ফলে দেশের উদ্বাস্তু মানুষ তাঁর চিত্তে ছায়া ফেলেছে।

স্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে
চিহ্ন ছেড়ে অন্য দিকে গিয়ে
ঘড়ির কাঁটার থেকে সময়ের স্নায়ুর স্পন্দন

খসিয়ে বিমুক্ত হতে হয় যাদের তাদের সম্পর্কে কবি উদাসীন ছিলেন না। ১৯৪৬-৪৭ সালের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাও কবিচিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছে; তিনি বললেন—

পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূঢ়কে
বধ করে ঘুমাতেছি।

জীবনানন্দের বাস্তবতা প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন আশাবাদী কবি। দুঃখ দুর্দশা পৃথিবীকে অক্টোপাসের মতো গ্রাস করেছে—কিন্তু তবু মানুষ তার অমেয় প্রাণশক্তিতে এই ক্লেদের বেড়াজাল ডিঙিয়ে অক্ষয় সৌন্দর্যলোকে পৌঁছুতে পারবে, তার অনন্ত প্রাণযাত্রা সফল হবে—এ বিশ্বাসই তার ইদানীংকালের কাব্যের মূল কথা। আর এই আশাবাদীতাই হলো বাস্তববাদিতার শেষ কথা, অথবা বাস্তববাদীর মূল লক্ষ্যই হলো আশাবাদিতা। সুতরাং এদিক থেকে, জীবনানন্দকে বাস্তববাদী কবি বলা চলতে পারে।

যদিও মানুষ এই পৃথিবীতে মৃত্যুদেশের অভিমুখে সঞ্চরণশীল,—

তবু আলো পৃথিবীর দিকে
সূর্য রোজ সঙ্গে করে আনে
মহাইতিহাস এসে এখনও জানেনি যার মানে—

সেই দিকেই মানুষ নিত্যক্ষণ পদচিহ্নের মতো গ্লানি প্রেম ক্ষয় ক্ষতি প্রভৃতিকে সঙ্গে করে অভিসারে চলেছে; নব সূর্য, নব পাখি, নব চিহ্ন নগর নিবাসে যেখানে প্রতিস্পন্দিত—সেখানেই নব নব যাত্রীদের সঙ্গে মিশে যায় প্রাণ-লোক যাত্রীদের ভিড়। কবি স্পষ্টই বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিক মরণে মানুষের অনন্ত

প্রাণের ক্ষয় হয় না, মানবের চিরন্তন ধারার মধ্যেই মানুষের যথার্থ কল্যাণ। মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়। কবি এ কথা বলেছেন স্থির প্রত্যয় নিয়ে।

কবি কুষ্ঠ কলঙ্কিত নারীর ঠোঁটেও আশ্চর্য গান বাজিয়েছেন। ভবঘুরে বোবা কালা পাগল মিনসে যে বেহালা বাজায়—তার মধ্যে এক অপরূপ স্বরমূর্ছনা শুনতে পেয়েছেন। সর্বত্রই তিনি শান্ত সমাহিত এক উজ্জ্বলতার আভাস প্রত্যক্ষ করে গেছেন। বহুক্লিষ্ট রাজনীতি, রুগ্ন মহামারী, প্রাণধ্বংসী মন্বন্তর, সর্বঘাতী যুদ্ধ—এই আড়াই হাজার বছর বয়সী পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে,—এই অভিঘাতে আজ পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস কেবলই যখন শিথিল হয়ে যায়—তবু কবি তার অপরিমেয় আশাবাদিতার স্পষ্ট উচ্চারণ শুনিয়েছেন আমাদের সবাইকে।

তবু,
কী যে উদয়ের সাগরের প্রতিবিম্ব জ্ব'লে উঠে রোদে!
উদয় সমাপ্ত হ'য়ে গেছে নাকি সে অনেক আগে?
কোথাও বাতাস নেই, তবু
মর্মরিত হ'য়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে।
কোনো পাখি
কালের ফোকরে আজ নেই, তবু, নব সৃষ্টিমরালের মতো কলস্বরে
কেন কথা বলি; কোনো নারী
নেই, তবু আকাশহংসীর কণ্ঠে ভোরের সাগর উতরোল।

আমরা মৃত্যুত্তীর্ণ এক সহজ সুন্দর পরিবেশে উন্নীত হতে চাই, প্রেমকে পাথেয় করে জয় করতে চাই জীবনকে, জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে।

আমরা অন্তিম মূল্যে পেতে চাই— প্রেমে;
পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বারবার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে বলে।

অতি সংক্ষেপে জীবনানন্দের বাস্তবতাবোধের এই হচ্ছে একদিকের রেখাচিত্র মাত্র। কবিকে বর্ণরঙীন রোমান্টিক বোধের কবি বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু তিনি যে সমাজসচেতন কবি—সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই এই সংক্ষিপ্ত আয়োজন।

নির্জনতম কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যে—'বোধ'

ডঃ ফণী বসু

'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' বইখানির সব পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে একদম শেষের দিকে তার 'জীবনী পঞ্জীটি' আমার মধ্যে রোমাঞ্চ তোলে। আমিও পূর্ববঙ্গের বরিশালেরই একজন—এই ধারণা আমায় শুধু সুখী করে না, গৌরবান্বিতও করে তোলে। তার চেয়েও বেশী আশ্চর্য হই এই ভেবে যে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত আমি যখন বরিশালে ব্রজমোহন স্কুলে পড়তাম তখন জীবনানন্দ দাশ ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা শহরের মতো বিরাট ও সেই হারিয়ে যাওয়া শহরে এই ধারণার কোনো তাৎপর্য নেই জানি কিন্তু বরিশালের মতো ছোট ঘনিষ্ঠ শহরে এই কাছাকাছি থাকার বোধ সংলগ্ন থাকার অনুভূতি ছড়ায়। বরিশালের স্টীমার ঘাটের ও নদীর সমান্তরালে মাইল মাইলব্যাপী রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য ঝাউগাছ সমন্বিত সেই রাস্তা ও নদীর একত্রিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যারা দেখেন নি তাদের কাছে এর উল্লেখেরও কোনো দাম নেই। অথচ পৃথিবীতে আর কোথায় নদী, রাস্তা, সবুজ ও ঝাউ-গাছের যে অমন সমন্বিত সৌন্দর্য আছে তা আজও ভেবে মরি! কিছুতেই না ভেবে পারি না—যে ঐ রাস্তা দিয়ে যখন আরও হাজার হাজার বরিশালের শহরবাসীর মতন আমি—চাঁদমারির দিকে হেঁটে বেড়াতাম তখন সেই সৌন্দর্য মেলায় নিশ্চয়ই জীবনানন্দ দাশও কোথাও কখনও আমারই পাশে হাজির ছিলেন। বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে পড়তেন জীবনানন্দ। এতদিন পরে ভাবতে গিয়ে মন ভরে ওঠে এই ভেবে—হয়তো আমি তারই বসার জায়গায় কখনো কোনোখানে বসে ক্লাসের পড়া তৈরী করেছি। কবির সঙ্গে এই সান্নিধ্য বোধের গর্বই প্রমাণ করে—জীবনানন্দ দাশকে আমি অন্তরের কোনোখানে উপলব্ধি করি।

ধারণাটা প্রায় সত্যে দাঁড়িয়ে আছে যে জীবনানন্দ শুধু নির্জন কবিই নন। তিনি নির্জনতার মূর্ত ধারক। তাঁর আশেপাশে সব সময়েই একটা নির্জনতা বা একাকীত্বের প্রলেপ লেপ্টে জড়িয়ে থাকত। তিনি কথা বলতেন খুবই কম। তর্ক করা তাঁর স্বভাব ছিল না এবং পথেঘাটে একাকী চলায় মুখে তিনি মগ্ন হয়ে থাকতেন। তাঁর কবিতায় প্রাণের ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর জীবন

যাপনের আশ্চর্য মিল ও একাত্মতা দেখে মনে হয়ে কবির সত্তা—ও চিন্তায় কোনো খাদ ছিল না। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা—শুধু বাইরে নয় ভিতরেও বহন করতেন। অর্থাৎ অনুভূতির রাজ্যেও তিনি কল্পনাকে ঔচিত্যের অতিরিক্ত আসন দেন নি। জীবনানন্দ দাশের কবিতার সমালোচনা বা ব্যাখ্যা করার সাধ্য, শৈলী বা আগ্রহও আমার মধ্যে নেই। তার জন্য আরও অধিকতর উপযুক্ত লেখক রয়েছেন। আমার প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনানন্দের কবি মনের কিছু সন্ধান করা যে মন তাঁকে প্রতিনিয়ত অনুভূতির নিঃসঙ্গ বোধিবৃক্ষের তলায় নিয়ে বসিয়ে রেখে—ধ্যানমগ্নতায় ডুবিয়ে রাখত।

বুদ্ধদেব সংসারের সমগ্র জীবন ও যাতনার অন্তহীনতা ও বিপর্যয় বোধে একদিন বোধিবৃক্ষের তলায় এসে খুঁজতে চেয়েছিলেন জীবনে গূঢ় রহস্য ও আত্মার পরিত্রাণ পথ।

আমার মনে হয় কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশের প্রাণের গভীরতম তলদেশে ঐ একই অনুভূতি ও অস্থিরতা কাজ করত। করত বলেই তিনিও তাঁর হৃদয় ও চৈতন্যের সঙ্গমস্রোতে জীবনের সেই একই জটিলতার অবস্থান ও পরিমাপ নির্ণয়ে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এবং ছিলেন বলেই সমাজ বা রাজনীতির তৎকালীন ঝড়ঝঞ্ঝা বা আলোড়ন তাঁর এই ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসকে ব্যাহত করতে পারে নি। ১৯৩৯ থেকে থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব নর্তন, ধ্বংস ও পরবর্তী হাহাকার দুর্ভিক্ষ মহামারী সারা দেশকে ওলট-পালট করে দিয়ে গেল! —এমন কি ১৯৩৯ সনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী খণ্ড খণ্ড রাজনৈতিক আবর্তের ঢেউ দেশকে ও দেশবাসীকে কম ব্যাপৃত ও বিপর্যস্ত করে নি। তবুও দেখা যায় জীবনানন্দের সৃষ্টিতে বা কাব্য সম্ভারে সেই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ছাপ খুব সোচ্চার হয়ে ওঠে নি কোথাও যেমন হয়েছিল নজরুলের কবিতায়। জীবনানন্দ তখন ও সেই ধ্যানমগ্নতার, নির্জনতার সাধনযজ্ঞে সমাধিস্থ হয়ে সমগ্র মানুষের জীবনের নিরন্তর নিরাশ্রয়তা ও অসহায়তার স্বরূপ নির্ণয়নে মগ্ন ছিলেন। তাই ৪২-এর আন্দোলন অথবা '৪৬-৪৭ এর" সাম্প্রদায়িক কলহ পর্যন্ত তার এই মগ্নচৈতন্যকে বহির্মুখী করতে পারে নি। একজন্য নয় যে তার অনুভূতি বিচ্ছেদিত ছিল। এজন্য—কারণ তাঁর অনুভূতির তীব্রতা সামগ্রিক মানুষের দুঃখের আরও গভীরে আসন পেতেছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ তার গভীর উপলব্ধির তলদেশ থেকে মাঝে মাঝে তার সৃষ্টিতে—এই বহির্মুখী মানসিক আলোড়নকে সোচ্চার করে তুলেছেন যা তার

নানান স্বদেশধর্মী কবিতায় প্রকট। অথচ জীবনানন্দে এই পদক্ষেপ লক্ষণীয় ভাবে স্বল্প। জীবনানন্দ দাশের নির্জন-সত্তার এর চেয়ে বড় সাক্ষী আর নেই। একজন সৃষ্টিধর্মী শিল্পী দেশ ও কালের সংকটে নীরব থাকলে স্বভাবতই দেশবাসী ও পাঠকের মনে এক ক্ষোভ জমা হতে থাকে এবং বিপরীত মনোভাবের সৃষ্টি করে। অথচ আশ্চর্য! জীবনানন্দের কবিতায়—দেশ ও কালের সাময়িক ও সামাজিক সমস্যা ও সংকট স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও তাঁর বিরুদ্ধতা পাঠকসমাজে খুব প্রকট হয়ে ওঠে নি। তার কারণ তিনি মগ্ন-চৈতন্যে ছিলেন বলে নিরুদ্বেগ ছিলেন না। মানুষ ও সমাজের খণ্ড খণ্ড দুঃখ বা দুঃসময়ের পিছে না ছুটে তিনি সামগ্রিক মানুষের সংকটের অতি গভীরে ডুব দিয়ে ছিলেন। তাই সহজ হয়ে বেরিয়ে আসে—

"আরও এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত - ক্লান্ত করে ;"

এই ক্লান্তি ও বিস্ময়ের বিপন্নতা যে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপর্যয়ের চেয়ে আরও গভীর ও অতিস্থায়ী। তাহলে প্রশ্ন জাগে জীবনানন্দের কাব্য ও জীবনের স্বরূপ ও স্বভাব কি? অনেক পণ্ডিতজন এর আগে তাঁর কাব্যধর্মের অনেক গভীর তত্ত্ব ও তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন। আমি সেদিক দিয়ে যাবো না। মাত্র একটি কবিতার উল্লেখ ও উদ্ধৃতি দিয়ে আমি জীবনানন্দের সমস্ত সৃষ্টি ও রচনার মূলমন্ত্র ও প্রাণ খুঁজতে চেষ্টা করব—যা তাঁকে নির্জনতার অতিরহস্যময় সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর "বোধ" কবিতাটিকেই আমি আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বলে বেছে নিলাম।

কবিতা কি?—এ বিষয়ে জীবনানন্দের নিজস্ব মতামতের দাম আছে যখন আমরা তাঁর কবিতার প্রাণ খুঁজতে বসেছি। তাঁর নিজের কথায়—

"কবিতা অনেক রকম।"......এবং কবিতা 'এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।"

বক্তব্যটির তাৎপর্য অতি গুরুত্বময়। চিত্ত ও চেতনা এই দুটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ। যাকে চলতি অর্থে আমরা হৃদয় এবং বুদ্ধি বলে ধরে নিতে পারি। অথচ সাম্প্রতিক কবিতার সর্বাধুনিক রূপান্তরে এই চিত্ত বা হৃদয়ের স্থান গেছে নিতান্ত গৌণ হয়ে। এবং বুদ্ধি বা অতিবুদ্ধি চিত্তকে পায়ে

চেপটে মাড়িয়ে এক সর্বময় অস্তিত্বে উঠে এসেছে। বেশীর ভাগ ধ্রুপদী কবিতায় আজকাল আমরা এই চিত্তহীন চৈতন্যের এক অতি কঠিন বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক প্রকাশ দেখতে পাই।

কবিতাকে চিত্তের জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অতি-চৈতন্যের একান্ত বৈজ্ঞানিক স্তরে এই যে স্থাপনা এতে কবিতার শক্তি বা ধ্রুপদী সত্তা কতটা বেড়েছে জানি না (নিশ্চয়ই বেড়েছে) কিন্তু কবিতার প্রাণ গিয়েছে শুকিয়ে। তাই আধুনিক ধ্রুপদী কবিতা চৈতন্যকে যতই উত্তেজিত করুক কিন্তু প্রায়শই চিত্ত বা হৃদয়কে ছুঁয়ে যেতে পারে না। অথচ জীবনানন্দের কবিতা চৈতন্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েও চিত্তের প্রাচুর্যে ভরপুর। তাই তাঁর অতিরহস্যময়, অতি ধ্রুপদী কবিতাও চিত্তকে স্বাভাবিক ও অনিবার্য শক্তিতে জড়িয়ে ফেলে। তাঁর ভিতরের রহস্যময় সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারি বা না পারি। তার কারণ আর কিছু নয়—জীবনানন্দ দাশের কবিতা তাঁর নিজস্ব ভাষায়—"চিত্তের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।"

তাঁর কবিসত্তায় চিত্ত ও চৈতন্যের এই রূপ তীব্রতম ও গভীরতম হয়ে উঠেছে বলেই—জীবনানন্দকে নির্জনতার অতলে ডুব দিতে হয়েছিল। আমার নিজস্ব ধারণায় জীবনানন্দের সমগ্র সৃষ্টিও রচনায় উপলব্ধির একটি মাত্র চাবিকাঠি যদি কোথাও পাওয়া যায় তা আছে তার এই "বোধ" কবিতার মধ্যে।

...মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে ;
... ...
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;

এই বোধই কবির চিত্ত ও চৈতন্যের পবিত্র সত্তা।

...প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার !
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই !

নির্জনতার যাত্রাপথের মহৎ ও করুণ ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। উপরের সুন্দর অভিব্যক্তিতে সকল লোকের মতো হতে না পারার এই ব্যতিক্রম তাঁর জীবন ও মননকে ছুঁয়ে ছেয়ে ছিল। তিনি স্বাভাবিকভাবেই সোচ্চার অস্তিত্বের আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠার প্রেরণা অনুভব করেন নি। করতে পারেন নি বলেই—তিনি সমাজ

জীবন ও মননের আরও গভীরে ডুবে থাকার সাধনায় মগ্ন ছিলেন। অথচ এই নির্জনতা বা একাকীত্ব সমাজবিমুখী যেমন নয় তেমনি নয় নিরাসক্ত বা অনুভব শক্তিহীন।

…পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে ;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,

এই বোধ তার বৈরাগ্যের ইঙ্গিত নয় ; নির্দেশক নয় উদাসীনতার। এ যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছড়িয়ে চারদিকে মিশিয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার এক ইচ্ছার অভিব্যক্তি। এই বোধ সমাজসেবী মনের পরিকল্পিত প্রেমবোধের উচ্ছ্বাসময় প্রকাশ নয়—যা শুধু সময় ও লগ্ন বুঝে সোচ্চার হয়ে উৎক্ষিপ্ত হয়।

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?

জীবনানন্দের নির্জনতার ও নিঃসঙ্গতার সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য এইখানে। এই 'মুদ্রাদোষই' জীবনানন্দের চিত্ত ও চৈতন্যের একত্রিত অমোঘ সত্তা। এই-ই তার আভ্যন্তরীণ বোধ।—এর হাত থেকে কবির যেমন রেহাই নেই তেমনি নেই বিকল্প অবস্থান। এখানে তার নির্জনসত্তা অতি স্পষ্ট। অথচ এ বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্য নয়। এ একাত্মবোধের শেষ পরিণতি। স্বয়ং বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস যেমন সমগ্র মানুষকে ভালবাসার ও সমগ্র মানবিক মুক্তি পথ সন্ধানের এক অতি গভীর পরিণতি—জীবনানন্দের কাব্যসত্তার এই পরিণতিও ততই গভীর। এই গভীর বোধ কাজ করত বলেই খণ্ড খণ্ড সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনসত্তায় জীবনানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হয় নি।

…কিংবা যারা পৃথিবীর বীজখেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে ;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় নাকি ? তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি ?
—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী।

শেষের দুটি লাইনে একই শব্দের পুনরুক্তি এবং প্রশ্ন চিহ্নের রূপান্তর অতি তাৎপর্যপূর্ণ। কবির একাকীত্বের সংশয় ও দ্বিধা দূর হয়ে এখানে তাকে সুতীক্ষ্ন আত্মপ্রত্যয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। তবুও এ একাকীত্ব—সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাস যে নয় তার প্রমাণ—

আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি?

জীবনের সম্ভাব্য সুখ আহ্লাদ এবং শান্তির পথ ছেড়ে কবির স্বেচ্ছায় এই যে—দুঃখবরণ এবং অন্তর্দাহন—এই নীলকণ্ঠ সত্তা কোনো বৈরাগ্য বা মুক্তি পথের সন্ধান নয়। প্রত্যেক স্তরের মানুষের সর্বমুখী দুঃখ যাতনা ও বিষাদে involved হলেই মানুষ নির্জন-সাধনার এই কঠিন পর্যায়ে নামতে সাহসী হয়। কেননা—

···করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
... ...
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

জীবনানন্দের কবি ও প্রকৃতি সত্তার এর চেয়ে বড় প্রাণ ও প্রমাণ আর কি হতে পারে! কবিতার এই লাইন কয়টির চৈতন্যধর্ম যেমন অতি ব্যাপক তেমনি গভীর ও প্রত্যয়যুক্ত তার তীব্র চিত্তসত্তা। এর যে চিত্তগ্রাহী চিত্রকল্প তা অর্ধশিক্ষিত পাঠকের হৃদয়ও চুম্বকের মতো আটকে রাখবে। প্রশ্ন করি—সাম্প্রতিক কবিদের ক'টি কবিতার ক'টি লাইন এমন তীব্র চৈতন্যে ও হৃদয়সত্তায় তীক্ষ্ন ও শক্তিময়।

জানি না আজকাল বুদ্ধির প্রভাব এমন ঊর্ধ্বমুখী ও চিত্তবিদ্বেষী কেন। তা কি সাম্প্রতিক কবিদের ভিতরে চিত্ত, চৈতন্য ও সত্তার প্রচণ্ড গরমিলের প্রকাশ

নতুবা চিত্তহীন বুদ্ধিসর্বস্ব কবিতার আজকাল এমন প্রাদুর্ভাব কেন। কেন তাদের বেশীর ভাগ কবিতা আমাদের মনে ধাঁধার উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও হৃদয়কে জড়িত বা প্রভাবিত করতে পারে না! সার্থক কবিতার প্রধান গুণ এই যে—সে মস্তিষ্কের ধ্রুপদী চিন্তাকে হৃদয়ের জারক রসে গলিয়ে যথাযথ চিত্র-কল্প বা শব্দের মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়ের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অথচ দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—এই 'বোধ' আজকালকার অনেক কবিদের মধ্যে আর কাজ করে না।

সব শেষে রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির সঙ্গে জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতাটির সর্বশেষ উদ্ধৃতিটির তুলনা করতে চাই। আমার নিজস্ব ধারণায় ও বিশ্বাসে শিল্প ও প্রত্যয়ে জীবনানন্দ এখানে—রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গেছেন—অনুভূতি ও আত্মদানের তীব্রতায়। বিশ্বজনীন সংকটে ও বিপর্যয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনার জগৎ থেকে নেমে আসতে চাইলেও তাঁর নেমে আসায় স্থিরীকৃত শপথ নেই। তিনি বার বার তাঁর এই অতি দীর্ঘ কবিতায় —তাঁর ভিতরের এই 'বোধ'কে অনুরোধ করেছেন—"ওরে তুই ওঠ আজি"— অথবা 'কবি তবে উঠে এসো, যদি থাকে প্রাণ তবে তাই লহ সাথে।"

এ যেন প্রস্তুতি পর্ব বা প্রয়াস পর্ব—স্থির সিদ্ধান্ত বা পথযাত্রা নয়। এ যেন সংকটকালীন জগতের ওপার থেকে আশ্বাস প্রদান অথবা সহানুভূতি।

অথচ দেখুন জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই ঘোষণা সোচ্চার না হলেও তা শান্ত স্থিরীকৃত এক নিশ্চিত প্রত্যয়। যুদ্ধ নিশ্চয় সৈনিকের যাত্রার মতো তা সত্যে ও শপথে প্রোজ্জ্বল।

"পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ চায় না সে ?" এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকলে সে প্রশ্ন তার "বোধ" এর প্রতি, নিজের প্রতি নয়। এবং সব শেষের সেই 'নষ্ট শসা' ও 'পচা চাল্‌কুমড়ার ছাঁচের' সব ফলন্ত হৃদয় দেখবার স্থির সাধনায় তার প্রত্যয়ের সমাপ্তি। এই যে নির্জনতম সাধনায় কবির গভীর 'বোধ' যাকে আমি চিত্ত ও চৈতন্যের সুআনুপাতিক যোগফল ও পরিণতি বলতে চাইছি—এই মহান 'বোধ'ই জীবনানন্দ দাশের নির্জনতা ও কবিসত্তার কেন্দ্রভূমি।

প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ

সন্তোষকুমার অধিকারী

আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে জীবনানন্দের নাম যাঁরা স্মরণ করেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো এই প্রবন্ধের শিরোনামা দেখলে হতাশ হবেন। কারণ প্রকৃতি বা নিসর্গচেতনার সঙ্গে আধুনিকমনস্কতার কোথায় যেন একটা বিরোধ রয়ে গেছে। প্রকৃতির কবি বললে আমাদের মনে পড়ে ওয়ার্ড্স্ ওয়ার্থের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা। এই চিরাচরিত চিন্তাধারা থেকে. সেই আকাশ, চাঁদ, আর মেঘ বৃষ্টির মোহ থেকে যদি মুক্তিই না ঘটল তবে কিসের আধুনিকতা। প্রচলিত ধারা এবং বহুব্যবহৃত বিষয়বস্তুকে ত্যাগ করে নতুনতর পথেই না তার অভিযান!

আধুনিকতার সঠিক কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে যাঁরা নিজেদের আধুনিক বলে দাবি করেন, তাঁদের কেউ কেউ এর লক্ষণগুলি নির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন: প্রাচীন চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের মধ্যেই আধুনিকতার লক্ষণ। সেই একই ভাব আর ভাষা, সেই একই বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গি তার ব্যঞ্জনা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের মনে নতুন করে আনন্দ দেবার শক্তি ব্যবহারে ব্যবহারে নষ্ট হয়ে গেছে।

তাই আধুনিক মন চিন্তার স্রোতে বাঁক ফেরাতে চায়। আগেকার মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করেছেন, আমরা করি না। তাঁরা প্রবল আশাবাদী ছিলেন আমরা প্রচণ্ড নৈরাশ্যবাদী। তাঁরা সবকিছুর মধ্যে এক অদৃশ্য মঙ্গলময় সত্তার আবির্ভাব লক্ষ্য করতেন, আমার দেখি এক অমঙ্গলের নিষ্ঠুর পদচারণ। তাঁরা ছিলেন রোমাণ্টিক্ আমরা ন্যাচারালিস্ট্।

তাই 'প্রকৃতির কবি' নামটা আমাদের আধুনিকতার ধারণার পরিপন্থী। বরং নাগরিকতার কবি বলে তাঁর আধুনিকতাকে সুস্পষ্ট করে দেখানো যায়। জীবনানন্দ কি নাগরিক জীবনের অবক্ষয়, হতাশা ও ব্যর্থতাকে মূর্ত করে দেখান নি?

জীবনানন্দ নাগরিকতার কবি এ কথাও সত্য। তাঁর 'লাসকাটা ঘর' আধুনিক নগরজীবনের নিখুঁত এবং নির্ভুল পরিচয়। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের মতো কবি কোনো এক বিশেষ ধারাতেই ফুরিয়ে যেতে আসেন নি। কবির স্পর্শকাতর

মনে নগর এবং নিসর্গ একই ভাবে আলোড়ন তুলেছে। বস্তুত জীবনানন্দকে স্মরণ করতে গেলে আমরা বলি— তিনি ছিলেন মগ্নচৈতন্যের কবি। স্বপ্নময়তায় তাঁর চেতনা প্রবাহিত, তবু হতাশায় তাঁর হৃদয় আলোড়িত। জীবনের যন্ত্রণায় তিনি বিক্ষত, তবু তাঁর অন্তর্মুখী মন খণ্ড খণ্ড অনুভূতির স্রোতে প্রবহমান। এ-সমস্ত বলার পরও অনেকখানি না-বলা থেকে যায়। আধুনিক হ'য়েও জীবনানন্দ ছিলেন ঐতিহ্যানুসারী। তাঁর চেতনার গভীরে ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব। প্রকৃতি তাঁর কাব্য চিন্তার মানসসরোবর। তাঁর জীবনবোধের গভীরে নিসর্গচেতনা এতই প্রবল যে তাঁর সমস্ত চিন্তা ধারণা ও অনুভব তাঁর জীবন ও কাব্য এই প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত। তাই প্রকৃতির কবি বলে বর্ণনা করলে জীবনানন্দ সম্বন্ধে কোনো অসঙ্গত উক্তি করা হয় না। রবীন্দ্রনাথকেও প্রকৃতির কবি বলা হয়। কিন্তু জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথ নন। জীবনানন্দর নিসর্গানুভবে কোনো দার্শনিকবোধ নেই। তিনি জীবনদেবতার রূপকে সমগ্র বিশ্বজগতের মধ্যে উপলব্ধি করবার সাধনায় বসেন নি। তিনি শারীরিক চেতনার গাঢ়তায় নিসর্গকে পেতে চেয়েছেন। তীক্ষ্ণ ও সচেতন অনুভব যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে গিয়ে এই প্রাকৃতিক চেতনা। হয়তো অন্তর্মুখী স্বপ্নময়তার ধারাস্রোতে প্রকৃতি কখনও কখনও অপ্রাকৃত হ'য়ে উঠেছে। অনুভবের অন্তর্জলি প্রবাহে সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবদন্তী ও সংস্কারচিন্তার ছায়া পড়েছে। তিনি তন্ময় হ'য়ে মিশে গেছেন।

জীবনানন্দের জীবন তন্ময়তার এই নিবিড় রূপ প্রথম ধরা পড়েছে 'ঝরা পালক' গ্রন্থে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে তাঁর কাব্যচেতনা প্রকৃতির গাঢ় পরিবেশে মিশে এক স্বপ্নময় পরিবেশ গড়ে তুলেছে। 'বনলতা সেন' এ তিনি প্রকৃতির অন্তরঙ্গ রূপের মধ্যে দিয়ে অন্য কোনো চিরকালীন রূপের সন্ধান করেছেন। আর 'রূপসী বাংলা'র চিরসবুজ প্রকৃতির রূপালোকে তিনি এক হারানো জগতের স্বপ্নে তন্ময় হ'য়ে ডুব দিয়েছেন।

তাঁর কবি প্রকৃতির বর্ণনা করতে হ'লে প্রথম উল্লেখ করতে হয়—স্বপ্নমগ্নতার। যে কোনো সাধারণ তুচ্ছ বস্তুর চারিদিকে এক পরিবেশ গড়ে তুলে তিনি স্বপ্নে বুঁদ হ'য়ে যেতে পারেন। সেখানে তিনি একক নির্জন। সংগীতের মতো সুরে সুরে জলের ধারার মতো ঘুরে ঘুরে তিনি এমন এক রূপকথার জগতে পৌঁছে যান, যেখানে অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই।

তারপর—একদিন
আবার হলদে তৃণ

শু'য়ে আছে মাঠে,
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা…কড়্ কড়্;
শসাফুল—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল ..শুক্‌নো মাকড়সা
লতায়—পাতায়;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়;

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি হাতে রঙের তুলি নিয়ে ছন্দে ছবি আঁকতে বসেছিলেন। কনস্টাব্‌ল্ টার্নারের মতো তিনি তুলির পোঁচ দিয়ে প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড এক একটি ছবিকে 'চিত্ররূপময়' করে তুলেছেন। তাঁর এই ছবির কাব্য এক অনন্ত—স্বাতন্ত্রে দীপ্যমান।

"দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে, পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে;

কবির রূপকল্পনা এবারে গন্ধ ও স্পর্শের অতীতে এক প্রতীকি স্বপ্নের আলোকে মগ্ন :

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;

নির্জন ও শব্দহীন এক গাঢ় নিশীথের ভরা জ্যোৎস্নার ছায়ায় রূপতন্ময় এক কবির চোখে স্বপ্নময় এক ছবি। প্রকৃতির নির্জন হৃদয়ে অবগাহন না করলে জীবনানন্দ এমন নিবিড় ও অন্তরঙ্গ দৃশ্য আঁকবেন কি করে? সাময়িক মুগ্ধ কবির দৃষ্টি তো এ নয়। প্রকৃতি এবং পরিবেশ তাঁকে আজন্মকাল বুঝি জড়িয়ে রেখেছিল।

জীবনানন্দ শহরে জন্মান নি। তাঁর শৈশব কেটেছে দূর বরিশালের গ্রাম্য পরিবেশে। কিশোর বয়সেই তিনি প্রকৃতির এই রূপসাগরে ডুব দিয়েছিলেন। শ্রীঅশোকানন্দ দাশের লেখায় আমরা পাই :—

"দাদা প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন। আমাদের ছোটবেলায় আমাদের বরিশালের বাড়ির ঠিক পশ্চাতেই একটা কাঁচা রাস্তা ছিল। সেই পথ দিয়ে একটু অগ্রসর হ'লেই দেখা যেত দুধারে ধানের ক্ষেত। বিভিন্ন ঋতুতে সেই ধানক্ষেতগুলি নবনব রূপে দেখা দিত। কখনও দেখা যেত ঢেউ-খেলানো ধানের রাশি। কখনও বা ঈষৎ পক্ক ধান। আবার শীতের সময়ে ধানকাটা শেষ হ'য়ে গিয়েছে, শুধুই বিধবা মাঠ পড়ে আছে। মাঠের গর্ত থেকে বের হয়ে শুধু একটা ইঁদুর সরসর করে চলেছে।···

এই সব ঘাট-মাঠ দাদার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।"

[উত্তরসূরী—পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬১]

এই পরিবেশ তাঁর চেতনাকে অভিভূত করেছিল। তিনি মগ্ন হ'য়ে গিয়েছিলেন সেই ঘাট-মাঠ ও নদীর আলোছায়ায়। সেই দুধারের ধানক্ষেত যখন "অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ', তিনি দুচোখ ভরে দেখেছেন—"তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা।" হৃদয়ের এক সহজাত বিষণ্ণতা তাঁকে নির্জন করেছে; স্বপ্নময়তা তাঁর চেতনায় নতুন এক বোধের সঞ্চার করেছে। তিনি বলেছেন :

"আলো অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে—
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে।"

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র চিত্রকর কবি 'বনলতা সেন' ও 'মহা পৃথিবী'তে এক গভীর বোধের অতলে ডুব দিলেন। তাঁর হাতের তুলি এতদিন পৃথিবীর বর্ণাঢ্য চিত্র রূপকে এঁকেছে। এবারে সেই তুলিতে চিত্রকে, প্রকৃতির রূপকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করলেন। তাঁর ভৌগোলিক ধারণা এতদিনে প্রসারিত হয়ে গেছে।

" ···অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে
দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে।"

এতদিন যে চেতনা তাঁর চোখে শব্দ গন্ধ ও বর্ণের বিস্ময়ের মধ্যে বিচিত্র হয়ে জেগে উঠছিল, এবারে তা এক গাঢ় অনুভবের গভীরে শরীরিণী হয়ে উঠল।

তাঁর অবচেতন মন কালসত্তার প্রবহমান স্রোতে ডুব দিল। তাঁর খণ্ড খণ্ড মন এক নির্জন রূপের জগতে সংহত হল।

জীবনানন্দ দাশ আধুনিক ছিলেন বিশেষভাবে এই অর্থে, যে, তিনি সময় সচেতন ছিলেন। নাগরিক জীবনের সর্বনাশা নেশাকে তিনি দূর থেকে নিরপেক্ষ চোখ নিয়ে দেখেছেন। এই ক্ষয়িষ্ণু ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর বিকৃত জীবনযাত্রায় তাঁর স্বস্তি নেই। হতাশার যন্ত্রণায় ও ব্যর্থতায় তিনি ব্যাকুল। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শহরজীবনকে দেখে এক বিদীর্ণ হৃদয়ের ক্লান্তিতে তিনি অস্থির। তিনি দেখেছেন, লাসকাটা ঘরের মৃতদেহ, মড়কের ইঁদুরের শব। কিন্তু তবুও মননের দ্বারা উত্তীর্ণ হতে চাইলেন আবহমান জীবনালোকের নির্জন পটভূমিকায়।

'বনলতা সেন' থেকে যে উজ্জ্বল অনুভব তিনি আহরণ করেছিলেন, সেই অনুভবকে শান্ত ও স্নিগ্ধ প্রদীপের আলোয় প্রত্যক্ষ করলেন 'রূপসী বাংলা'য়। এখন তাঁর মনে এক নিশ্চিন্ত প্রশান্তি। আর ভুল নেই, নৈরাশ্যবোধ নেই, হৃদয়ের নিরন্ত যন্ত্রণাবোধ নেই; শুধু এক স্নিগ্ধ গাঢ় অনুভব। এই দুরন্ত ধাবমান পৃথিবী থেকে বিচ্যুত "দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর" "সবুজ ঘাসের দেশ" রূপসী বাংলা। কবি আর কোথাও যেতে রাজি নন। তিনি বলেন—

"তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব; দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;
দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে,
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—"

এ-কথা প্রকৃতির কবি জীবনানন্দের। তিনি জানেন—"এশিরিয়া ধুলো আজ, বেবিলন ছাই হ'য়ে আছে।" তাই নিশ্চিন্ত বিলাসে বলেন—

আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি—শালিখ নিয়েছে নিঙড়ায়ে
নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস; এ' সবুজ ঘাসের ভিতরে
সোঁদা ধুলো শুয়ে আছে—

চিরপরিচিত সেই সুদূরকালের বাংলাভূমি শুধু নয়, এ-যেন তার সকল অতীত ও ঐতিহ্যকে নিয়ে বহমানা এক চিরকালিনীর জীবনধারা। সেই বাংলার মাটি মাঠ আর আকাশের বর্ণমাধুরীতে এবং দেহগন্ধে বুঁদ হয়ে বসে আছেন কবি। এখানে যেমন জাম বট কাঁঠাল ও হিজলের ছায়া আছে, তেমনি আছে ধূসর বাতাসে শঙ্খের মতো কাঁদা তরুণীর শাদা শাঁখা। ভাঙা ঘাট আর

কলমীর দামে নদীর জলের কান্না যেমন তিনি শুনেছেন, তেমনি গ্রাম বাংলার আবহমান কাল ধরে প্রবাহিত প্রবাদ গল্পের ব্যঞ্জনাকেও অনুভব করেছেন। তাঁর চোখে এক নির্জন রূপকথার জগৎ, যেখানে—

"……নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত……

যেখানে

"…ভিজে পেঁচা শান্তস্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে
শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প—ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে

মানব-কবি জীবনানন্দ

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

বাংলার অন্যতম গৌরব সাহিত্য। তাই বাংলা শুধু সুজলা সুফলা নয়—সুকবি সম্ভবাও। তার গাঙ্গেয় অববাহিকার জরায়ুতে অকৃত্রিম ও অমর কাব্যের বীজ—চর্যাপদের সেই প্রাথমিক সৃষ্টি থেকে অধুনার জীবনানন্দ এবং তার পরবর্তী পর্যন্ত। বাংলার তাই এত সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

সেই সংস্কৃতির ঐতিহ্যরূপ একটি ধারা জীবনানন্দ। মধ্য এশিয়ার মধ্য থেকে ছুটে আসা আর্য সভ্যতার কালক্রমিক উত্তরসূরী বাংলার সাহিত্যবোধের নাব্য পলিমাটিতে রস-পরিপুষ্ট নূতনতম এক বোধিক্রম। ফলশ্রুতির ফলভারে গৌরবান্বিত। তাই তাঁকে স্মরণেও মর্যাদা।

তিনি একটি আলাদা স্বাদ, পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর নবতম প্রতীকে ও টেক্‌নিকে নূতন ভাব এবং বাণীর গ্রন্থনা। চর্বিত চর্বণের অভ্যাসত্যাগী তিনি সেই সুদুর্লভ কবি, যাঁদের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে সীমিত; রবীন্দ্রোত্তর যুগের সুযোগ্য উত্তরসূরী। জীবনবোধের অভিভাষে উদ্ভাসিত বৈভবী। সাম্প্রতিক কাব্য-মণ্ডলে বলিষ্ঠ এক সংযোজন।

তাঁর কাব্যের বাহ্যিক সুর মূলত মিশ্র। কোথাও প্রকৃতি-প্রধান, কোনোখানে ইতিহাসে উজ্জ্বল, সমাজচেতনার স্পষ্ট প্রতিভাষ কোথাও, মনস্তাত্ত্বিকের কৃতিত্বময় মনোবিশ্লেষণে কোনখানে চূড়ান্ত পারদর্শিতা; আবার অবচেতনার আচ্ছাদনে প্রাথমিক দৃষ্টিতে তাই মনে হয় মাঝে মাঝে বিস্ময়কর; হামাগুড়ি; সুর-রিয়্যালিস্টও এবং প্রতীকি। অথচ প্রতিটি কবিতার অন্তর্জগতে ও আন্তর ভাষ্যে তিনি ভাবুক, প্রেমিক এবং একই চিন্তার সৎ "জীবন" দার্শনিক; প্রচুর দ্যোতনা, বোধ, বেগ ও স্বচ্ছতা। খণ্ডভাবে তাই তাঁর বিচার বিচারের মারাত্মক বিচ্যুতি, সামগ্রিকভাবে তাঁকে চিনতে হবে যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ তিনি কবি; আক্ষরিক অর্থে নয়, ভাবার্থেও।

তিনি ভারত আত্ম-বোধের উদ্‌গাতা পাশ্চাত্য দর্শনের পরিমিত উপলব্ধিসহ। তাই প্রাচ্যের কালিদাস অথবা শঙ্করাচার্য বা মিলারেপা কিংবা কন্‌ফুসিয়াস অথবা পাশ্চাত্যের র‍্যাঁবোর মতো কোনো বিশেষ আন্দোলনের নেতা বা জনক না হয়েও তাঁর কালের রবীন্দ্র ও নজরুল প্রভাবাধীন বাংলার ডগমগে সাহিত্যের

পরিমণ্ডলেও ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন, ভারতীয় ছন্দক্রমের কোলে প্রতীচ্যের ছান্দ্যবোধ, এতদ্দেশীয় ভাষা-বিন্যাস, উপমা প্রয়োগ, অলংকরণ ইত্যাদির মোড়কে ইউরোপীয় ঐসব বস্তুর প্রয়োজনীয় পরিমিত সার-মিশ্রণে এক 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র চমকানি তিনি। ভাবের ঘরের বনিয়াদেও তাই দূর প্রসারী সুদূরতা। তাই তাঁর স্মরণ আজ যুগোপযোগী। যুগবিধৃত রুচির দরবারে ১৯৭০-এ যদিও বড় হাহাকার তবু তাঁকে শ্রদ্ধাবনত স্বীকারে আছে সাংস্কৃতিক উত্তরণ।

গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ hungry যুগের angry poet-এর বিতর্কিত ভূমিকা প্রভৃতি কোনো'টাই তিনি নন। তবু জীবকোষী মানুষের মন-কোষী হওয়ার পরমাসম্পদ তিনি আহরণ করে বিতরণ করে গেছেন তাঁর সাহিত্যের বদান্যতায়।

বলে গেছেন—"আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর

যদিও অনেক মৃত্যু পরম্পরা ছিল ইতিহাসে।"

ভারতীয় আনন্দধর্মী মার্গ চিন্তার কেন্দ্রিক কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসা দার্শনিক অভিভাষ।

"শাশ্বত রাত্রির মধ্যে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"র প্রতিবিধান ও সেই সাধনার সূত্র ধরিয়ে দিতে অগ্রসর। সেখানে বিষাদহীন সর্ব্বানন্দ। বিবর্তনবাদের বস্তুনির্ভর নৈষ্ঠিক অর্চনা। "নাশী বিষেভ্যাঃঅপি তথা বিভেমি নৈরাশনিভ্যোঃ গগনাচ্চ্যুতেভ্যঃ। ন পাবকেভ্যোঃ অনিল সংহিতেভ্যো যথা ভয়ংমে বিষয়েভ্যঃ এভ্যঃ॥" (বুদ্ধ) সেখানে অনুপস্থিত। দুঃখের বিন্দুতে সৃষ্টির সিন্ধু দেখার শূন্যবাদী দর্শন তাঁর নয়। অথবা শঙ্করাচার্যের মায়ার শৃঙ্খল। তিনি 'সত্যবাদী'। নিখাদ সত্য। তাই ডিভাইনিয়া কমেডিয়ার দান্তের রোদন—

"In this midway of this our mortal life
I found me in a gloomy wood, astray
gone from the path direct ···
That forest, how robust and rough its growth
Which to remember only, my dismay
Revews, in bitterness not far from the Death···"কে-ও

তিনি অগ্রাহ্য করেছেন—"নিবিড় নাবিক হলে ভালো হয়;

হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয়"···র

ঘোষণায়। সেখানে "যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে,

নদী ও নগরীর

মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত।"

তাই "আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর।"

বড্ড কাছের মানুষের ভাষা। একেবারে অন্তরের প্রিয়জনের প্রত্যাশা। তাই তাঁর—

"ভয় পেয়েছি

পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা ··

আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় বেদনায় আক্রোশে ভরে গেছে";—কে তাঁর আত্মচৈতন্যের শেষ কথা বলে মনে হয় না। অথবা সম্পূর্ণ অন্তর্ধর্মী চিন্তার চয়ন "সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে" হয়ে ওঠে বাস্তব-যন্ত্রণায় বিব্রত মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমন্বিত তাঁর মানবিক হৃদয়ের ক্ষণিক বিরক্তি। 'ফ্যালাসি'র গর্ভে নয়; ফিলসফির চূড়ান্ত থেকে বাস্তব জগতের ক্লেদকেই শাসন করতেই তিনি কঠোর উপহাসের চাবুক হাঁকিয়ে দেন,

"আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,

অন্ধকারে স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর···"

ওটা উপহাস যদি না হত তবে দুঃখের আঘাতে আহত বিবেকী হয়ে মাটির কবরে শুনতেন চিরন্তন "মৃত্যু আজ নারী-নর্দমার কাথে" সৃষ্টি মুখরিত হতেন না জীবন চেতনার গানে—

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে;

পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;

পৃথিবীর সব প্রেম...

শান্তি হ'য়ে আকাশে আকাশে।"

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীঃস্বরূপেম যতঃস্থিতাসি।" আর কি চাই? এতেই তো সব, অনন্ত উৎসব। অতএব অন্ধকারে স্তনগত ও যোনিগত সুপ্তির পার্থিব মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়েও তদোর্ধ্বিত স্বাদের প্রবক্তা তিনি; বিতর্কিত ফ্রয়েডীয় দর্শনের বশ্যতা-বন্দী প্রগল্‌ভ আলাপচারী নন। পরমা অনুভূতি ও পরমাণুভূতি দুটোই প্রখর। 'জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ' তাই সৃষ্টি হল এবং "বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে চলে যেতে দেখে তবু অবিরল অশান্তির দীপ্তি ভিক্ষা করে" তিনি দাঁড়ালেন সেই "তোমার কাছে"। "তোমার জ্যোতির কাছে।"

এই পার্থিব সত্য বোধই তো তাঁকে এক কথায় নানান জাতের কবির 'category'-তে ফেলে রকমারি প্রদর্শনীর 'সার্কাসটিক' আকর্ষণী না করে বরং আলাদা 'স্বাদের' 'টেক্‌নিক' শব্দবিন্যাস ইত্যাদির 'মিডিয়ামে' বাস্তব নির্ভর মন-জগতের কবি করে তুলেছে। মন যা যুগিয়েছে তাই তিনি করেছেন, হেসেছেন, গেয়েছেন, কেঁদেছেন। আবার কখনও তীব্র ক্ষোভ ও বিরক্তিতে ফেটে পড়েছেন। তারই ভাবানুসারী স্পন্দন উঠেছে ছন্দ-গঠনে ও কল্পিত চিত্রের চিত্রণে মার্কসের "mind is not irrespective of matter, but derived from it" হয়েছে তাঁর ক্ষেত্রে সত্য। Hugh Walpole-এর "Art and life...brought to live together" এবং Bernard Idding Bell-এর "the true goal, the only adequate objective, the devinely destined end for man···is the Art combined with life" হয়েছে অভ্রান্তভাবে প্রযোজ্য তাঁর কাব্যে। তেমনি হাজার বছর আগেকার সেই চর্যাপদের যুগ বা তারও আগের সেই বৈদিক সভ্যতার কাল থেকে অদ্যাবধি প্রমাণিত সত্য "মানুষের স্বভাবেই অলংকার এবং ছন্দের জন্ম" নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যানুশীলনে। মানুষের স্বভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও যুগের প্রভাবে ছন্দ, অলংকার ও শব্দ গ্রন্থনা যে কতখানি উচ্চমানের শিল্পগৌরবে ভূষিত হতে পারে, তারও উদাহরণ অজস্র তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তির মিছিলে। (যথা. 'হেলিট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে', 'স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে' ইত্যাদি)। এমনি ভাবে মনের মালিকানাকে স্বীকৃতি দিয়েই তিনি অভিযান চালিয়েছেন cosmic rythm-এর মধ্যে সেই sublime ereatorকে খুঁজে পেতে যাঁর স্পর্শে—"সৃষ্টির নাড়ীর পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়।

অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ।"

হুইট্‌ম্যানের "Of life immense in passion, pulse and power"-এর ভাবের কাঁধ ছুঁয়ে এ যেন Barneh Spinoza-র Ethics-এর "absolute perfection-এর পথে ছুটে চলা "existence of the Being." তারই জয়যাত্রায় "অমোঘ আমোদ"।

তাঁর জীবিতকালের যুগ ছিল যন্ত্রণামুখর; পরাধীনতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মহামন্বন্তর, স্বাধীনতার পরবর্তী দেশবিভাগজনিত লাঞ্ছনা, বিপর্যয় এবং নব-ভারতের গঠনমূলক অর্থনৈতিক যাত্রাশুরুর প্রথম দশকের দায়, দারিদ্র্য ও বিড়ম্বনা এবং তাঁর সমকালীন কাব্য-সাহিত্যের আবহাওয়ায় ছিল ক্রয়েডীয়

প্রভাব অনেক সময় (সজনীকান্ত দাস যার অকৃপণ তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন)। তাই তাঁর কলমেও "কতশত যোনিচক্র স্মৃতি করেছিল উতলা আমারে", "ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে", "ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে", "মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে", "অন্ধকারে স্তনের মধ্যে যোনির মধ্যে" (এর পাশে মহাকবি কালিদাসের—"ঘূর্ণন মদকল মদিরাক্ষী নীবি মোক্ষ হি মোক্ষ:"-ও অচল) জাতীয় হালকা সস্তা এবং অসুন্দর শব্দ রচনা তথা 'কোথাও শান্তির কথা নেই, তার উদ্দীপ্তিও নেই; 'এখানে পৃথিবী অসমান / আর কোনো প্রতিশ্রুতি।' 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি' 'রিরংসা, অন্যায়; রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়' প্রভৃতি হতাশার প্রতিধ্বনি উঠেছে। অর্থাৎ, একান্ত সত্য বাস্তবের যন্ত্রণা থেকে বস্তুবাদী অনুভূতির লিপি চিত্রণ। এটাই স্বাভাবিক। সংসারের মানুষ হিসাবে ব্যক্তিজীবনে নানান ঝঞ্ঝাট সহ্য করে অস্বাভাবিকতার (বাজে ভৌতিক কল্প-জগৎও অবাস্তব চিত্রের) স্তুতিতে আপন কাব্য-কৃতি ও অন্তরের বোধকে বিকৃত না করে স্থিতবুদ্ধি প্রাজ্ঞের আসন অলংকৃত করে গেছেন—Creative romanticism-এ factual reality-র পরিপ্রেক্ষিতে। এই জন্যই তাঁর বলিষ্ঠতা কাব্যে স্থায়ী। 'মহা ইতিহাস এসে এখনও জানেনি যার মানে" তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাই—Applied philosophy-র dialectical form-এর চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিয়ে matter-এর বনিয়াদগত ও তত্ত্বগত পরিপুষ্টি ও ধারাবাহিক বৃদ্ধি এবং রূপায়ণের মূল্য নির্ণয়ে সংশয়হীন স্তোত্র রচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন:

"সেদিকে যেতেছে লোক···
গ্লানি প্রেম ক্ষয় নিত্য পদচিহ্নের মতো সঙ্গে করে··
নব নব যাত্রীদের সাথে মিশে যায়;
প্রাণলোক যাত্রীদের ভীড়···
মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর"

অনুভূতির ধ্রুপদী প্রকাশ। মানুষের "পটভূমি" সৃষ্টি-তত্ত্বের 'background', "শাশ্বত যাত্রী"রই ভূমিকা তার। তাই 'মৃত্যুহীন, জন্মহীন কুয়াশায় যে ইঙ্গিত ছিল/সেই সব ধীরে ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে পেয়েছিল/এখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে—আলো, জল, আকাশের টানে। খাঁটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্লেষণ। স্থিতির বিরাট শিবিরে বায়োলজি, জিওলজি ইত্যাদির স্বীকৃতসূত্রে। "From the lowest order of life ie., monocellular germs to highest

order in the scale of life, ie., Man"-এ ঐ তত্ত্বর ঝংকার। ডারউইনকে পেরিয়ে বার্নার্ড শ'-র "Process of transformation and modification ...is the resulut of will force." প্রকৃতি থেকে হৃদয়, হৃদয় থেকে প্রকৃতি, অনুপম ভাব-পরিক্রমা; কোনো নীল নূতন সাগরে/ছিলাম, তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে..." তারই প্রকাশ। "বুঝেছি অকূলে জেগে রয় / ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ হৃদয়" হয়ে ওঠে তাই double process of involution and evolution-এর synthetical কেন্দ্রীয় কক্ষ, সব ঘুরে ফিরে তাতেই ঘুরে। (মানবীয় জ্যামিতিক calculation তাই সেখানে বীজগণিতের 'factor'-এর চরিত্রে অভিনয় করে, 'বীজ' হতে পারে না—হয় antithesis.) তাই Antithesis সত্য কিন্তু চূড়ান্ত নয়। বরং চূড়ান্তকে প্রাপ্তির পথে তার ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসবাদী বক্তব্য অনেকের কাছে বিতর্কিত। তার তাড়নায় virus নড়ে, তার (antithesis-এর) এই ভূমিকাটুকু ছুঁয়ে বলা যায় cell সহ protein particles-এর খোল ভেঙে alpumen partid-বেরনতে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সমুজ্জল সে কিন্তু সেখান থেকে life-এর matter এ spontaneons jump-এর পরের সৃষ্ট বস্তুটা synthesis, পুরুষ আর নারীর দেহগত আদান-প্রদান antithiesis-এর তত্ত্ব (...উভয়ের জৈবিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া) কিন্তু পরের পর্যায়ের সৃষ্টিটা synthesisl নয়? তা নইলে Eve-এর "I nourished an egg in my body"তে (G. B. S.—Back to Mettusellah) পরম-অণুর (হিন্দু দর্শনে ব্রহ্মময় অণু?) প্রকাশ হয় কি করে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য?

তাইতো সেই ডিম্ব থেকে শব্দ—কবির ভাষায়—

"জরায়ুর ডিম্বে তার জন্মিয়াছে যে ঈপ্সিত বাঞ্ছিত সন্তান।" সেই সন্তান তাঁর অনুভূতির নিবিড়তম প্রকোষ্ঠের উৎস্রাবী বিশ্লেষণে এগোয়।

"তার তরে কালে কালে পেতেছে সে শৈবাল বিছানা শাল তমালের ছায়া এনেছে সব নব নব ঋতুরাজ..." এবং সেইজন্যই আদিমা প্রকৃতির অবস্থা—

"মৃত্যুর অঙ্গার মথি স্তন...ভিজে রসে উঠিয়াছে ভরি—"

সুতরাং প্রকৃতি ঠাকুরাণীর নারী ভূমিকা কবির পুরুষ ভূমিকার সঙ্গে হাতে হাত রেখে চলে অনুভূতির সমধর্মিতায়। আসেন "বনলতা সেন"।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের চশমার মধ্য দিয়ে দেখা ইন্দ্রিয়োত্তর পরমাশ্বত্থা অথচ বাস্তব। মেঘদূতে কালিদাসের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের অবিকল উপস্থিতি এখানে আবার ইতিহাস সচেতন অনুভবী মন। "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার

নিশা," মেঘদূতের যক্ষের মনের আকুলি যেন ; মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; ইতিহাস সচেতন উপমা। আবার চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন / আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল···বনলতা সেন" বৈষ্ণব রস-সাহিত্যের বিমুগ্ধা রাধা ও কৃষ্ণর (অদেহী প্রেম) আকর্ষণ ও অনুভূতির ভিত্তিতে দৃঢ় চিরায়ত শান্তির গান, ভারতীয় দর্শনবোধ। আবার 'অতি পুরাতনকে অতি নূতনের' মেক্‌আপ ও ঢঙে একেবারে 'কামাল' করে এনে ফেললেন এই কবিতাতে বহুস্থানে। তৎসহ cosmic rhythm-এর স্বভাব আক্ষরিক রূপে 'God is in facts' (J. Lawhan) থেকে "facts of supreme sound is as true as the architecture of the world"-কে যেন আবিষ্কার করে হাঁকিয়ে দিলেন,—তিনি 'theatre of absurd'-এর শিল্পী নন ; "শিশিরের শব্দের মতন" এর শব্দ অনুধাবন করা কবি (তিব্বতীয় কবি ঋষি মিলারেপার সমগোত্রীয় যিনি নৈঃশব্দের শব্দ শুনতেন) যাতে নিঃশব্দে ব্রহ্ম-স্পন্দন দুর্নিবার ও অনিবার। এবং romantic realism-এর পূজারী—তাই "পাখির নীড়ের মতো চোখে"র চর্চায় নারীর বাস্তব মূল্য, মর্যাদা ও প্রয়োজন বুঝিয়ে দেন অথচ রোমান্টিকতায় পিছু হাঁটেন না (কালিদাসও এমন উপমায় অভ্যস্ত ছিলেন না)। অতএব "শাশ্বত রাত্রির মধ্যে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়" থেকে যাইহরিণীর ডাকে মানুষের ভাষা শোনা-তে' এবং "বনলতা সেন-এ" creative romanticism স্পর্শ ; যার আর এক নাম revolutionary romanticism (বিপ্লব মানে ধ্বংস নয়, ত্বরান্বিত করার শক্তি) যাতে দুদণ্ড শান্তির প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যয়। গোর্কীর সৃজনধর্মী অগ্রগামী মনেরই স্বধর্ম।

"মানুষেরা বার বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে
নব নব ইতিহাস সৈকতে ভিড়েছে···
নচিকেতা, জরাথুষ্ট্র, লাওৎ-সে, এঞ্জেলো, রুশো
লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে।"

তাঁর একান্ত প্রগতিধর্মী বিশ্লেষণ। তাই তো তাঁর কাছে 'কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নাই।' অর্থাৎ বাস্তব-সমর্থিত বৈপ্লবিক রোমান্টিকতায় সৃষ্টিধর্মী উত্তরণ। গতির পথে পথে বাধাকে পেরিয়ে প্রগতি। Antithesis-এর সূত্র ধরে বেরিয়ে আসা 'সূর্যালোক' ; (অ-মার্কসীয় মতে) শেষ পর্যন্ত 'synthesis' 'নব নব মৃত্যু শব্দ, রক্ত শব্দ, জয় করে মানুষের চেতনার দিন' চলে এগিয়ে।

এগোবেই, নচেৎ 'পূর্ণ' হয়ে গেলেই সে সমাপ্ত। তাই পূর্ণতার চিহ্ন আজও তার দৃষ্টির বাইরে। cosmic rythm থেকে নেমে এসে নব নব পদার্থিক রূপ পরিগ্রহ করে সে নূতন নূতন modified form-এ এগোচ্ছে। কত এগোবে আরও কে জানে। পাঁচ মিলিয়ন বৎসর পরে grand giant হয়ে কিছু পরে সূর্য যখন নিজেও ফুরোবে এই পৃথিবীকেও শেষ করে দেবে (বিজ্ঞান যার চিন্তায় বর্তমান থেকে ব্যস্ত) তখন "জীবন" মূলধনে বেঁচে থাকা মানুষ কতখানি পূর্ণতা ও শুদ্ধতা পাবে এবং অন্যগ্রহে বাসস্থান সরিয়ে নিয়ে বাঁচতে পারবে কি না কে জানে। যদি পারেন তবু তার বিবর্তনধর্মী রূপান্তরের শেষ হবে না। হবার নয়। রূপান্তর হওয়া পদার্থের চরিত্র। নচেৎ সে হয়ে যেত অ-পদার্থ। পরিবর্তন নেই শুধু সেই 'শক্তি'র (force) যার কেন্দ্রীয় কক্ষ থেকে বি-কেন্দ্রীক ছুটে আসা তরঙ্গ-বিভঙ্গেরই material translation এই চরাচর, ঐ সূর্য—সব। তার বিরাট শক্তি প্রবাহের সামান্য একটি ধারা সরে গেলেই সূর্য নিষ্প্রভ।
সুতরাং 'theatre of absurd' নয় কবি চিন্তার 'অগ্রসর সূর্যালোক', বিরাট তত্ত্ব ও তথ্যের বিভায় উদ্দীপ্ত।
তিনি বস্তুর জগতের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ নিয়ে মহাজাগতিক কল্পনায় সমৃদ্ধ একান্ত মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্বে বড় কথা সেইটে। সুনিবিড় উদ্বোধনে দর্শন তাই—

"আছে, আছে, আছে এই বোধের ভিতর
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের হৃদয় ;
জয় অস্ত সূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।"

সেই ঘোষণার দৃঢ় বনিয়াদ তাঁর নামের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে,

His "will rolled onward
by the love inspelled,
That moves the sun in Heaven and all
the stars" (Dante).

জীবনানন্দের বোধ : একটি দিক

শ্যামল বসু

কবিতা আর তার পাঠক এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করা দুরূহ। কাব্যের শরীর থেকে গন্ধ, স্বাদ পেতে জিব ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলো পর্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে। লোকপ্রিয়তা কাব্য এবং কবিকে মূল্য নিশ্চয় দেয়, কিন্তু কাব্য পাঠকের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা বোধহয় কিছুমাত্র মূল্যের দাবি করতে পারে। জীবনানন্দ লোকপ্রিয় অবশ্যই সেই সঙ্গে আমার মতো কিছু পাঠকের কাছে ঘনিষ্ঠ সহচরও হয়ে উঠেছেন। আলংকারিক ব্যাখ্যায় যার কোনো সূত্র সন্ধান আমি করে উঠতে চেষ্টা করেও পাই নি। তর্ক, ধী, মনন, ইত্যাদি জাত কোনো যুক্তিও কোনো তীরের সন্ধান আমাকে দিতে পারে নি। আনন্দমগ্নতার মধ্যে মৃত্যু অথবা শোক, নিসর্গচেতনার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি তথা স্বদেশপ্রেম কিংবা সোঁদা মাটির গন্ধ আমার ঘ্রাণশক্তিকে কুতূহলী করে, কিন্তু ওই অবধি, তার বেশী দেখতে যেতে আমার ইচ্ছেও করে নি এবং আমি প্রস্তুতও নই। জীবনানন্দ দাশ আমার কাব্যপাঠক মনের একটি ভাল-লাগা নাম। ভাল-লাগা বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চিকিৎসা কিংবা অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োজন, আমি অনুভবই করি নি কেননা এতে আমার ভাল-লাগার অস্থি দর্শনে ব্যথিত হবো। 'আঙুলে আঙুল মিলিয়ে সহজ মিল' নাকি কোনো কবিই মেলাতে পারে না। হয়তো বা তাই। তবুও তার অনেকটা কাছে যাওয়ার ক্ষমতা কারও কারও অবশ্যই আছে, এবং জীবনানন্দ পাঠক তার স্বাদ প্রায়শই পেতে পারেন। সামান্য ইতস্তত বিচরণ যদি সম্ভব করেন তাঁর কবিতার ভূমিতে। জীবনানন্দ দাশের কবিতার ওপর লিখিত তথ্যের অনুসন্ধানে প্রথম যে সুর দর্শন সম্ভব তা কবি মানসিকতা। যা কল্পনানির্ভর। এ কল্পনা লিখিত মনের। অলস মনের ভাববিলাসে সদাচঞ্চল কল্পনা নয়। এই কল্পনা শুরু এবং গতির সীমানির্ধারণ উভয় ক্ষেত্রেই সমান পারদর্শী। এই কল্পনা-চারণে মমত্ববোধ সীমিত এবং বিবেচনাও যথেষ্ট। এই সীমা ও বিবেচনা অবশ্যই শিল্পনির্ভর। জীবনানন্দের কাব্যাবলীতে বক্তব্য এসেছে অনুভূতির অভিজ্ঞতায়। আর তার কাব্যপাঠক সেই অনুভবকে পরিচিত জ্ঞান করলে কিন্তু পুরো স্বাদটা পান কবিতায়।

অন্ধকার আর মৃত্যুচেতনা কবির নিজস্ব ভঙ্গিমায় দেখা। যে একক দেখা আমার মতো কাব্য পাঠকের অনুভবের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে ওঠে কিন্তু কবিতা-পাঠ পূর্বে এর যে কোনো প্রকাশ থাকতে পারে তা বোধহয় অজ্ঞাত ছিল। অন্ধকার কবির বিলাস নয় প্রয়োজনের অন্যতম অবলম্বন। তাকে ঘিরে, বিশ্লেষণ করে, সঙ্গ উপলব্ধির উষ্ণতায় কবি সহজ সজাগ করে নিয়েছেন। গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে জেগে ওঠা সত্তা প্রকৃতিকে দেখেছেন। দেখেছেন পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর দিক থেকে ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে কীর্তিনাশার দিকে। কিন্তু কবির মগ্নতা ঐ অন্ধকারেই। মানুষিক সৈনিক সেজে সূর্যের রৌদ্রচক্রান্ত হতে তিনি চান না। কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদ উৎসব তাঁর কাছে কাম্য নয়। তিনি মগ্ন প্রশান্ত বিষাদের অন্ধকার বুকে ঘুমিয়ে থাকতে চেয়েছেন একাত্ম হয়ে মিলে থাকতে চেয়েছেন অন্ধকারের স্তনে, অন্ধকারের যোনিতে অনন্ত মৃত্যুর মতো। এই অন্ধকারের আকুতি কবি আত্মার আত্মগোপনের চেষ্টা বলে ভাবলে ভুল করা হবে। এই অনুভূতি আলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের গল্পও নয়, ভাবি কথক কবির তৃপ্তির কামনা। নিরন্তর কার্যরত নাগরিকের স্ব-উপলব্ধির বাসর-সন্ধান। যে আলোর বোধ ছিল মুক্ত, সে আলোর কবি পেলেন বন্দীদশা। ব্যাখ্যাটা বেশী দূর না নিয়ে গিয়ে আটপৌরে হয়ে যাওয়া বোধ থেকে তিনি মুক্তি পেলেন অন্ধকারের পা ঘেঁষেই। এই বোধ, এই অনুভব আমার মতন হাজারো কাব্য পাঠকের। কিন্তু তার বাস্তব রূপ বা কোনো প্রকার সীমা যা দিতে আমরা পারি নি, তার একটা ছবি আমাদের সামনে রাখলেন জীবনানন্দ। বাসরের পটভূমিতে অন্ধকারকে যদি স্বীকার করা যায় তবে আমরা দেখব একদিকে আছে কবির প্রেম, অন্যদিকে মৃত্যু। সন্ধ্যার অন্ধকারের মগ্নতায় রসার্থতীর্থের পথিককে চিনে নিতে ভুল হয় না। অতৃপ্ত যাতে তৃপ্তির সন্ধানরত আমরা। এ পাথর ও পাথর তুলে দেখি পরশপাথর মেলে কি না? জ্ঞানবৃক্ষের ওষধি ভক্ষণে আমাদের পূর্বসূরীর পাপখণ্ডন তার উদ্গারণের মধ্যে দিয়ে। কর্ম ভিন্ন হলেও মানুষ তার মধ্যে দিয়েই সাময়িক এবং দীর্ঘকালিক তৃপ্তির অন্বেষণ করে। দিনান্তে সীমার মধ্যে দেখা অসীমের কল্পনাকে শ্রদ্ধা জানায়—নিজের যাত্রার নির্দেশ স্থিরীকৃত করে। মগ্নতায় আক্রান্ত কবি জীবনানন্দের হাজার বছরের পথ হাঁটা স্মৃতি ইতিহাস থেকে আধুনিকের কাছ অবধি। প্রকৃতির মধ্যে দিয়েই শ্রান্ত ক্লান্ত এবং একই সঙ্গে প্রসন্ন কবি মন আশ্রয় পাবার সন্ধানে রত। অন্ধকারের মধ্যে কবি শোনেন 'এতদিন কোথায় ছিলেন'? নিঃসঙ্গতার উপলব্ধির কণ্ঠে নিয়ে কবির বনলতা

সেন এই অন্ধকারেরই মুখোমুখি থাকেন—যখন সব পাখি ঘরে ফিরে গিয়েছে—সব নদীরা ক্লান্তির মগ্নতায় শ্রান্ত।

আমি আগেই বলেছি জীবনানন্দের কবিতার বক্তব্য তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা-জাত কিন্তু রোমান্টিক চিন্তার আশ্রয়ও আছে। কবির উপলব্ধিতে স্বীকারোক্তি আছে 'শ্যামলী' কবিতায়—অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়। কিন্তু প্রেরণা এমন কল্পনা ও সীমা-সচেতন কল্পনাকে নিয়ে অহরহ খেলা করতে পারে কি? প্রেরণা কথাটা দিয়ে কিন্তু সেটি বিচার্য নয়। তাঁর সীমা ও বিবেচনা সচেতনতা আমরা পাই চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে। প্রসঙ্গটা উদাহরণের সাহায্যে আমি বোধহয় আরও পরিষ্কার করতে পারব।

সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হতে খুঁজেছি তোমারে সেইখানে
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে···
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

(শঙ্খমালা / মহাপৃথিবী)

কিংবা,

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না পৃথিবীর সমস্ত ধূসরপ্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশিরে ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা;

জ্যোৎস্না রাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের উপর চিতার উজ্জ্বল চামড়া
পালের মতো জলজল করছিল বিশাল আকাশ
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল। (হাওয়ার রাত/মহাপৃথিবী)

অন্ধকার কখনো রাত্রি, কখনো ধূসরতা, কখনো কুয়াশাকীর্ণ অঘ্রানের সন্ধ্যা তারই মধ্যে জীবনানন্দের পরিচলন। নীরবতা আত্মমগ্নতা এবং বিষণ্ণতার মধ্যে দিয়েই কবিমানস দিক নির্দেশ ও সন্ধানপ্রয়াসী। প্রেম তার কাছে নক্ষত্রের মতন, তাকেও মরে যেতে হয়, মুছে যেতে হয়। গোধূলির আসন্ন অন্ধকারে হলুদ রঙের শাড়ীতে চোরকাঁটা। চারিদিকে শূন্যতা নিয়ে তবুও প্রেমিক প্রেমিকা কাছে আসে বসে অঘ্রানের কুয়াশার ঘাসে হাজারো বছরের হতাশার বিরামের আশ্বাস খোঁজে এই অন্ধকারে—প্রেমিকের মনে হ'লো—

"এই নারী অপরূপ খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে ;
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর—জনিত বাসনা নিজে—বাসবার মতো ভালবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতের তার।"

(দুজন/বনলতা সেন)

স্বপ্নের ধ্বনিতে যে স্থবিরতার অন্বেষণ যে স্থবিরতায় দিনের আলো ও স্থির হয়ে যাবে। সে স্থবিরতা কি ? হাজার পথের অন্বেষণ ক্লান্ত মগ্নতায় চৈতন্যের প্রাপ্তিতে কি ?—এ প্রশ্নের উত্তর পাই না। শুধু পাই—

…'বেবিলনে একা-একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন, আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর '

(পথ হাঁটা/বনলতা সেন)

এ ত্রস্ত সন্ধানের মধ্যে আনন্দমগ্নতাও অপরিসীম। 'সুন্দর' অবয়ব নির্দেশের বেলা অতিক্রমের সামান্য ইঙ্গিত যে একেবারে নেই তা বলতে বাধে। হাজার বছর শুধু খেলা করে ; কেবল জোনাকির মতো অন্ধকারে বিচরণ। বালির উপর যদি জ্যোৎস্না নামে কবি জীবনানন্দ তখন শুনতে পান—

·· ঘুচে গেছে জীবনের সব লেন দেন ;
'মনে আছে' ? শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন' ?

(হাজার বছর শুধু খেলা করে/মহাপৃথিবী)

এতক্ষণে একটা অবয়ব ধরা যেতে বসেছে। মগ্নপ্রশান্তির মধ্যে জীবনানন্দের স্ব-স্বাদিত পরিসর আমাদের কাছে অনেকটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে রোমান্টিক কবির বনলতার সন্ধান প্রয়াস যদি ক্রমাগত তাঁকে ধূসর থেকে ধূসরতর পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

অন্বেষণ ক্লান্ত ভাবী কথক উপলব্ধিকে বার বার আঘাত করেন মৃত্যু শব্দ দিয়েও। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে তিনি নৈরাশ্যবাদী নন। তাঁর কাব্য ভাবনা ও ব্যক্তিসত্তায় আসার গল্পও একেবারে অপরিচিত নয়। বিশ্লেষণ অনুভব প্রয়াস তাঁর ধূসর পাণ্ডুলিপি কবিতার বিশেষ চরিত্র। মৃত্যু প্রিয়ারে নামে পরিণীত। উত্তরণের আয়াস সিদ্ধ একটি কল্পনা। সারারাত হেঁটে গিয়ে নক্ষত্র নির্দেশ ও কবি কাম্যকে কবির কাছে দেয় কি দেয় না। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে দিয়ে ধূসর মগ্নতায় নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেন তিনি। যেখানে মৃত্যু আছে, নক্ষত্র আছে, পেঁচা আছে, জ্যোৎস্না আছে, পাহাড় আছে, আর আছে শান্ত নম্রবোধ নদীরা। এই উপাদানগুলি একই সঙ্গে কবির ধূসরতায়

মগ্ন চৈতন্য অনুসন্ধানকে যেমন সাহায্য করে, তেমনই তাকে ক্রমশই 'গভীরে গভীরে' টেনে নিয়ে যায়।

রূপসী বাংলায় জীবনানন্দের চরিত্র আরো স্পষ্ট। জীবনানন্দের ব্যক্তিগত অভ্যাসের মধ্যে ছিল একই কবিতা বারংবার করে মাজা ঘষা করা। যুক্তি-বোধ দিয়ে প্রাথমিক আবেগকে নিরসন করে শিল্পময় করে তুলতেন তিনি। একথা তাঁর কবিতা ঘনিষ্ঠেরা বলে থাকেন। নিছক জাতীয়তাবোধ বা স্বাদেশিক উপলব্ধি থেকে কবিতাগুলির জন্ম হয়। ত্রিশের কালে তাবৎ বাংলা দেশ জুড়ে যে জনজাগরণের কল্লোল ছিল যেমন, সদ্য সমাপ্ত প্রায় অসহযোগ আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ইত্যাদির কালে বসে কবিমন বরিশালে বিশেষ করে প্রকৃতি কেবল পূর্ববাংলায় বসে সামান্য প্রভাবিত হবে না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু রূপসী বাংলার কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে একই চিন্তা ভাবনার রকমফের অবশ্যই লক্ষণীয়। কবিচেতনা বিশ্লেষণে এ কথাও স্বীকার্য যে অমন রোমান্টিকতার আসল কবিতাগুলি কবি জীবনানন্দের স্ব-আস্বাদনেরই গল্প।

পরিশেষে আসল কথাটা একবার উল্লেখের প্রয়োজন অনুভব করি। কবি জীবনানন্দ মানুষ জীবনানন্দের সত্তাকে তাঁর কোনো সৃষ্টিরই ক্ষেত্রে অস্বীকার করেন নি। দুর্নিবার কামনার মধ্যে তিনি যা খুঁজেছেন, তাঁর দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যেখানে তিনি তৃপ্তি পাবেন বলে আশা করেছেন, যে জায়গারই অভিজ্ঞতাজাত সব কবিতাগুলিই একটিমাত্র কবিতা।

জীবনানন্দ দাশ

রঞ্জিৎ সিংহ

জনপ্রিয়তা সম্পর্কে এলিয়টের বিখ্যাত উক্তি যাঁদের জানা আছে, জনপ্রিয় কবিকে বঙ্কিম কটাক্ষে না দেখে তাঁদের উপায় নেই। কারণ সৎকবির মতো সংপাঠকও হামেশা জন্মগ্রহণ করেন না। বস্তুত, পাঠক অনটনের এই দারুণ সমস্যা মেটানোর জন্য পাউণ্ডকে একদা কোমর বাঁধতে হয়েছিল। তাঁর নানা প্রস্তাবের মধ্যে যেটি আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে স্মরণ্য, তা হচ্ছে, কবিতার বিচারে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থক ও তথাকথিত মতামতের কোনো দাম নেই। সমালোচনার ভ্রান্তিকর পরিভাষার অলিতে গলিতে ঘুরে না বেড়িয়ে স্পষ্টভাবে যিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে পারেন কাব্য-বিবেচকের উপাধি তাঁরই সাজে।

অবশ্য জীবনানন্দের কবিতার বিচারে পাউণ্ডের উক্তির উপযুক্ততা কোথায় সে-সম্পর্কে তিনিই সন্দিগ্ধ হবেন—এ যাবৎ জীবনানন্দের উপর যে-সব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, সে-ব্যাপারে যিনি সম্পূর্ণ সজাগ নন। অবশ্য বর্তমান লেখক একথাও কখনোই মনে করে না যে এই লেখা পাউণ্ড-উক্ত সেই কাব্য-বিবেচনার সাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুত, জীবনানন্দ সম্পর্কে এত বেশী কথাবার্তা কানে এসেছে, কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আসনটি চিনে নেওয়া যে-কোনো আলোচকের পক্ষে দুরূহ কাজ।

কারণ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' যখন ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র-তখন সূর্যাবর্তের অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বান্তঃকরণ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত। অবশ্য মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে যাঁর সাক্ষাৎ তাঁদের মিলল, তিনি রবীন্দ্রনাথ। অন্যপ্রান্তে সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী তাঁদের কাব্যান্দোলন সবে শুরু করেছেন। যতীন্দ্রনাথের মরুভূমির উষরতা, নজরুলের ভাঙনের গান বা প্রেমেন্দ্রের অ্যামিবা বা ইলেকট্রন ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাৎকালিক কাব্য-প্রসঙ্গের প্রথাবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু ধারণা ও ধৃতির অমোঘ যোগফল যেহেতু ভালো কবিতা জন্মগ্রহণের শুভমুহূর্ত তাই এঁরা বুঝতে পারেন নি যে শুধু প্রসঙ্গের পরিবর্তনেই ভালো কবিতার সন্ধান মেলে না। এবং বাংলা কবিতায় রোম্যান্টিকস্ ও নব্য-

ক্লাসিক্যালদের মধ্যবর্তী কবি হিসেবে জীবনানন্দের স্থাননির্ণয় করতে গিয়ে যাঁর নাম আমার মনে পড়ে, তিনি মার্কিন প্রতীকী কবি এড্‌গার অ্যালেন পো অবশ্য কাব্যাত্মার মিল খুঁজে পেয়ে জীবনানন্দ প্রসঙ্গে যে পো'র নাম স্মরণ করি নি, বিবেকী পাঠক অন্তত তা উপলব্ধি করবেন। ও ধরনের তুলনা বা বিভাগ কল্পনার জন্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকারা নিযুক্ত আছেন।

যুগসন্ধির কবি হ'লেও এড্‌গার অ্যালেন পো'র কবিপ্রতিভা অবিসংবাদিত। পক্ষান্তরে জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রগতিশীল ভক্ত জুটিয়েছিলেন এবং লোক পরম্পরায় শুনেছি, রক্ষণশীল মোহিতলালের পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও তিনি নাকি বঞ্চিত হন নি। সজনীকান্ত দাশ তাঁর নামকে বিকৃত ক'রে গিয়েছেন। সমসাময়িক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব এবং সাম্প্রতিক অধিকাংশ জীবনানন্দের গুণমুগ্ধ। অধিকন্তু, সিগনেট প্রকাশিত জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' প্রবন্ধ গ্রন্থ তাঁর আত্মসৃষ্টির যে গদ্য সমর্থন—শুধু একথা বললে নিশ্চয়ই এই মৃত কবির প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ তাতে এমন সব মতামতও স্থান পেয়েছে, যা কেবল প্রমাণ করে যে ভাগ্যদেবী চিরকালই পরিহাস-নিপুণা। আসলে 'প্রেরণা', 'স্বভাবকবিত্ব' ইত্যাদি শব্দ শেষ পর্যন্ত ধোপে টেঁকে নি। কারণ, আবেগের মুণ্ডপাত ক'রে একটানা লিখে যাওয়ার কৃতিত্ব সম্পর্কে জনসাধারণ যে-জনশ্রুতিরই আশ্রয় নিক না কেন, সৎকবিমাত্রেই জানেন যে কবিতা বহু সংস্কারের ফলশ্রুতি, কলাকৌশলের অভিনবত্ব বহু পরিশ্রমের পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনে তাঁর পাণ্ডুলিপির যে আলোক-চিত্র মুদ্রিত হয়েছে তা কিন্তু প্রমাণ করে যে প্রেরণা, আবেগ ইত্যাদি শব্দ তাঁর অভ্যস্ত চৈতন্যের প্রাপ্তি, সমালোচনা-সাহিত্যের বহু-ব্যবহৃত তথা পূর্বপুরুষপ্রদত্ত শব্দাবলী। আসলে ও সব শব্দের প্রয়োগের পিছনে কতখানি চিন্তা যুক্ত আছে তা খতিয়ে দেখবার এই পরিশ্রমবিমুখতা অবশ্য আমাকে সাহিত্যবিবেচক সম্পর্কে পাউণ্ডের বিখ্যাত উক্তিকেই মনে করিয়ে দেয়। যাই হোক 'কবিতার কথা' থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যস্বভাবে আত্মস্থতার অনুপস্থিতি জীবনানন্দকে পীড়িত করেছিল। এবং জনপ্রিয়তার নিরন্তর করতালির মধ্যে এ যাবৎ অবশ্য লক্ষ্য করা আমাদের সম্ভব হয় নি যে সেই দুর্লভ আত্মস্থতা তাঁর কবিতায় কতখানি বজায় থেকেছে, তবু এ কথা সত্য যে 'জনপ্রিয়তা' শব্দে ধার না থাকলেও ভার আছে। কিন্তু জনপ্রিয়তায় কর্ণপাত ক'রে কবিতা রচনার ব্যাপারে যে-কবি পূর্বপরিকল্পনার আশ্রয় নেন,

তিনি যে চিরকালের জন্ম পথে বসেন, সে-ধারণায় বিবেচকেরা দ্বিমত নন। যুগসন্ধির কবিদের কাছে পাঠকের কি অভিপ্রেত—তার অনুসন্ধানে বসলে ইংরেজী কবিতায় দেখি হপকিন্স ও পাউণ্ডের চেয়ে এলিয়টের কবিতা নিঃসন্দেহে অনেক পরিণত, এমন কি অডেনের কবিতাও। এবং এই ঘটনা শুধু এই প্রমাণ করে যে উত্তরসূরীর কৃতিত্বে পূর্বসূরীর স্থায়িত্বই পাকাপাকি হয়। বস্তুত, যুগসন্ধির যিনি কবি তাঁর দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ—এই সব তুলনার দ্বারা আমি সেই কথাই বলতে চেষ্টা করছি। কারণ, ভিক্টোরীয় কবিদের প্রথানুমোদিত ছন্দে হপকিন্স যে-আস্থা খুইয়েছিলেন তার প্রধান কারণ এই নয় যে সেকালে ঐ ছন্দের কোনো আকর্ষণ ছিল না। আসলে ছন্দের বিধিনিষেধকে বিচলিত ক'রে দিয়ে হপকিন্স যে-'স্প্রাং রিদম্'-এর জন্ম দিয়েছিলেন তাতে কথ্যছন্দের ধ্বনিগুণকে মর্যাদা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল। ছন্দের খাতিরে শব্দের সুবিধাবাদী বিকৃতি যে-জৌলুস আনুক না কেন, মিল্টন অথবা রোমান্টিক্সদের চাইতে শেক্সপীয়রের শ্রুতিবোধই যে প্রকৃত মর্যাদাবান, 'স্প্রাং রিদম্'-এর স্রষ্টা হিসেবে হপকিন্সের কবিচৈতন্ম তা অনুভব করেছিল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখা ভালো যে আর, ডিক্সন্‌কে লিখিত একটি চিঠিতে 'স্প্রাং রিদমে'র আদি উৎসবের সন্ধান দিতে গিয়ে হপকিন্স 'Samson Agonistes'-এ ব্যবহৃত মিল্টনের 'Mounted Rhythm'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এবং মিল্টন যে 'স্প্রাং রিদমের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন—এমন ধারণাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এবং মিল্টন কেন তাঁর এই অভিপ্রায়কে পূর্ণতা দিতে পারেন নি—সে সম্পর্কে হপকিন্স উচ্চবাচ্য না করলেও, এলিঅটের পর আমাদের আর একথা বলতে দ্বিধা নেই যে মিল্টনের শ্রুতিবোধে তাঁর শব্দবোধই অন্তরায় হয়েছিল। ফলত ভবিষ্যতের কবি ও কাব্যপাঠকের কাছে মিল্টনের অপেক্ষা শেক্সপীয়রের শ্রুতিবোধই বেশী মর্যাদা পেয়েছে। এবং এলিয়ট 'স্প্রাং রিদম্'কে' গ্রহণ করেন নি বটে, কিন্তু ঐ ছন্দ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন ব'লেই তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভবপর হয়েছিল—

"Grishkin is nice ; her Russian eye
Is underlined For emphasis ;
Uncorseted, her Friendly bust
Gives promise of pneumatic bliss."

সমস্ত দেশের ইতিহাসেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি সামান্ম লক্ষণ পাওয়া যায়—ইতিহাসের ছাত্রেরা তা' জানেন। সাহিত্যের ইতিহাস-ও উক্ত

সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম নয়। ফলত, এক সাহিত্যের ইতিহাস অনেক সময় অন্য সাহিত্যের ইতিহাস বোঝায় সাহায্য করে। এবং ধারণা ও ধৃতির যে যোগফল ভালো কবিতার পক্ষে আবশ্যিক, অক্লান্ত চেষ্টাতেও তার সন্ধান পান নি যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র! পক্ষান্তরে পো বা হপকিন্সের বিবেক-বিবেচনা না পাওয়া গেলেও, যুগসন্ধির কবি হওয়ার মতো নিষ্ঠা ও প্রবণতা জীবনানন্দের মধ্যেই ছিল।—

"নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।" (রাত্রি)

বস্তুত, এইসব পঙ্‌ক্তিতে আবেগবিরোধী যুক্তি ও যথার্থ্যের সমবায় যখন আবিষ্কার করি, তখন ভাবতে অবাক লাগে যে এই কবিচিত্তই আবার অর্গলমুক্ত আবেগপ্রবাহে অবগাহন করে যথেষ্ট আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি পেয়ে গিয়েছেন। বিশেষত, আলোচ্য পঙ্‌ক্তি চতুষ্টয়ের প্রবহমানতায় গদ্যভূমিক শব্দ, ক্রিয়াপদ ও অব্যয়ের যথোচিত ব্যবহারে কথ্যছন্দের প্রতি কবির আগ্রহকেই লক্ষ্য করি। "আজ এই রাস্তার গান গাইব"—এই ধরনের অত্যন্ত সাদামাঠা শব্দপ্রয়োগ করেও প্রেমেন্দ্র মিত্র কথ্যছন্দ তথা আধুনিকতার সঠিক রাস্তা চিনে নিতে পারেন নি। অধিকন্তু, একটি দুঃসহ ও নিঃসঙ্গতার ব্যর্থতাবোধে উটের গ্রীবার সাদৃশ্যচিন্তায় যে প্রতীকী চিত্রকল্পের উদাহরণ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় জীবনানন্দ রেখে গিয়েছিলেন, তা নিশ্চয়ই তাঁকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে। কিন্তু জানি, ভাগ্যদেবী চিরকালই পরিহাসনিপুণা। ফলত, যে বিক্ষিপ্ত গুণাবলীর জন্যে জীবনানন্দ আজ আমাদের স্মরণে আছেন, 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কবিতাবলী সেইসব গুণের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। অথচ, সে আধুনিকতা জীবনানন্দকে যথেষ্ট পীড়িত করেছিল; এমনকি সে-কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে একথাও তিনি বলেছেন—"বিশেষ সময় চিহ্নের ছাপ তার উপর এমন জাজ্বল্যমান যে আজ না হোক, কাল অন্তত ফিকে হয়ে যাবে।" অবশ্য আলোচ্য মন্তব্যে সাহিত্যপাঠকের মন মজুক বা না মজুক, এ ধরনের কথাবার্তা মনোবিকলনের পণ্ডিতের কাছে যে বিশেষ উপাদেয়, তাঁতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আর যাই হোক, নিজের নাক কেটেও অপরের যাত্রাভঙ্গের নীতি জীবনানন্দের মুখে যে শুনব—তা অন্তত আশা করি নি। কারণ, যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের দু-একজনের মুখে শুনেছি, তিনি নাকি সর্বপ্রকার রিপুর

আক্রমণকে উপেক্ষা করেছিলেন। অথচ, আমাদের প্রাচীন আলংকারিকরাও এটা বুঝতেন যে সঞ্চারীর সহযোগ ব্যতীত কোনো স্থায়ীভাব-ই কাব্যরসবস্তুতে পরিণত হতে পারে না। উপরন্তু, জীবনানন্দের 'আট বছর আগে একদিন' কবিতার যে চিত্রকল্প নিয়ে এত কথা উঠল, সেই কবিতার আদ্যন্ত পাঠে এমন সব কথাও মনে জাগতে পারে, যা হয়তো 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' সম্পর্কিত জীবনানন্দের মতামতের বিরোধিতা সাধে না। ফলত, জীবনানন্দ পাঠে নিজের নাক কাটার প্রবচনটি ততটা যথার্থ নয়, যতখানি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পূর্বপরিকল্পনায় অশৈল্পিক প্রবৃত্তি। অবিমিশ্র অনুভূতি আমাদের সুস্থ কল্পনায় আসে না এবং এও দেখেছি সংকাব্য-মাত্রই মিশ্রানুভূতির প্রাপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, আলোচ্য কবিতাটিতে মিশ্রানুভূতির যে সংঘট্ট দেখানো হয়েছে তাতে কবির অভিপ্রায় কি পূর্ণ হয়েছে এবং পাঠকের আকাঙ্ক্ষা কি চরিতার্থ? উটের গ্রীবার দুঃসহতার পরেই—

> "গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
> আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।"

আলোচ্য পঙ্‌ক্তি কখনোই প্রমাণ করে না, অনুভূতির যে সামগ্রিকতার পারবশ্যে বিভিন্ন ভাবানুষঙ্গ অখণ্ড রসবস্তুতে পরিণত হয়, তার কোনো চিহ্ন এসব ক্ষেত্রে অবশিষ্ট আছে। বঞ্চনাবোধ ও তৎপরবর্তী মুক্তৈষণা তাঁর মিশ্রানুভূতির প্রাপ্তি নয়। ফলত, কবিতাটির অমোঘ পরিণামে এই ধারণা আরোপিত, চূড়ান্ত রসাভাসের উদাহরণ। বস্তুত, কবিদের মৌলিক চিন্তায় এলিয়ট কেন যে নিরুৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তাঁর তাৎপর্যও হয়তো বা এ জাতীয় ব্যর্থতার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

সত্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্কেই জীবনানন্দ প্রকৃতি বর্ণনায় এত উৎসাহী। অবশ্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-শেলী-কীট্‌সের প্রভাবে তিনি যে নিতান্ত বঞ্চিত—তাঁকে এমন ভাগ্যহীন মনে করা উচিত নয়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে' অথবা 'অবসরের গান' কবিতায় প্রকৃতিপর্যবেক্ষণের নৈপুণ্য লক্ষণীয়। উপরন্তু, রোম্যান্টিক কাব্যান্দোলনের প্রকরণবিমুখতাও এইসব কবিতার ভূষণ। না মেনে উপায় থাকে না, জীবনানন্দের এই জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের হেতুসন্ধানে তাঁর 'কবিতার কথা' গ্রন্থটি বিশেষভাবে কাজে লাগে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভৌগোলিকবোধ, বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তদুপরি যে আকর্ষণীয় শব্দকৌশল এবং জনপ্রিয় ধ্বনিস্পন্দন তিনি তৈরি করেছিলেন, তার পিছনে আর যেই

থাকুন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। 'মানসী'র থেকে তো বটেই, কবিতা লেখার গোড়ার থেকেই রবীন্দ্রনাথ বরাবর প্রমাণ করেছিলেন যে নূতন অনুভূতির স্পন্দনের সঙ্গে নতুন ভঙ্গির কোনো কলহ নেই। ফলত, মাত্রাবৃত্ত বা স্বরাঘাত ইত্যাদি ছন্দের কথা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র অক্ষরবৃত্তের সম্ভাবনা যে কতখানি সুদূরপ্রসারী, 'কবিতার কথা'য় জীবনানন্দ সে-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেও, আমি যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথের পর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নামই আমাদের মনে পড়ে, যিনি অক্ষরবৃত্তের বিচিত্র ধ্বনিস্পন্দন আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য জীবনানন্দ ও সারাজীবন অক্ষরবৃত্তেই কবিতা লিখেছিলেন। উপরন্তু, রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলাকবিতার ঐতিহ্যে অনুবধান সম্পর্কে আধুনিক কবিরা যদিও জীবনানন্দের ভর্ৎসনাভাজন হয়েছেন কিন্তু যে কাব্যবিবেচক নৈর্ব্যক্তিক বিচারে অপেক্ষাকৃত সক্ষম, তিনিই বলবেন, জীবনানন্দের কবিতা পড়ে কখনো মনে হবে না যে তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী।

পক্ষান্তরে এলিয়টের কাব্যচর্চা 'কাব্যপ্রচেষ্টার' নামান্তর—এ হেন কথা ব'লে জীবনানন্দ আমাদের অনেক উপকার সেধেছেন। কাব্যেতিহাসে জীবনানন্দের স্থান কোথায়—ভবিষ্যৎ পাঠকদের একথা বোঝার পক্ষে আলোচ্য মন্তব্য বিশেষ আবশ্যিক। রোম্যান্টিকসদের আবেগপ্রধান রচনার শুরু হয়েছিল ক্ল্যাসিসিজ্‌মের বিরুদ্ধতা ক'রে এবং ক্ল্যাসিসিজ্‌মের প্রত্যাবর্তনও রোম্যান্টিকসদের বিরোধিতায়। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যরীতি এই দুই রীতির মধ্যবর্তী ঘটনা। অবশ্য আত্ম-সচেনতার অভাববশত ক্ল্যাসিসিজ্‌মের দুএকটি গুণ অল্পবিস্তর আয়ত্তে এনেও শেষপর্যন্ত জীবনানন্দ সত্যেন্দ্রনাথ বড় জোর প্রেমেন্দ্র মিত্র পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। 'অবসরের গান' বলুন আর 'তিমিরহননের গান' বলুন—এমনকি বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতার কথাই ধরা যাক—প্রত্যেকটি কবিতাই আলোচ্য মন্তব্যের উদাহরণ। যাঁরা স্বভাবগুণে অপরের যে কোনোরকম মতামতেই অনীহ, জীবনানন্দের পাশাপাশি প্রেমেন্দ্র মিত্র পড়তে আমি বিশেষভাবে তাঁদের অনুরোধ করছি। আধুনিকতা প্রসঙ্গনির্ভর নয়, সেটা একটা মর্জির ব্যাপার। কিন্তু এ কথা কি 'বেনামী-বন্দর' বা 'অন্ধকার' কবিতা পড়ে জানবার উপায় আছে 'শাশ্বতী' কবিতা সে ধারণা জন্মাতে অধিকতর সাহায্য করে? আসলে যে স্বভাববৈগুণ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রোতার আসর শূন্য হ'তে বসেছে, জীবনানন্দের কাব্যস্বভাবও কি তার-ই অংশভাক্? অন্তত, প্রসঙ্গান্বেষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় না ক'রে নিজের চোখ ও মন দিয়ে জীবনানন্দ যদি পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখতেন, তা হ'লে 'হায় চিল' 'আট বছর আগের একদিন'-এর মতো

কবিতাদ্বয় এক গ্রন্থভুক্ত হওয়া দূরের কথা, এক কবির দ্বারাই রচিত হত না। আসলে চোখ-কানের ঝগড়া মেটাতে-মেটাতেই জীবনানন্দের সারা জীবন কেটে গিয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝি যে সবসময়ে এবং সকলের কাছে সব সত্য খুব প্রীতিকর ঠেকে না। ফলত, তিরিশের দশকের কবিদের বিদেশী কাব্যপ্রীতির নিন্দায় জীবনানন্দ পঞ্চমুখ হলেও রোম্যান্টিক্সদের শত প্রভাব সত্ত্বেও এলিয়টের 'কাব্যপ্রচেষ্টা' তাঁকেও আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু তাতেই তাঁর মন সুস্থির হয় নি। এক দুঃসহ নৈরাশ্য ও বঞ্চনার খেদ অনুভব করতে শিখেছিলেন এলিয়টের পদাঙ্কে। ইয়েট্স্ দিয়েছিলেন তাঁকে কেল্টিক গোধূলির বিষাদ। রোম্যান্টিক্সরা তাঁকে শিখিয়েছিলেন আবেগ—বাধাবন্ধহীন আবেগ, তিল তিল সংগ্রহ ক'রে সংস্কৃত কবি তিলোত্তমা গড়েছিলেন বটে, জীবনানন্দ কিন্তু এঁদের বিরোধী লক্ষণগুলোকে তাঁর মনন বা চৈতন্যের মধ্যে মেলাতে পারে নি। 'বনলতা সেন' লিখতে যে ধরনের মননকে কাজে লাগানো হয়েছে, 'সুবিনয় মুস্তাফী' কবিতার ব্যাপারে তা অন্যধরনের। এবং এর থেকেও যা মর্মান্তিক ও শোকাবহ তা হচ্ছে, যখন তিনি তাঁর প্রাক্‌কাব্য-প্রকরণকে পরিত্যাগ ক'রে নূতন কাব্য প্রকরণের অন্বেষণে বেরিয়েছেন এবং পাঠক যখন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন, তখন এমন দুএকটি কবিতা তিনি লিখে ফেললেন যা তাঁর পূর্ব কাব্যপ্রকরণের কথা স্মরণে আনে। 'সাতটি তারার তিমির'-এর পরবর্তী কবিতাগুলোর কথাই আমি বলছি। যে-কাব্যধারায় 'লোকেন বোসের জর্নাল' বা 'যাত্রী' কবিতা লিখতে হয়েছে, সে-ধারাতে 'তোমাকে ভালবেসে' বা 'সে' কবিতাও লেখা হল। সারাজীবন পয়ারে লিখে কেন যে জীবনানন্দ 'তোমাকে ভালবেসে' কবিতায় স্বরাঘাতের আশ্রয় নিলেন, তার কোনো কার্য-কারণ-সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। এর আগে পয়ার ছাড়া যাঁকে লিখতে দেখি নি এবং এর পরেও যাঁকে পয়ার ছাড়া আর কোনো ছন্দ ব্যবহার করতে দেখা গেল না, তাঁর পক্ষে এই কবিতাটি লেখা নিশ্চয়ই একটি মুহূর্তের তাড়না তাতে সন্দেহ নেই। উপরন্তু, যে-অধ্যায়ে কথোপকথনের ঢঙকে আয়ত্তে আনার জন্যে তিনি কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন, তখন হঠাৎ এই পুরোনো মজির কবিতা বিবেকী পাঠককে রীতিমতো বিচলিত ক'রে তুলবে। তাঁর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যে সজ্ঞান-চৈতন্য-প্রভব নয়—এই কথাই কি প্রমাণিত হয় না? 'পূরবী'র কবিতার ধারায় 'ক্ষণিকা'র কাব্যভঙ্গীর প্রত্যাবর্তন আপনি কি ভাবতে পারেন? সুধীন্দ্রনাথের 'দশমী' কাব্য পুস্তিকাটি যিনি পড়েছেন তিনি সেখানে আশাই করতে পারেন না তাঁর

'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের 'নাম' কবিতাটির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের হুবহু পুনরাবৃত্তি। কারণ 'নাম' কবিতায় অক্ষরবৃত্তের যে-পরীক্ষা করা হয়েছে, 'দশমী'র অক্ষরবৃত্ত সেইসব প্রাক্-পরীক্ষা-নিরীক্ষারই ক্রমবিকাশ। ফলত, পাঠকের মনে জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই প্রচ্ছন্ন।

উপরন্তু, শেষ জীবনে 'বিশ্ববোধ' নামক দার্শনিক চিন্তায় তিনি বিশেষভাবে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। এবং সে-চিন্তার ফলশ্রুতি যে-কাব্যরীতির জন্ম দেয় তা স্বাভাবিকক্রমেই পাঠকের অনাদর কুড়িয়েছে। কারণ 'সংবর্ত', 'যযাতি' অথবা 'ক্রেসিডা' ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের পর বাঙালী পাঠকের অজ্ঞাত নেই যে এই জাতীয় রূপকল্পের উৎকর্ষ নাটকীয় মুহূর্তের উপস্থিতিনির্ভর। এবং পুনর্বার স্মরণে আসে এলিয়টসাহেবের অমোঘ বাণী। মৌলিক চিন্তা করতে কবিদের তিনি বারণ করেছিলেন। কারণ, 'বিশ্ববোধ'-এর চিন্তা ব্যক্ত করার জন্য কবিতার বিড়ম্বনায় যাওয়ার প্রয়োজন কোথায়।

"ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়;
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে; মানুষের মন
জানে জীবনের মানে; সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন।"

এই ধরনের তত্ত্ব পরিবেশনের সঠিক মাধ্যম কি গদ্য নয়? কারণ পদ্যের বাহনে হিতোপদেশ শোনানোর প্রচেষ্টা যে কোনো কবির পক্ষেই লজ্জাকর এবং কবিতার পাঠকের কাছে এ সব রচনার অনাদরও তাই অনিবার্য।

আসলে আধুনিকতা কোনোদিনই বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রে চিহ্নিত নয়। নয় ব'লেই শেক্সপীয়র আধুনিক। আবার 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' রচয়িতাও আধুনিক। তাহলে আধুনিকতার সামান্য লক্ষণটি কি? আমার বিশ্বাস, যে-কবির শ্রুতি-বোধ আমাদের কথোপকথনের ভঙ্গিকে অনুসরণ করতে পারে, তাঁর রচনাই আধুনিক তথা কালজয়ী। ফলত, সনেটের সংহত রূপকল্পের চর্চা ক'রেও শেক্সপীয়র শব্দের সুবিধাবাদী বিকৃতি ঘটান নি। তাঁর সনেটগুলো পড়তে পড়তে আমাদেরো মনে হয়—"that is how I should talk if I could talk poetry." এবং এলিয়টের প্রসঙ্গের ভূতনত্ব জীবনানন্দের মনকে টানলেও অপরাপর কাব্যপ্রসঙ্গের মতো এলিয়টের প্রসঙ্গও সাম্প্রতিক। কিন্তু যে-প্রকরণের সমানুপাতে তা প্রাণঘন রসসৃষ্টি, তা আধুনিক তথা কালজয়ী। বস্তুত, এলিয়ট যখন বলেন—

"Half-past one,
The Street-Lamp Sputtered,

The Street-Lamp muttered,

The Street-Lamp Said, Regard that woman…"

তারপর এই পুনরাবৃত্তিময় ভঙ্গির নজির যেন আবিষ্কৃত হয় নিম্নোদ্ধৃত অংশে—

"অথবা নাইকো ধান খেতে আর ;
ব্যস্ততা নাইকো আর ;
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়—
পাখির নীড়ের থেকে খড়—
ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটালেও জীবনানন্দ এলিয়টের এই বিশিষ্ট ভঙ্গির উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। যে-প্রেরণালব্ধ 'দিব্যানুভূতি'-কে মর্যাদা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন জীবনানন্দ, সে ধারণা সর্বান্তঃকরণে-প্রকরণবিরোধী। রোম্যান্টিকস্‌রা সেসব ধারণার পূর্বপুরুষ। ফলত, পুনরাবৃত্তিময় পঙ্‌ক্তির হ্রস্বদৈর্ঘ্য এলিয়টের কাছে কথ্যছন্দের যে ধ্বনিগুণকে নিয়ে এসেছে, সেই প্রসারসংকোচ বা পুনরাবৃত্তির ঢঙ জীবনানন্দের কাছে অর্থ-হীন আবেগমাত্র, অথবা তাঁর নিজের ভাষায়, 'বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগ'। পক্ষান্তরে এও সত্যি যে জীবনানন্দের 'রাত্রি' বা 'ঘোড়া' কবিতার 'কুকুরের অস্পষ্ট কবলে হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস-রেস্তরাঁতে" ইত্যাদির মতো পঙ্‌ক্তিতে যে-দুঃসহ, নিঃসঙ্গ ও অসহায় জীবনের আর্তি প্রতীকত্ব লাভ করেছে, সে-চৈতন্যের কাব্যঐতিহ্য খুঁজতে বসলে এলিয়টসাহেবের—"The yellow fog that rubs its back upon the window-panes" অথবা "Rhapsody on a windy night"-এর মতো কাব্য পঙ্‌ক্তি বা কবিতার কথা মনে আসে। এবং কাব্যের ঐতিহ্যের অর্থ এই নয় যে তার পরিধি দেশ কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিদেশী কবির পুনর্মূল্যায়ন ঘটতে পারে স্বদেশের মাটিতে। বস্তুত, এলিয়টকেও তাঁর কাব্য ঐতিহ্যের সন্ধান পেতে হয়েছিল ফরাসী কবি, ল্যাফর্গের মধ্যে। এ ব্যাপারে নিন্দের কোনো কিছু নেই বরং এ মনোবৃত্তিকে যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর বলা যেতে পারে। তবে 'কবিতার কথা' পড়ে জানতে পারি, জীবনানন্দ নিজে এ প্রবৃত্তিকে খুব সুনজরে দেখেন নি।

যাই হোক, জীবনানন্দ এইটুকু বুঝেছিলেন যে 'বনলতা সেন' যতই জনপ্রিয়তা লাভ করুক না কেন, জনপ্রিয়তার আয়ু কোনোকালেই দীর্ঘ হ'তে পারে না। ফলত, ভঙ্গির পরিবর্তন তাঁর কাছে নিতান্ত অনিবার্য ঠেকে। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে পুনর্বার পয়ারকে যে ভাবে কাজে লাগাতে তিনি যত্নবান

হয়েছিলেন এবং যে রূপকল্পের আশ্রয় তাঁর কাছে আবশ্যিক মনে হ'য়েছিল, তাতে যদিও পাঠকের অভ্যন্তচৈতন্যে নাড়া দেওয়াই কবির অভিপ্রেত কিন্তু ফলশ্রুতি যা দাঁড়ায় 'কবিতার কথা'-য় সে-ব্যাপারের তিনি গদ্য সমর্থন রেখে যেতে চেষ্টা করেছিলেন।" 'অগ্রসর' মানে এক পর্যায়ের থেকে পর্যায়ান্তরে গমন, ফলে মহত্তর কবিতা পাওয়া যেতে পারে, নাও পাওয়া যেতে পারে, কবিতা আগের চেয়ে খারাপও হ'য়ে পড়তে পারে, কিন্তু কবির কবিতার পরিবর্তন হয়েছে বলা যেতে পারে।" অবশ্য এই অকাট্য যুক্তির স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে কবিতা লিখে জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বসুর মতো বুদ্ধিমান ভক্ত জুটিয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। অবশ্য এ জাতীয় পরিবর্তনপ্রীতি মনস্তত্ত্বের জটিলতাই প্রমাণ করে। কারণ যে পরিবর্তনকে মন্দ ব'লে জেনেছি তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই তো বিধেয়, তাকে কে আবার ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজ্ঞাপন ক'রে থাকে। উপরন্তু, পরিবর্তনপ্রীতি কবির কাছে উপলক্ষমাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ভালো কবিতা লেখা। সুতরাং পরিবর্তনের জন্যেই কোনোরকম পরিবর্তন সংপাঠকের কাছে সর্বসময়েই মর্যাদাহীন ঠেকে। তবে এই প্রাকরণিক পরিবর্তনের ব্যাপারে এলিয়টসাহেবের শিক্ষা ছিল ভিন্নধরনের। তাঁর মতে, প্রকাশকৌশল সম্পর্কে কবির ঘন ঘন মতপরিবর্তন অভিপ্রেত ও নয়ই, এমন কি এ ধরনের পরিবর্তন, তাঁর মতে, পূর্বসূরীর কাব্যপ্রযুক্তির অন্ধানুকরণের মতো নিন্দার্হ। অবশ্য এলিয়টসাহেব বিদেশী; তাছাড়া জীবনানন্দ আমাদের শিখিয়েছেন তাঁর কাব্যচর্চা 'কাব্যপ্রচেষ্টা'রই নামান্তর। এবং জীবনানন্দের যুক্তি অনুযায়ী তাঁর শেষের দিকের রচনার আলোচনায় আমাদের বিরত থাকলেই ভালো হত কিনা জানি না, কিন্তু কবিতাগুলোকে যেকালে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন আমরা পাঠকেরাও নিতান্ত নিরুপায়। অনুভূত রসবস্তুকে পাঠকের মনে সঞ্চার করাকে যদি কবির প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব ব'লে সবাই স্বীকার করেন, তবে একথাও মেনে নিতে হবে যে তাঁর অতিভক্তও শেষের দিকের কবিতাগুলোকে পড়ে উঠতে পারবেন না। অবশ্য আমি জানি সত্যের অপ্রিয় অন্বেষণ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পক্ষান্তরে এও ঠিক, মানুষের দুটি দুর্বল হাতে সূর্যালোকের প্রবাহ ঢাকা পড়ে না। ফলত, রবীন্দ্রনাথের উক্তি তুলে জীবনানন্দ পয়ারের মাহাত্ম্য যতই প্রচার করুন না কেন, একথাও তাঁর বিস্মৃত হওয়া উচিত ছিল না যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তকেও রবীন্দ্রনাথই জাতে তুলেছিলেন। তাঁর কবিমন গভীরভাবে অনুভব করেছিল যে এর দ্বারা বাংলা কবিতার অনেক উপকার

করা হবে এবং তা হচ্ছে, পাঠকের তো বটেই, কবিদেরও মুখবদলানোর উপায় থাকবে। ছন্দের এই বিভিন্নতার কথা ছেড়ে দিলেও, 'সংবর্ত' বা 'যযাতি'র মতো কিছু কিছু কবিতা থেকে যায়। আগাগোড়া পয়ারে লেখা হ'লেও তাতে অন্ত্যানুপ্রাস ও পর্বের হ্রাসবৃদ্ধি, তদুপরি যেসব নাটককে মুহূর্তের সংঘট্ট দেখানো হয়েছে তার ফলে অত দীর্ঘ কবিতাও পড়তে পড়তে কোনোদিন চোখে ঢুল আসে না। শত দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সত্ত্বেও 'ল সের্পা' বা 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কবিতাদ্বয় সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ একসময় যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তাঁর এই দুটি কবিতার প্রসঙ্গেও সে মন্তব্যের পুনরুদ্ধার বেমানান হবে না—"বুদ্ধির অনুমতি পাবার বহুপূর্বেই তার (পাঠকের) মুগ্ধচৈতন্য কবিতা দুটির মহত্ত্ব নিঃসংকোচে মেনে নিয়েছে।" জীবনানন্দের শেষের দিকের কবিতাগুলোর মধ্যে এমন সব বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি র'য়ে গিয়েছে যাতে আশ্চর্য ভাবে কথাছন্দের ধ্বনিমাধুর্য আবিষ্কৃত। কিন্তু তাঁর প্রধান দোষ, আগাগোড়া কবিতার সেই সমতাকে তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। এতে কবিতার সামগ্রিক আবেদন অনেকটা স্তিমিত হ'য়ে পড়ে। অবশ্য এও ঠিক, পর্বের যে হ্রাসবৃদ্ধি-প্রভব নাটকীয়তায় সুধীন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তা জীবনানন্দের ধাতে সওয়ার কথা নয়। উপরন্তু, বড়ো কথা বলার শোকাবহ প্রবণতা তাঁকে প্রায় পেয়ে বসেছিল।

অবশ্য রোম্যান্টিক্‌দের প্রকরণবিমুখতায় ধাতস্থ হ'লেও একমাত্র যে-ছন্দে জীবনানন্দ সারাজীবন লিখেছিলেন, সেই অক্ষরবৃত্তের আইনরক্ষাতেও তিনি বিস্ময়করভাবে উদাসীন। ছন্দবিপর্যয়ের মধ্যে যদি কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য আবিষ্কৃত হয় তবে তাতে কিছু বলার থাকে না। কিন্তু যেখানে ত্রুটির উৎপত্তি অসাবধানতায় সেখানে পাঠকের কাছে কবির কি জবাবদিহি থাকতে পারে? জানি, এহেন মন্তব্যে তাঁর গুণমুগ্ধেরা অল্পবিদ্যা ভয়ংকরের উদাহরণ খুঁজে পাবেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, জীবনানন্দ লিখেছেন – "কালো চোখ মেলে 'ওই' নীলিমা দেখেছো।" আমার তো মনে হয়, বিহারীলালও এমন ভুল করতে পারতেন কি না সন্দেহ। ছন্দোরক্ষার জন্যে কবিকে দৃষ্টির সাহায্য নিতে হয়, না শ্রুতির? 'ওই' শব্দটি যদি দুমাত্রা হয়, কবিতা লিখতে তাহলে কি শ্রুতির সহযোগ অপ্রয়োজনীয়? তার্কিকের সমর্থনে অমিয় চক্রবর্তীর নাম রয়েছে। 'নীহারিকা পাড় বোনা, বিদ্যুতি জরির উদ্ভবে'। 'বিদ্যুতি' শব্দটিতে যুক্তাক্ষরের সুবিধে থাকায় পাঠকের শ্রুতিতে যে-আঘাত জাগানো হয়েছে, 'বৈদ্যুতিক' বললে সে-ধ্বনি খানিকটা প্রসারিত হ'য়ে আকাঙ্ক্ষিত রসসৃষ্টিতে বিঘ্ন আনত, যদিও জানি 'বৈদ্যুতিক' বললে ছন্দের

আইন বজায় থাকে। অমিয় চক্রবর্তী নানা জায়গায় এই ধরনের ছন্দ-বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন কিন্তু কোথাও তা অসতর্কতা বা অসাবধানতালব্ধ নয়। কিন্তু 'ওই' শব্দটিকে যদি 'ঐ' লেখা হত তাতে কি আমাদের শ্রুতি কোনো তারতম্য অনুভব করত? প্রতিবেশী সমস্ত কবির থেকে নিজেকে যিনি স্বতন্ত্র ব'লে মনে করতেন এবং যাঁর মতে, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করা রবীন্দ্রোত্তরদের আশুকৃত্য ব'লে পরিগণিত হয়েছে, তিনি কেন যে এত অসতর্ক তা ভেবে ওঠা যায় না। অন্তত কবিতা লিখতে এটা ভোলা অমার্জনীয় অপরাধ যে তাঁর চেয়ে অনেক বড়ো যাঁরা আধ্যাত্মিক কবি হ'য়েও রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন ছন্দ ভুল করেন নি। পক্ষান্তরে এই সব প্রমাদকে যাঁরা জীবনানন্দের অতীন্দ্রিয় প্রীতির লক্ষণ ব'লে থাকেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া আমার সাধ্যের অতীত। কারণ ইতিহাসের পাতা ওল্টালে রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, হপকিন্স, মালার্মে, এমন কি এলিয়টের নাম জীবনানন্দের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে।

অধিকন্তু, সাধু ক্রিয়াশব্দ ও ছন্দের বিকৃতি ঘটিয়ে জীবনানন্দ যে মৃতভাষা আমাদের পরিবেশন ক'রে গিয়েছেন তার নগদ মূল্য বড় কম নয়। মধুসূদন এককালে এ ব্যাপারে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন। হেমচন্দ্র,'নবীনচন্দ্রের মতো অনুকারক জুটিয়েছিলেন তিনি। পরিণামে ছাত্রপাঠ্য হিসাবে মর্যাদা পেয়ে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছেন। জীবনানন্দের অসংখ্য অনুকারক তৈরি হয়েছে। আশা করি, তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিশিষ্ট আশুকৃত্যগুলোকে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও গরিষ্ঠ পুচ্ছানুগ্রাহীর দল আকাঙ্ক্ষানুরূপ আকার দিতে বিস্মৃত হবেন না।

কবি জীবনানন্দ দাশ

মণীন্দ্র রায়

একদিক দিয়ে জীবিত কবির কাব্যালোচনার চেয়ে পরলোকগত কবির কাব্যবিচার অনেক সহজ। কারণ যিনি বেঁচে আছেন এবং লিখে চলছেন তাঁর বিষয়ে আমরা নিরাসক্ত হতে পারিনে—শেষ কথাও বলতে পারিনে। কিন্তু মৃত কবির কাব্য বিচারেও অসুবিধা ঘটে। বেঁচে নেই বলে তিনি কিছুটা সদয় ব্যবহার তো পানই, উপরন্তু স্মৃতিপূজার হিড়িকে তাঁর বিষয়ে চারদিক থেকে সত্য মিথ্যা এত প্রশস্তিপত্র রচিত হতে থাকে, যার ভেতর থেকে কবির আসল চেহারা আবিষ্কার করা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতোই পণ্ডশ্রম হয়ে ওঠে। কবি জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রায় সতেরো বছর আগে তাঁর শোচনীয় আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে অজস্র রচনা বেরিয়েছে তাঁর কবিতার বিষয়ে। কিন্তু তিনি যে একজন কবি, এই সাধারণ স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সমালোচকরা প্রায়ই একমত হতে পারেন নি।

অবশ্য কবির জীবদ্দশাতেই এই বিরোধী মতের আলোড়ন শুরু হয়েছিল। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় জীবনানন্দ তাই বলেছিলেন, "আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার, অন্যমতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিক ভাবেই সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কবিতার অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে। সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।" একজন কবি, যিনি প্রায় তিরিশ বছর ধরে কবিতা রচনা করেছেন, তাঁর সমগ্র কাব্যের 'ব্যাখ্যা হিসেবে' কোনো একটি মাত্র 'আখ্যা' কার্যকরী না হতেও পারে; কিন্তু কবি ব্যক্তিত্বে যদি ফাঁকি না থাকে, তবে কবিতার বিভিন্ন অধ্যায়ের ভেতর দিয়ে কবি তাঁর বক্তব্যকে কী ভাবে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন, এবং আমাদের কাছে তাঁর সে বক্তব্যের সার্থকতাই বা কতটুকু—এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা চলতে পারে। তাই উপরোক্ত উদ্ধৃতির পরই তিনি যখন বলছেন, "কবিতা সৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার। কাজেই পাঠক ও

সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য।" তখন ব্যাপারটাকে অর্ধসত্য বলেই মনে হয়। আসলে "শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার" বলে যা নির্দেশ করা হয়েছে সেটা কতখানি ব্যক্তিগত কল্পনা আর ধীশক্তির ব্যাপার এবং কতটাই বা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রফল, তা-ও বিবেচনা করে দেখা দরকার। আমাদের দেশে কবিতা রচনা এবং কাব্যালোচনা, এই উভয় ব্যাপারেই 'ব্যক্তিমনে'র খেয়ালখুশী এখনো যদৃচ্ছা বিহার করলেও এই একান্ত সাবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে অবজেকটিভ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ উপায়েও যে রচনা আলোচনা দুই-ই চলতে পারে, তার দৃষ্টান্তও একেবারে অনুপস্থিত নয়। অবশ্য রচনার দিকে, বিশেষ করে লিরিক কবিতার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিমনে'র আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ হওয়া সম্ভব—যদি সেই ব্যক্তিটি হন শুদ্ধ চৈতন্যের অধিকারী; অর্থাৎ সমাজের দশজনের একজন এবং দশজনের প্রতিনিধিস্থানীয়। কিন্তু কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতাও আজ সীমাবদ্ধ। শুধু ভালো কিংবা মন্দ লাগে বলে রুচির দোহাই না দিয়ে এখন সাক্ষীনজীর মারফত নিজের মতকে প্রমাণ করার দায়িত্ব এসেছে। এবং কাব্যসৃষ্টি পুরোপুরি 'ব্যক্তিমনে'র মন্ত্রগুপ্তি বলে মেনে না নিয়ে ব্যক্তিমন ও সমাজমানসের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন বলে বুঝতে পেরে কবির কাব্যকে তৎকালীন সামাজিক পটভূমিতে রেখে বিচার করার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে, কেননা, এই বিচারই ধোপে টেকে। আর যেহেতু সমালোচকের ব্যক্তিগত মর্জির চেয়ে এই সামাজিক পটভূমিতে আলোচনার মানদণ্ড অনেক বেশি স্পষ্ট ও যুক্তিসহ, তাই এই পদ্ধতিতে একজন কবির কাব্যবিচারে আসমানজমিন মতভেদ হওয়াই সম্ভব নয়।

জীবনানন্দের কবিজীবনের শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে সে-সময়ের আলোড়নকারী কবি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। যৌবনের বাঁধভাঙা বেগে তিনি বাঁচার উল্লাসকে ভাষা দিচ্ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শেষে জালিয়ানওয়ালাবাগের বিশ্বাসঘাতকতা, গান্ধীজীর গণ-আন্দোলনের প্রসার, রুশবিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং সেই সঙ্গে এদেশেও সংগঠিত শ্রমিক-আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি—এই পটভূমিতেই নজরুলের আবির্ভাব ও আকস্মিক জনপ্রিয়তার কার্যকারণ নির্দেশ করা সম্ভব। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' কেবল নামে নয়, বক্তব্যেও তাঁর সমবয়সী কবির 'অগ্নিবীণা'র চেয়ে অনেক নিরীহ, নিরুত্তাপ এবং নিরুৎসাহজনক। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, এ কাব্যে মোহিতলাল-যতীন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ কবিদের প্রভাব আবিষ্কারও কঠিন

নয়। বরং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' নতুন বক্তব্যকে কাব্যরূপায়িত করে সে-সময়ে বিশিষ্টতা লাভ করেছিল, কিন্তু 'ঝরা পালক' সমাদর পায় নি। কবির কাব্যরচনার ব্যর্থতাই যে তদানীন্তন পাঠকের ঐ আপেক্ষিক উদাসীনতার একমাত্র কারণ, তা বোধহয় না। 'ঝরা পালক' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"ডেকেছিলো ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিমমাস—
জোনাকির ঝাড়,
আমারে ডাকিয়াছিলো আলেয়ার লাল মাঠ—
শ্মশানের খেয়াঘাট আসি,
... ...
ধুধুমাঠ ধানখেত কাশফুল বুনোহাঁস—বালুকার চর
বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া;"

এর মধ্যে জীবনানন্দীয় আমেজ ও চিত্রকল্পের ব্যবহার তখন থেকেই আবিষ্কার করা যায়, কাজেই 'নিছক কবিত্ব' বা 'মুড' (Mood) নির্ভর কবিতা লিখতে পারলেই যদি সার্থকতা লাভ সম্ভব হত, তাহলে 'ঝরা পালক'ও অভিনন্দিত হত। অন্যপক্ষে নজরুল বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাফল্যের কারণও দেখা যাচ্ছে 'কবিত্বে'র সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বক্তব্যকে কাব্যরূপ দেওয়ার দক্ষতায় নিহিত। এর দ্বারা মনে হয় না কি, জীবনানন্দ যে তখন, এবং তারপর বহুদিন, বাঙলার পর্যায়ক্রমিক কাব্যান্দোলনের মধ্যমণি হিসেবে গণ্য হন নি, তার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁর নিরঙ্কুশ 'ব্যক্তিমনে'র স্বপ্নরতি।

৩

অবশ্য কোনো লেখকই চূড়ান্তভাবে আত্মনির্বাসনে থাকতে পারেন না, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি সামাজিক অনুষঙ্গময় উপকরণ তো তাঁকে ব্যবহার করতে হয়ই, প্রবল সামাজিক ঘটনার আবেগমন্থনও প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কবির রচনায় ছায়াপাত করতে বাধ্য, অবশ্য বাস্তবজীবন কবিকে কতদূর কিংবা কী ধরনে প্রভাবিত করবে তা নির্ভর করে কবির মানসিক প্রস্তুতির উপর। স্বদেশ ও স্ব-সমাজের যে ঘটনাবলীর প্লাবন নজরুল কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ঢেউয়ের চূড়ায় টেনে নেয়, তারই প্রভাবে হয়তো জীবনানন্দ পান ঢেউ গুনে সময় কাটাবার কর্মবিমুখতা। নাহলে এমন মমতাময় জীবনতৃষ্ণার কাব্যরূপায়ণ—

"আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;

শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;"

(ধূসর পাণ্ডুলিপি : মৃত্যুর আগে)

এরপর ঐ একই কবিতার শেষে কবির এ উপলব্ধি আসে কী করে—

"সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ;"

কিংবা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থেরই অন্য কবিতায়—

উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়।
পৃথিবীর পুরানো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয় !
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয় !   (স্বপ্নের হাতে)

কাজেই, 'নক্ষত্রেরো আয়ু' যখন কোনো এককালে শেষ হয়, তখন 'স্বপ্নের জগৎ' যে কোনো আগামী দিনের প্রতিচ্ছবি বহন করতে নারাজ হবে, এ তো সহজেই কল্পনীয়। এই স্বপ্নের জগৎ কবি এইজন্যে বেছে নিয়েছেন যে,

"এখানে চকিত হ'তে হবে নাকো, ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময় ;
উদ্যমের ব্যথা নাই—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয় ;
এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে ;
... ...
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর।
... ...
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে
ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।"

কিন্তু একে স্বপ্নের জগৎ না বলে Land of the 'Lotus Eaters' বলাই বোধ হয় সঙ্গত। এবং এ জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর কোনো তফাত নেই বলেই হয়তো পরবর্তী একসময়ে কবির কাছে মৃত্যুও জীবনের চেয়ে অনেক বেশি অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয়েছিল। ('আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি দ্রষ্টব্য !) ।

মৃত্যুর প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, জীবনধারণের সহজাত আসক্তির টান ভুলে মানুষ যখন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে, তখন বুঝতে হবে পরিপার্শ্বের সঙ্গে এমনভাবে তার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে যাতে নিজেকে সে কিছুতেই স্বস্থানে ফিরে পাচ্ছে না। মৃত্যু-চিন্তা সেখানে এক ভয়ানক অভিমানেরই বহিঃপ্রকাশ। এই অভিমান আবার প্রবল একটা প্রতিবাদেরও চেহারা নিতে পারে—যেমন নিয়েছিল সন্ত্রাসবাদী আত্মাহুতির মধ্যে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো সোল্লাসে না হলেও ('নীলকণ্ঠ' কবিতা দ্রষ্টব্য)—জীবনানন্দের কবিতাতেও এই মৃত্যু বা অবক্ষয়ের ছবি ব্যথিত প্রতিবাদের সুর নিয়েই অনেক সময় উপস্থিত হয়েছে। তাই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাতেও হয়তো শেষ লাইনে এসে বিষাদ জেগেছে—"আমরা দু-জনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার" এবং "ক্যাম্পে", "শিকার" ইত্যাদি কবিতায় এই জীবনলিপ্সা মৃত্যুর পটভূমিতে স্পষ্ট পরিণতি লাভ করেছে।

৪

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' মোটামুটি প্রাক-তিরিশের মন্দা আর জাতীয় আন্দোলনের সমসাময়িক রচনা। কিন্তু এখানেও কবির উপলব্ধি জাতীয়-জীবনের গভীরে প্রসারিত নয়। অবক্ষয়ের চেতনা আছে ; 'মানুষের', 'মানুষীর' বা 'শিশুদের মুখ' দেখতে গিয়ে এখানে যে—

"যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চাল্‌কুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে (বোধ)

শুধু সেই সবই দেখতে হয়। এ-চেতনা আছে কিংবা এ জিজ্ঞাসাও আছে—

"প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই,
ঘৃণা মৃত্যু পাই ;
পাই নাকি ?"

কিন্তু জীবনের বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে এই অপচয়ের গ্লানি দূর করার কোনো ইঙ্গিত এ কবিতাগুলিতে দেখা যায় না। এমন কি গ্লানিবোধ যেখানে পাঠকচিত্তে ক্ষোভের আকার নিতে পারে সে রকম তীব্র অভাবচেতনাও নয়, এখানে আমরা পাই শুধু অস্পষ্ট বিধুরতা (Nostalgia)। যন্ত্রণার পরিবর্তে মন কেমন-করা।

তাই প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের নমুনা পাতায় পাতায় ছড়ানো থাকা সত্ত্বেও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' রবীন্দ্রোত্তর কাব্যজগতে প্রথম শ্রেণীর কবির আগমন সূচিত করে নি।

প্রবল কবিত্বশক্তি এবং তাকে কোনো মূল বিশ্বাসে সংগ্রথিত করার অক্ষমতা জীবনানন্দ দাশের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "বনলতা সেন' এবং তারপরেও "মহা পৃথিবী" পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে ভালো কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন। চিত্রকল্পের দক্ষতা তাঁর বরাবরই ছিল, এমন চেতনাও তাঁর এসেছে—

"…চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এইপথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষার কাজ;

… … …

শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।" (সুচেতনা)

কিন্তু এও তিনি বলেন—

"সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ;
তবু তারা করেনাকো পরস্পরের ঋণশোধ।" (আবহমান)

এবং সবচেয়ে জোরালো গলায় বলেন—

"যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এইসব ভয়াবহ আরতি!
গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত,
আমাকে কেন জাগাতে চাও?" (অন্ধকার)

কাজেই শেষ পর্যন্ত তাঁর আশ্রয় হচ্ছে—

"…সংঘ নয়, শক্তি নয় কর্মিদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো: মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।"

অর্থাৎ প্রেম। 'ঝরা পালক' থেকে শুরু করে একেবারে কবি জীবনের শেষ অবধি এই প্রেমই ছিল ধ্রুব নক্ষত্র। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিতান্ত 'মুড' নির্ভর হওয়ায় এই প্রেমের অভিব্যক্তি ফিকে হয়ে গেছে; শুধু 'বনলতা সেন' বা 'নগ্ন নির্জন হাত' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় কল্পনার সৌকর্যে

বক্তব্যহীনতা চাপা পড়েছে মাত্র। আর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ প্রেম হয়েছে স্মৃতিনির্ভর, ভবিষ্যতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং গানে আমরা প্রেমের বিচিত্র ব্যঞ্জনা প্রত্যক্ষ করেছি। অতীতের বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেখেছি বর্তমানের বীরত্বময় সংকল্প, ভবিষ্যতের আশ্বাস; দেখেছি নারীর আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে প্রেমলাভের বাসনা; এবং প্রেম যে সমাজবাসী নারীপুরুষের সদা-পরিবর্তমান সম্পর্ক, এ উপলব্ধিও প্রত্যক্ষ করেছি। রবীন্দ্রোত্তর তৎকালীন কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু প্রেমের শারীরিক দিকটির কথা যথেষ্ট আবেগ উত্তাপের সঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন; আর এরই কিছুকাল পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—যিনি "মানসীর দিব্য আবির্ভাব সে শুধু স্বপ্নে জাগরণে আমরা নিত্য একাকী" বলে জীবনানন্দের মতোই প্রত্যক্ষের চেয়ে স্বপ্নের দিকে পক্ষপাত করেছিলেন— তিনিও, কখনো বিষাদ, কখনো হাহাকার দিয়ে প্রেমের জৈব-প্রেরণার কথাই কাব্যরূপায়িত করেছিলেন। জীবনানন্দের কবিতায় প্রেমের এই উচ্ছলতা নেই—স্মৃতি নিয়ে হাহাকারও অনুপস্থিত। প্রেমকে তিনি গ্রহণ করেছেন এক প্রয়োজনীয় উপলব্ধির মতো, যা না হলে তাঁর মতে এই উৎকেন্দ্র জগতে বেঁচে থাকাই কঠিন। বলা বাহুল্য, একজন কবির পক্ষে এ বোধ অত্যন্ত গৌরবের। কিন্তু নতুন নয়। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, যাঁরাই প্রেমের বিষয়ে কিছু বলেছেন তাঁরা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রেমের বিপুল প্রভাবের কথা মেনে নিয়েই লিখেছেন। এ যুগের কবির বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে, একালের সমাজবাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সেই প্রেমের উপলব্ধিকে কাব্যরূপায়িত করা। রবীন্দ্রনাথ তা পেরেছিলেন। তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলি (মহুয়া, পুনশ্চ, চিত্রাঙ্গদা-র গান—'আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী') এর প্রমাণ। কিন্তু জীবনানন্দ তা পারেন নি। তাই তাঁর কবিতায় বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, সবিতা, সুচেতনা বা মৃণালিনী ঘোষাল কি অরুণিমা সান্যাল, কাউকেই আমাদের সহযাত্রিণী বলে মনে হয় না—প্রেমের সামাজিক অস্তিত্বের চেয়ে বরং এক আত্মিক জগতের উপস্থিতি ঘোষণা করাই যেন তাদের লক্ষ্য বলে মনে হয়।

৫

সমাজ বাস্তবের দিকে জীবনানন্দ সচেতন হয়েছেন আরো অনেক পরে—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের পটভূমিতে—"চল্লিশের যুগে"। এই কবিতাগুলি মোটামুটি "সাতটি তারার তিমিরে" স্থান পেয়েছে। আর বক্তব্যের দিক থেকে

এই গ্রন্থই জীবনানন্দের উজ্জ্বলতম রচনা। অবশ্য সময়টাই ছিল তখন কবি সাহিত্যিকের পক্ষে সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ। চারদিকে জীবনের অজস্র অপচয় আর ধ্বংসে সমাজ-জীবনের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল; সদাচার, সুবিচার ইত্যাদি যে সব মৌল বিশ্বাসের উপর মানুষের সভ্যতা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়, তার ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে উঠেছিল। সে দুঃসময়ে আমাদের কবিদেরও তাই আত্মকেন্দ্রিক কবিতার দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল—কবিরা যে জাতির বিবেক—প্রমাণ মিলেছিল এই গর্বিত বিশ্বাসের।

'তিরিশের' কবিরা 'চল্লিশে' এসে নতুন মহিমা পেলেন। বুদ্ধদেব বসু থেকে জীবনানন্দ দাশ—কেউ বাদ গেলেন না।

তখন বাংলার গ্রাম-প্রান্তর নিয়ে কবিত্ব করে এসেছেন যিনি, তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করে দেখতে পান, দেড়শো বছরের বিদেশী শাসন ও শোষণে—

"বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল সূর্য অস্ত চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে? আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে? হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রাম একদিন আপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্য, পটলচেরা চোখের মানুষী হ'তে পেরেছিলো প্রায়; নিভে গেছে সব।"

(১৯৪৬-৪৭)

শহরে এসে দেখতে পান, সেখানে মানুষ—

"গৃহ নীড় নির্দেশ সকলি হারায়ে ফেলে ওরা
জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে;
জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে;
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।"

(এইসব দিনরাত্রি)

কিংবা দেখেন—

"স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে ছাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে

নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।"
(তিমিরহননের গান)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রাখেন—

"...জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে
পেতে হ'লে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হ'তো।" (পৃথিবীতে)

বলাই বাহুল্য, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস এসেছে প্রত্যক্ষ বাস্তবের অভিজ্ঞতায়, কিন্তু এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা দার্শনিক ভিত্তি তিনি পান নি। তাই জীবনের উপর আস্থা রাখা সত্ত্বেও তিনি নিকট ভবিষ্যতে উদ্ধারের কোনো উপায় দেখেন না, বলেন—

"ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়;
... ...
...সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন।
কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
(এই সব দিনরাত্রি)

কাজেই—

মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর। (যাত্রী)

এবং ইতিমধ্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে—

দীনতা: অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো।

অর্থাৎ sense of humanity-কেই জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ "পঞ্চাশের যুগে" জীবনানন্দ মানবিক বিশ্বাসটুকু বজায় রাখলেও ক্রমেই যেন অতীন্দ্রিয়তার দিকে মোড় নিলেন। বাস্তবের ব্যাখ্যা বা ঘটনার কার্যকারণ উপলব্ধি না করে Empirical হলে হয়তো এ পরিণতি অনিবার্যই। তাছাড়া প্রথম থেকেই বদলেয়র, ইয়েট্স, এলিঅট ইত্যাদির প্রভাব মেনে নিলেও, ইউরোপেই যে আজ এলুয়ার, আরাগঁ, নেরুদার নেতৃত্বে জীবননিষ্ঠ কাব্যের নতুন ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে, সেদিকে তিনি যথেষ্ট মনোযোগী হতে পারেন নি, এ-ও হয়তো তাঁর সীমাবদ্ধতার অন্য নিদর্শন।

রচনার দিক দিয়ে জীবনানন্দের সবচেয়ে বড় গুণ নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা। আর এ গুণ কবির প্রথম দিকের কবিতাগুলিতেই বেশি বর্তমান। "চল্লিশের যুগে" যখন তিনি পরিপার্শ্বের প্রভাবে বাস্তব জগতের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁর পূর্বতন ক্ষমতাকে তিনি নতুন উপলব্ধির মাটিতে পুনর্বসতি দিতে পারেন নি। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর অপূর্ব প্রয়াসে আমরা মুগ্ধ হয়েছি; কিন্তু সংহতির চর্চা তিনি কোনো দিনই সজ্ঞানে করেন নি বলে বেশির ভাগ গোটা কবিতাই একটি অখণ্ড সত্তার মতো একাগ্র হয়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। ব্যক্তিমনই ছিল তাঁর একক সহচর। ফলে নিছক চোখের দেখা ও কবিকল্পনার উপর নির্ভর করে যতদূর যাওয়া যায় প্রায় ততদূরই তিনি এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে-পথ কোনো স্থায়ী গন্তব্যে পৌছে দিতে পারে নি।

কিন্তু যদি তিনি নিজের ভাবনাচিন্তাকে আরো সচেতনভাবে সংগঠিত করতে পারতেন এবং তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকত, জীবনানন্দ দাশ হয়তো রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন মহৎ কবি হতেন। তার অভাবে তিনি হয়ে আছেন শুধু ক্ষমতাবান কবি - এক মহৎ সম্ভাবনার খণ্ডিত সিদ্ধি।

জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

সুইনবর্নের কবিতা প্রসঙ্গে এলিয়ট একবার বলেছিলেন যে কিছু কবি আছেন যাঁদের সমগ্র কবিতাবলী পাঠের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, অন্যপক্ষে কিছু কবি আছেন যাঁদের প্রায় প্রতিটি ছত্রই অনন্য।

সেই কবিরই প্রতিটি ছত্র অনন্য যে কবি নিজেকে অতিক্রমের প্রচেষ্টায় সতত নিরত—যে কবির যাত্রা ও যাত্রা শেষের মধ্যে অনেক উত্থান পতনের, অনেক দ্বন্দ্বের, সমন্বয়ের ইতিহাস। যেমন রবীন্দ্রনাথ। আশি বছরব্যাপী তৃপ্তিহীন বিকাশে, ছন্দের বৈচিত্র্যে, বক্তব্যের বিবর্তনে, নব নব দিগন্ত উন্মোচনে তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাস্তবিক যদি আমরা তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সমগ্রতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করি তাহলে মায়াত্মক সরলীকরণই লভ্য। অন্যপক্ষে যে কবি, যতই দক্ষ হোন, বিবর্তনে নয় একটি ভাবনায়, দ্বিধায়, বলাই বাহুল্য এক প্রকাশ-রীতিতে আবদ্ধ তাঁর সমগ্র কবিতাবলী পাঠ দুঃসম্ভব হয়ে পড়ে। একই আবহাওয়া, একই চিত্র ও চিত্রকল্প, একই ভাবনার পুনরাবৃত্তিতে মন ক্লান্ত হয়ে যায়; এমন কি কবির বিশিষ্ট প্রকাশরীতি ও ভাবনাও বার বার ব্যবহারে তাৎপর্য হারায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সব বড়ো কবির কবিতা জীবনেই দ্বন্দ্বময় অভিব্যক্তি থাকে, বিবর্তন থাকে।

কোনো কবি বা শিল্পীরই সম্পূর্ণ নিজস্ব বলে কিছু থাকে না। পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তায়, তাঁদের সঙ্গে তুলনায় ও বিচারেই তাঁর সার্থকতা। কাব্যঐতিহ্য বা দেশঐতিহ্যের পটভূমি ব্যতিরেকে কোনো কবির বিচার নিঃসন্দেহে অর্থহীন। স্বদেশ ও স্বকালের মানস-বৈশিষ্ট্যে, দেশজ ঐতিহ্য ও সভ্যতায় প্রত্যেক বড়ো কবিই তাঁর ব্যক্তি-মানস প্রস্তুত করেন। অতীত সচেতনতায় প্রত্যেক বড়ো কবিই বিশিষ্ট। বস্তুত, সারা কাব্যজীবনে এরই উন্নতি ঘটে বা ঘটা উচিত। অর্থাৎ কোনো শিল্পীর প্রগতি আত্ম-বিসর্জন, ব্যক্তিত্বের ক্রমনির্বাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কারণেই পরিণত কবির সঙ্গে অপরিণত কবির পার্থক্য ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে ধরা পড়ে না। তখন আমাদের খোঁজ নিতে হয় বিশেষ ও বিচিত্র অনুভূতিসমূহ কোন্ সমন্বয়ে কবিতায় ধৃত হয়েছে। বাস্তবিক আবেগের গভীরতায় নয়, এই সমন্বয় ও

মিলনের শৈল্পিক উপায়ই আমাদের লক্ষণীয়। এইজন্য কবির কাজ নতুন আবেগ সৃষ্টি নয়, তাঁর কাজ প্রচলিত আবেগকে কবিতায় আনা, বা আবেগ নয় তাকে আবেগে পরিণত করা। উপরন্তু, কবিতা আবেগ-বিহ্বলতা নয়, তার থেকে মুক্তি; ব্যক্তিত্বে জড়িয়ে পড়া নয়, তার থেকে বেরিয়ে আসা। অবশ্যই স্মর্তব্য এই উভয়ই তাঁর পক্ষে সম্ভব যাঁর ব্যক্তিত্ব ও আবেগ দুইই আছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে, সব বড়ো শিল্পের আবেগই নৈর্ব্যক্তিক; অবশ্য ছোট কবির হাতে প্রচলিত আবেগ, ঐতিহ্য সরল পথেই ব্যবহৃত হয়, বড়ো কবির হাতে এদের সমৃদ্ধি ঘটে।

কবিতা যেমন বিচ্ছিন্ন আবেগের সমষ্টি নয়, তেমনি কবিতার আলোচনায় বিচ্ছিন্ন চিত্র, চিত্রকল্প বা মুডের আলোচনা প্রয়োজনীয় হলেও, সব থেকে প্রয়োজনীয় এরা কোন্ সমন্বয়ে এসেছে তার বিচার। কবিতার সমগ্রতাতেই এদের যথার্থতা। বাস্তবিক সব বড়ো কবির কবিতাতেই চিত্রকল্পের ক্রমবিকাশ, নতুন অর্থ পাওয়া যায়। নচেৎ বিচ্ছিন্ন চিত্রের সৌন্দর্যে, চিত্রকল্পের নতুনত্বে মুগ্ধ হলেও কবিতা সমগ্রভাবে আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। কীটসের ওড্ টু এ নাইটিঙ্গেল একটি মহৎ কবিতা। তার কারণ এই নয় যে, এখানে শব্দ ও চিত্রগুলি একসময়েই অনুভূত ও দৃষ্ট হয়েছে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন চিত্র বা চিত্রকল্প, বা খুঁটিনাটির বর্ণনা এই কবিতার মহত্ত্বের মূল নয়। প্রকৃত কারণ "The ode, that is, has structure of a fine and complex organism" এবং এই অর্গ্যানিজম-এর অভাবে বিচ্ছিন্ন চিত্র ও চিত্রকল্পের চমৎকারিত্বেও শেলীর টু এ স্কাইলার্ক মহৎ কবিতা হতে পারল না।

১

জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতা প্রথম পাঠে অধিকাংশ কবিতা-পাঠককেই মুগ্ধ করে। এমন একটি মোহময় আবেশ জীবনানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন, তার ফলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য পাঠক আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এর কারণ বোধহয় তাঁর একটি বিশেষ বক্তব্য ও প্রকাশের হরগৌরী মিলন, এবং বক্তব্য প্রকাশের জন্য আবহাওয়া সৃষ্টির ক্ষমতা।

জীবনানন্দের কবিতা আমাদের কাছে এমন এক কবিকে এনে দেয় যিনি বাইরের সমাজ ও জগতের সঙ্গে স্ব-ব্যক্তিত্বের সমন্বয়-সাধনের অভাবে, জীবনের অর্থহীনতায়, অতীত জগতের প্রতি বেদনায় ক্লান্ত। এই ক্লান্তিকে প্রকাশ করার ব্যাপারে এমন এমন প্রকাশ-রীতির দ্বারস্থ জীবনানন্দ হয়েছেন যা আমাদের চেতনাতেও ক্লান্তির আবেশই জড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ দীর্ঘ ছন্দে, ভাঙা বা

শুদ্ধ পয়ারে, সাধুক্রিয়ার ব্যবহারে, ড্যাশ-এর প্রাচুর্যে জীবনানন্দ তাঁর অপরিসীম ক্লান্তি ব্যক্ত করেছেন, কখনও সুদূর ইতিহাসে, অথবা নির্জনতায়, কিংবা মৃত্যুতে আশ্রয় খুঁজেছেন। ফলে তাঁর কবিতা, কবিতার প্রয়োজনেই হয়তো, নিদারুণ শৈথিল্যে আক্রান্ত হয়েছে মাঝে মাঝে মনে হয় ক্লান্তিতে জীবনানন্দ তাঁর প্রকাশের প্রতিও উদাসীন থেকে গেছেন। বাস্তবিক যখন তিনি জীবনের আশার কথা, সম্ভাবনার কথাও বলেছেন তখনও তাঁর ছন্দে ক্লান্তিই বেজেছে। যদিও এই বক্তব্য ও প্রকাশ-রীতির অচ্ছেদ্যতায় (যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলে) জীবনানন্দ কবি হিসাবে স্মরণীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তথাপি প্রশ্ন ওঠে এইটুকু দক্ষতায় বদ্ধ হয়ে থাকাই কি বড়ো কবির অভীপ্সা ? যে সমন্বয়-সাধনের অভাব এর মূলে রয়েছে, তাতে কী আমাদের কবিত্বের অমরলোকে পৌছে দেওয়া কোনো কবির পক্ষে সম্ভব ?
বাস্তবিক জীবনানন্দ 'ঝরা পালক' থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যে উত্তরণ করলেন সেই উত্তরণেই তাঁর শেষ উত্তরণ। ধূসর পাণ্ডুলিপিই তাঁর এক হিসাবে, প্রথম ও শেষ কাব্যগ্রন্থ। এর পরে চমৎকার চমৎকার বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পে, চিত্রে জীবনানন্দ বার বার আমাদের মুগ্ধ করেছেন কিন্তু কোনো মৌলিক পরিবর্তন তাঁর কি বক্তব্যে কি ছন্দে আসে নি। উদাহরণে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

স্বপ্ন নয় - শান্তি নয়—কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে। (বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে—
ক্লান্ত হ'য়ে—শিশিরের মতো শব্দ ক'রে।
(নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা (সুরঞ্জনা : বনলতা সেন)

...আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে ; (সিন্ধুসারস : মহাপৃথিবী)

আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;

আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ; (আট বছর আগের একদিন : মহাপৃথিবী)

মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কি যে :
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।'
(জর্নাল : ১৩৪৬ : মহাপৃথিবী)

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি—ক্লান্তি ;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময় ; (উত্তরপ্রবেশ : সাতটি তারার তিমির)

…সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন ;
(আমাকে একটি কথা দাও : বেলা অবেলা কালবেলা)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূদয় থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যে কাব্য-ধারার আরম্ভ কবির শেষ জীবন পর্যন্ত সে ধারারই অনুসৃতি। বস্তুত, এই অপরিসীম ক্লান্তিই জীবনানন্দের কবিতার মূল কথা—নির্জনতা, মৃত্যুবোধ এই ক্লান্তির উৎস থেকেই এসেছে, পূর্বেই এ-কথা বলা হয়েছে। বাস্তবিক জীবনানন্দের কবিতাকে মনে হয় কোনো ক্লান্ত কবির স্বগতভাষণ। বলাই বাহুল্য জীবনানন্দ কবিতার ক্ষেত্রে অনুভূতি ও প্রেরণাকেই মূল্য দেন বেশি, ফলে আধুনিক কবির বুদ্ধিগত দিকটি তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। সে কারণে তাঁর ক্লান্তির স্বরূপও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়—প্রথম, সপ্তম ও অষ্টম উদ্ধৃতিত্রয় দ্রষ্টব্য। যেহেতু অভিজ্ঞতার কোনো বিবর্তন জীবনানন্দের কবিতায় আমরা দেখি না, বিচিত্র আবেগ বা আবেগ সম্মিলনও দুর্নিরীক্ষ্য সেহেতু প্রকাশের ক্ষেত্রেও কোনো বিবর্তন নেই। কারণ অভিজ্ঞতা ও প্রকাশ অবিচ্ছেদ্য। ভাঙা পয়ার বা শুদ্ধপয়ারেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বেশি। গদ্য কবিতা যে একেবারে লেখেন নি তা নয়, কিন্তু তা প্রায় ব্যতিক্রমের শামিল। 'হাওয়ার রাত' বা 'শিকার' কিংবা 'নগ্ন নির্জন হাত' লেখার পরও জীবনানন্দ লিখলেন 'আট বছর আগের একদিন'। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনানন্দ ছন্দের নিয়ন্ত্রণকে মানতে পারেন নি। ধূসর পাণ্ডুলিপিতে যে আবেশময়, প্রায় ক্ষেত্রেই অন্ত্যমিল যুক্ত (হয়তো অনিয়মিত)

—ক্লান্ত ছন্দের সন্ধান পেলেন সেই ছন্দকে অসীম মমতায় প্রায় কৃপণের মতোই আগলে নিয়ে চললেন।

বস্তুত, জীবনানন্দের ছন্দ বা প্রকাশ-রীতি যে একই ধারায় তাঁর সারা জীবন চলেছে তা উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকেই পাওয়া যায়। এমন কি যখন 'সময়ের কাছে' কিংবা 'সুচেতনা' লিখেছেন তখনও ছন্দের কোনো মৌলিক পরিবর্তন নেই। তার ফলে জীবনের জয়গান করলেও, আশার কথা বললেও, প্রকাশের মধ্যে জীবনানন্দের বিরোধ ধরা পড়ে; ধরা পড়ে—মাঝে মাঝে তাঁর অনুভূতিতে আশার আলো ঝলকালেও,—ক্লান্তি, নির্জনতা মৃত্যুবোধই তাঁর প্রধান কথা।

বধূ শুয়েছিলো পাশে —শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
(আট বছর আগের একদিন)

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে;
এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়। (সুচেতনা)

উভয় উদ্ধৃতির বক্তব্যগত পার্থক্য থাকলেও প্রকাশের কী কোনো মূলগত পার্থক্য আছে? বস্তুত, এই বক্তব্যগত দ্বিধা জীবনানন্দে আছে, কিন্তু প্রকাশ-রীতির বিবর্তনের অভাবেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে গেল জীবনানন্দের প্রথম ও শেষ কাব্যগ্রন্থ। এই বিবর্তনের অভাবের জন্যই, জীবনানন্দ এলিঅট-কথিত প্রথম শ্রেণীর কবিদের পর্যায়ে পড়েন।

২

পূর্বেই বলেছি কোনো কবিকেই বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা যায় না। জীবনানন্দকেও বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে স্থাপন করে দেখা উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদনের অলোকসামান্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের মানতে হবে যে, তিনি বাংলা ভাষা বা কবিতার সঠিক মর্মোদ্ঘাটনে ধৈর্যশীল হন নি। ছন্দকে প্রবহমান করে নিশ্চয়ই তিনি উত্তরসূরীদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছিলেন,

কিন্তু তাঁর ছন্দও বাংলায় প্রচলিত হয় নি; বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধ অমিত্রাক্ষর একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতিশোধেই পাওয়া গেছে। তাছাড়া, তাঁর মহাকাব্য রচনার প্রয়াস তৎকালীন বাংলার কোনো কোনো কবিকে আকর্ষণ করলেও, বিহারীলালই বাংলা কবিতার সুরকে ভিন্নমুখী করলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কাব্যরচনাতে বিহারীলাল-এর প্রভাব বা ছায়া সর্বজন-বিদিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোড়াতে বুঝেছিলেন, বিহারীলালের ভাবনিমগ্নতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কবিত্বের অমরলোকে পৌঁছবার পক্ষে বাধাস্বরূপ। বস্তুত, বিহারীলাল মধুসূদনের সমসাময়িক হয়েও কেন যে প্রকাশ রীতি সম্বন্ধে মাথা ঘামালেন না তা বোঝা মুশকিল। মধুসূদনের অসামান্যতা এখানেই যে তিনি বাংলা কবিতার রূপের আমূল পরিবর্তনের চেষ্টায় রত ছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত ধৈর্যের অভাবে তা শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই রয়ে গেল, সনেটের কথা স্মরণ রেখেও এ-কথা বলা চলে। তদুপরি বিষয়বস্তুর দিক থেকেও মধুসূদন খুব যে বিপ্লব ঘটালেন তাও নয়। কিন্তু বিহারীলাল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রথম আধুনিক বাঙালী কবি। বাস্তবিক ইংরেজি রোম্যান্টিক কবিদের মতনই বিষণ্ণতায়, সৌন্দর্যবোধে, বিহারীলাল বিশিষ্ট হলেন—কিন্তু সব কবিতাতেই যে প্রকাশ অন্যতম মূল কথা, সে কথা বিহারীলাল আদপে আমলে আনেন নি।

বিহারীলালের এই আধুনিকতা ও মধুসূদনের ক্লান্তিহীন রূপান্বেষা রবীন্দ্রনাথে এসে মিলিত হল। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়—তাঁর সমন্বয় প্রায় তাঁর একাকী প্রচেষ্টায়। এই প্রচেষ্টার ফলে আবেগের ও ব্যক্তিত্বের মুক্তিতে নব নব পূর্বাচলের দ্বার তিনি খুললেন। এবং আধুনিক বাঙালী কবিদের উত্তরাধিকার স্বরূপ তিনি দিলেন, ঐতিহ্যবোধ, ইন্‌ডিভিজুয়্যালিটি নয় পার্সোনালিটির মুক্তি, কবিতায় সংহতি ও বিস্তৃতি দ্বন্দ্ব, মানুষ ও মানব সমাজের প্রতি বিশ্বাস—জানালেন তৃপ্তিহীন দ্বন্দ্বময় বিবর্তনে সমন্বয়েই মহৎ কবির যথার্থতা।

জীবনানন্দের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই উত্তরাধিকার কিছুই বর্তায় নি। বস্তুত, জীবনানন্দের সঙ্গে আত্মীয়তা বিহারীলালেরই বেশি। আত্মমগ্নতা ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বগতোক্তিতে জীবনানন্দ বিহারীলালের সমগোত্রীয় (নিশ্চয়ই সমপর্যায়ী নন)। বিহারীলালের মতোই জীবনানন্দ তাঁর ব্যক্তিমানসের সঙ্গে এই জীবনের পারিপার্শ্বিক জগতের একটি অসেতুসম্ভব পার্থক্য চিরকালই অনুভব করেছেন—তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ব্যক্তিগত সুরে বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। অথচ পূর্বেই আমরা দেখেছি সব বড়ো শিল্পীর আবেগই নৈর্ব্যক্তিক।

কবিজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার জট খুলতে খুলতে সব বড়ো কবিই মুক্তি খোঁজেন তাঁর আবেগ থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, জীবনানন্দ যতটা না আধুনিক, তার থেকে বেশি রোম্যান্টিক। উনিশ শতকের ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের সঙ্গে আত্মীয়তা তাঁর ঘনিষ্ঠই—যদিও এই রোম্যান্টিকরা সত্য শিব সুন্দরে আস্থাশীল ছিলেন আর ক্লান্তিই জীবনানন্দের মূল কথা। কিন্তু চিত্রময়তায়, স্পর্শ চেতনায়, এ জগৎ থেকে মুক্তি খোঁজায় জীবনানন্দ প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেন কীট্‌নকে। কিন্তু সেই সঙ্গেই স্মরণীয় কীট্‌স-এর সমন্বয়ে জীবনানন্দ কোনোদিন আসতে পারেন নি; দ্বিতীয়ত, গঠনরীতির শৈথিল্য নয়, ক্লাসিক দৃঢ়তাই কীট্‌স-এর ওডগুলির বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়, রোম্যান্টিক হওয়া সত্ত্বেও ওয়ার্ডসওয়ার্থও ইন্‌ডিভিজুয়্যালিস্ট ছিলেন না, জীবনানন্দের মতন ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগকেই শুধু প্রকাশ করেন নি, তাঁর কবিতায় "The explicit social and moral preoccupation of his self communings in solitude" অবশ্য লক্ষণীয়, লক্ষণীয় তাঁর আবেগও শেষ পর্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকই।

এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দের দু-একটি উক্তি স্মরণীয়। "আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা খচিত—অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্ কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্ট হয় না - পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু।" (কবিতার কথা) এই প্রবন্ধেরই আরেক স্থলে বলেছেন "কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ।" বাস্তবিক জীবনানন্দের মনে এই ধরনের দ্বৈতভাব থাকার দরুনই কবিতা ও জীবনকে তিনি মেলাতে পারেন নি। প্রথম উক্তিটিতে জীবনানন্দের বক্তব্য প্রায় ভিক্টোরীয় শুচিবায়ুতে আক্রান্ত। তিনি এ-কথা বোঝেন নি যে, আধুনিক কবিতায় চিন্তা, ধারণা, মতবাদ মীমাংসা প্রকট হয়েই আসতে পারে, যদি তা আসে কবিতার নিয়মে। এলিঅট, যিনি একাধারে ঐতিহ্যে বিশ্বাস স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা এবং ভিক্টোরীয় ধারা ভেঙে ইংরেজি কবিতায় বিপ্লব আনার ধারক, তাঁর কবিতা পাঠেই এ-কথা ধরা পড়ে। স্মরণে রাখা দরকার "পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি" এই প্রকট ছত্রটিও কবিতা হিসাবেই বিবেচিত হয়।

আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, যখন দেখি রবীন্দ্রনাথে মহৎ শিক্ষা—দেশজ জীবন ও ঐতিহ্যেই কবিতা প্রাণ পাবে—জীবনানন্দ আদপে আমলে আনেন নি। আমাদের ধ্রুপদী বা লোক ঐতিহ্য কোনো তাৎপর্যই পেল না তাঁর মতো দক্ষ কবির হাতে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে রূপসী বাংলায় জীবনানন্দের প্রচেষ্টা কী? এ-কথা ঠিকই আমাদের রূপকথার, দেশজ জীবনের প্রতি অনুরাগ এই গ্রন্থের প্রায় কবিতায় আছে। কিন্তু দেশজ ঐতিহ্যে পুষ্ট হওয়ার অর্থ, বড়ো কবির আছে, ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধতর করা। কিন্তু এখানে জীবনানন্দের রোম্যান্টিক-সুলভ অতীত-বিধুরতাই কাজ করেছে বেশি। এখানে তাঁর মূল কথা—

.... কি যে হ'ল তার
কোথায় সে নিয়ে গেছে সঙ্গে ক'রে সেই নদী, ক্ষেত, মাঠ, ঘাস,
সেই দিন, সেই রাত্রি, সেই সব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত
সেই সব নোনা গাছ, করমচা, শামুক, গুগলি, কচি তালশাঁস,
সেই সব ভিজে ধুলো, বেলকুঁড়ি-ছাওয়া পথ—ধোঁয়াওঠা ভাত,
কোথায় গিয়েছে সব?

[রূপসী বাংলা—পৃঃ ৩৩ ষষ্ঠ সং ১৩৭৮]

এই হারানোর বেদনাই জীবনানন্দের রোম্যান্টিক কবিচিত্তে রূপসী বাংলায় বার বার অনুভব করা যায়। এই অতীতের দীর্ঘশ্বাসই তিনি শুনেছেন— "বউও উঠানে নেই—পড়ে আছে একখানা ঢেঁকি", "হে চিল, সোনালি চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে না কি প্রাণ?" তিনি মুক্তি খোঁজেন, বর্তমান ক্লান্তি থেকে, কল্পনায়, অতীতে অনুভব করেন "এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে" বা "এই ঘাস: সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়— ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চলে যায়।" বাস্তবিক এই অতীত-বিধুরতায়, এই প্রকৃতিতে, রূপকথায় মুক্তি খোঁজাতে জীবনানন্দের পুরাতন ছন্দ বেশি কার্যকরী হয়েছে--দীর্ঘ ছত্রে, আবহাওয়া সৃষ্টিতে তিনি আমাদের জন্যও একটি অতীত বেদনার সৃষ্টি করেন। কিন্তু কোথায় বর্তমানকালের পটভূমিকায় আমাদের দেশজ ঐতিহ্যকে, ধ্রুপদী ও লোক-সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে নতুন তাৎপর্যে আনা, আমাদের স্বকালের প্রতীকে পরিণত করা? এমন কি যখন তিনি বাংলার প্রকৃতির বর্ণনা দেন কিংবা লেখেন "বাসমতী চালে-ভেজা শাদা হাতখান, রাখো বুকে, হে কিশোরী, গোরোচনারূপে আমি করিব যে স্নান।" কিংবা "তবু যদি জ্যোৎস্নায় পেতে থাক কান শুনিবে বাতাসে শব্দ: "ঘোড়া

চ'ড়ে কই যাও হে রায় রায়ান" তখনও তাঁর ছন্দে, ক্লান্তি, তার থেকে মুক্তি ই'চ্ছাই বাজে। বাসমতী চালে-ভেজা শাদা হাতখান-এ জীবনানন্দ শুশ্রূষাই খুঁজেছেন।

৩

জীবনানন্দের কবি-খ্যাতি প্রধানত তাঁর চিত্ররূপময়তার জন্য। বাস্তবিক তাঁর কোনো চিত্রকল্প বা চিত্র বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের আশ্চর্য করে দেয়, মুগ্ধ করে। চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে ও'ঠে কোনো ছ'বি, ইঙ্গিতে ধরা দেয় জীবনানন্দের দক্ষ কবিত্ব। কিন্তু পূর্বেই বলেছি চিত্রকল্পের বা চিত্রের বি'চ্ছিন্ন চমৎকারিত্ব নয়, সমগ্র কবিতায় তাৎপর্যই তাদের মূল্য দেয়। কোনো চিত্র ও চিত্রকল্পের শেষ কাজ সমগ্র কবিতাকে মূল্যবান করা। কারণ কবিতার সমগ্রতার প্রভাবই আমাদের মনে থাকে, বিচ্ছিন্ন চিত্র ও চিত্রকল্প নয়। জীবনানন্দের অধিকাংশ দীর্ঘ কবিতাতেই একটি স্থায়ী চিন্তাকে প্রকাশ করার জন্য চিত্রকল্পের ক্রমোন্নতি বা তাকে প্রকাশ করার জন্য চিত্রকল্প সমন্বয় নেই। বাস্তবিক এলিঅট প্রমুখ আধুনিকদের মতো আধুনিক জট-জটিলতাকে ধরার জন্য কবিতায় অর্কেস্ট্রার পদ্ধতি গ্রহণ, চিন্তাকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ছন্দের একই কবিতায় ব্যবহার, বিভিন্ন চিত্র ও চিত্রকল্পের সমন্বয় জীবনানন্দের কবিতায় অলক্ষ্য। তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় আশ্চর্য সুন্দর কয়েকটি চিত্র—যাদের শেষমূল্য কবিতায় সমন্বিত হয় না। বাস্তবিক এই কারণেই অসামান্য চিত্র সৃষ্টি সত্ত্বেও জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতাগুলি সার্থক হতে পারে নি—অনেকগুলি বিবৃতির পর্যায়ে পড়েছে (বিশেষত সাতটি তারার তিমির ও বেলা অবেলা কালবেলায়)। যেহেতু প্রেরণা বা অনুভূতির ওপরই জীবনানন্দ একান্তরূপে নির্ভরশীল সেহেতু তাঁর কবিতায় (দীর্ঘ কবিতায় বলাই বাহুল্য প্রকট) সুনিয়ন্ত্রিত ভাবনা ও তার প্রকাশও অল্প। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক "রাত্রি" নামক কবিতাটিকে। কবিতার প্রথমে "হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল" বা "একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে অস্থির পেট্রল ঝেড়ে;" প্রভৃতি ছত্র আমাদের মনকে একটি তারে বাঁধে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকে এসে "তিনটি রিকশ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে মায়াবীর মতো জাদুবলে"—এই ছত্রে মায়াবী ও জাদুবল শব্দ দুটিতে আবহাওয়াটি অনেকটি নষ্ট হল। আবার দেখি আশ্চর্য তুলনা "চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।" কিন্তু এই আবহাওয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় চতুর্থ স্তবকে—যখন তিনি বলেন,

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।

শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

বাস্তবিক এই স্তবকের পরে "গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী" অথবা "ফিরিঙ্গ যুবক ক'টি চলে যায় ছিমছাম" এবং শেষে "নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো" প্রভৃতি ছত্র কোনো অর্থই পায় না।

শুধু এখানেই নয়, জীবনানন্দের কবিমানসের দ্বন্দ্বের জন্যও তাঁর কবিতা প্রায় দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে অনির্দেশ্য কারণে অপরিসীম ক্লান্তি, তার থেকে উত্থিত নির্জনতা, অতীত-বিধুরতা, মৃত্যুবোধ, অন্যদিকে পৃথিবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা—এই উভয় আকর্ষণকে জীবনানন্দ কোনোদিনই মেলাতে পারেন নি। পারেন নি বলেই, তাঁর বড়ো কবিতাগুলি প্রায়ই অসার্থক। এই দ্বিধার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আট বছর আগের একদিন। তা ছাড়া স্মরণে রাখা দরকার জীবনানন্দের অনুভূতিতে যে ছবি এসেছে, তাকে কবিতায় রূপ দিতে গিয়ে জীবনানন্দ অনেক সময়ই দূর কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। উপমা বা ছবি বা চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয় কবির বক্তব্যকে স্পষ্ট করার তাগিদে, কোনো ছবিকে পাঠকের চোখের ও মনের সামনে চকিতে হাজির করার প্রচেষ্টায়। কিন্তু—

অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা ;
জ্যোৎস্না রাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ।—

এই অংশে কিছুটা কি কষ্টকল্পনা পাওয়া যায় না। কিংবা "নগ্ন নির্জন হাত"-এর শেষ অংশে "অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা, লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ", "হরিণ ও সিংহের ধূসর পাণ্ডুলিপি, রামধনু, কাঁচের জানালা, ময়ূরের পেখমের মতো পর্দা, তার আগে মেহগনির ছায়াঘন পল্লব, কমলা রঙের রোদ," শেষে "পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ" প্রভৃতির বিস্তৃত আয়োজনে ছবির আবহাওয়াটি নষ্ট হয়ে গেছে, পাঠক একের পর এক কল্পনার চাপ অনুভব করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই শেষে "তোমার নগ্ন নির্জন হাত" কোনো শিহরণই সৃষ্টি করে না। বস্তুত, এই কারণে জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতা নয়, হ্রস্ব কবিতাগুলিই সার্থকতা পায়—বনলতা সেন, হায় চিল, সুবিনয় মুস্তফী, ঘোড়া, কিংবা কমলালেবু, এবং আরও কিছু কবিতার জন্য নিশ্চয়ই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব জীবনানন্দের কাছে। কৃতজ্ঞ থাকব বেশ কিছু আশ্চর্য ছবি ও ছত্রের জন্য, রূপসী বাংলায় বাংলার গ্রামপ্রকৃতির স্পর্শ ও চিত্রময় বর্ণনার জন্য।

এখানে একটি কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় তাঁর কাব্যজীবনের একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, পরিবর্তনের শুরু 'সাতটি তারার তিমির' থেকেই। স্মরণীয় বেলা অবেলা কালবেলা, সাতটি তারার তিমির-এরই সমকালীন ও কিছু পরবর্তীকালের রচনা। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বেলা অবেলা কালবেলাই প্রমাণ করে জীবনানন্দ কী গভীরভাবে একটি প্রকাশ-রীতি ও ভাবনায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন, নিজ ব্যক্তিত্বে ও আবেগে মগ্ন হয়েছিলেন। কারণ এ কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দের অসামান্য দক্ষ কবিত্বও অনুপস্থিত—অনেক স্থলেই কবিতার স্থানে বিবৃতি। বস্তুত, এই কবিতাগ্রন্থ জীবনানন্দের গোঁড়া ভক্তকেও খুশি করতে পারবে না।

জীবনানন্দের কাব্যে সাংগীতিক মূল্য

শৈলেশ ভড়

আমাদের বাংলাদেশে সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আদিযুগ থেকে এর দুটি ধারা প্রবহমান। একটি ধারা বয়ে চলেছে রাজদরবারে অথবা শহরের বর্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে। যাকে আমরা বলি উচ্চাঙ্গ সংগীত। আর অপর ধারাটি বয়ে চলেছে গ্রামের মধ্য দিয়ে গ্রামান্তরে যাকে আমরা বর্তমানে বলি লোকসংগীত।

উচ্চাঙ্গ-সংগীতের কদর ছিল শহরের ঘরে ঘরে। এই গান যাঁরা গাইতেন তাঁরা ওস্তাদ নামে খ্যাত হতেন। আদর পেতেন শহরের সংগীতপ্রিয়দের কাছে। লোকসংগীত ছিল অবহেলিত। গ্রামের আউল-বাউল, কীর্তনিয়া, চাষীদের মধ্যে ছিল এদের অনুশীলন। সহজ সরল ভাষায় এত বড় তত্ত্বকথা আর কোথাও শোনা যেত না। উচ্চাঙ্গ-সংগীতের ভাষা ছিল হিন্দি যার মধ্যে কোনো গভীরতত্ত্ব কিছু ছিল না। বাদ্যযন্ত্রের মতো কণ্ঠযন্ত্র পরিবেশিত হত।

এমন সময় এলেন রবীন্দ্রনাথ। উচ্চাঙ্গ-সংগীত ও লোকসংগীত থেকে সুর নিয়ে অসংখ্য গান রচনা করলেন। বলা বাহুল্য তখন থেকে লোকসংগীতের আদর শহরেও বাড়তে লাগল। একদিন যা ছিল অবহেলিত আজ তাই হল আদরণীয়। পল্লীসংগীতের যথার্থ মূল্য দিতে শিখল সংগীত শ্রোতারা। বোঝা গেল কাব্য মানেই সংগীত। অর্থাৎ সব কবিতাই সুরসংযোগে সংগীতের মতো পরিবেশিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের আগেও এমন একটি যুগ ছিল বই কি। তখন সব কবিতাই সুরে গীত হত। আরো একটু ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে—তৎকালীন কবিতায় সুর প্রয়োগের অবকাশ ছিল প্রচুর। কবিরাই তাঁদের কবিতায় সুর দিয়ে পাঠ করতেন। এখনও অনেক হিন্দি কবিকে এইভাবে সুর করে আবৃত্তি করতে শোনা যায়। তুলসীদাসের রামায়ণও অনেকে সুর করে পড়েন। অন্তত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৈষ্ণব পদাবলী এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এর কাব্যরস যাই থাক, সুর বাদ দিয়ে যে রসের সৃষ্টি হয় তাতে শ্রবণ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু মন ভরে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যেতে পারে যে যে-পাখির ধর্ম উড়ে চলা তাকে মাটিতে হাঁটালে দৃষ্টিশোভন হয় না।

অর্থাৎ পদাবলী কেবল আবৃত্তি করলে যতখানি ভালো লাগবে তার অনেক বেশি ভালো লাগবে যদি স্বরসংযোগে সংগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করা যায়। বিশেষ করে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের পদগুলি সংগীতসমৃদ্ধ। শুধু পদাবলী কেন মঙ্গলকাব্যও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি আজও স্বরসংযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে কাব্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তখনই যখন স্বরযোগে গীত হয়।

তবে সব কবিতাই গান হতে পারে না। যেমন গীতাঞ্জলির সব কবিতা সংগীতসমৃদ্ধ নয়। একথা রবীন্দ্রনাথই বলেছেন। আবার শেষ জীবনে তিনি একথাও বলেছেন 'তোমরা কি মনে কর 'লিপিকা' সুরে গাওয়া যায় না।' অর্থাৎ বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো তাও চেষ্টা করতেন।

যাই হোক, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কবিদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে গেছে। যাঁরা কবি তাঁরা তাঁদের রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মারফত প্রকাশ করে থাকেন। আর যাঁরা গীতিকার তাঁদের রচনা বেতার, রেকর্ড ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে থাকে।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে কবি যেখানে গীতিকার হবার চেষ্টা করেছেন অথবা গীতিকার যখন কবির আসনের প্রতি হাত বাড়িয়েছেন সেখানেই তাঁরা বিফল হয়েছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে এও দেখা গেছে যে মাইকেল মধুসূদনের কবিতা বা সত্যেন্দ্র দত্তের দু-একটি কবিতা নিয়ে সুরকাররা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কিন্তু সাফল্য তাতে খুব একটা মেলে নি। বর্তমান যুগে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় দু-একটি সুর দেওয়া হয়েছে বটে, সাফল্যও বেশ কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তারপর? তারপর আর কেউ মাথা ঘামায় না এ নিয়ে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতাগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। এবং এতে সুরের অবকাশ যথেষ্ট আছে। যদি কোনো সুরকার চেষ্টা করেন তাহলে সফল হতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি। অন্তত পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী? তবে এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে রেকর্ডমালিক, বেতারকর্তৃপক্ষ অথবা চলচ্চিত্র প্রযোজকদের। কারণ প্রচারের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা। বর্তমান যুগে এই তিনটিই প্রচারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

সুরকারদের বক্তব্য এই যে দুটি বা তিনটি যুক্তাক্ষর বর্জিত শব্দ দিয়ে কবিতা রচিত হলে তাতে সুর প্রয়োগের অনেক অবকাশ আছে। ছন্দে বৈচিত্র্য আনাও

সম্ভব হয় এবং সংগীতের মধ্যে নাটকীয়তা—আধুনিক গানে যা সব থেকে বেশি প্রয়োজন—প্রকাশের সুবিধা থাকে।

তা ছাড়া বর্তমানে সুরকাররা মনে মনে একটা সুর আগে থেকে তৈরি করে রাখেন। পরে সেই সুরে গীতিকাররা কথা বসিয়ে দেন। এই হচ্ছে অধুনা রীতি। মনে হয় এইভাবে দু-একটি গান ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করার পরে এটা প্রচলিত হয়ে গেছে। জীবনানন্দের কবিতায় সে সুযোগ নেই বললেই চলে। সুরের প্রয়োজনে গীতিকার কথার পরিবর্তন করতে পারেন। রবীন্দ্র-নাথের অনেক গানে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু জীবনানন্দ আজ আমাদের মধ্যে নেই এবং তাঁর কবিতার কথা বদলানো, তা সে যে কারণেই হোক, সম্ভব নয়, শোভনও নয়, উচিতও নয়।

তাই নামী সুরকারেরা জীবনানন্দের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে চান না বলেই মনে হয়। অথচ নবীন সুরকারকে দিয়ে সংগীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা বা তার মূল্য যাচাই করা বর্তমানে সম্ভব নয়।

সাংগীতিক মূল্য যাচাই করতে হলে আগে দেখতে হবে তার বাক্যাংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা। সেদিক থেকে জীবনানন্দের কবিতা নিঃসংশয়ে উত্তীর্ণ। তবে কবিতাগুলি এত বড় যে পরিবেশন করতে অনেক সময় লাগে। 'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল' বা 'ধানকাটা হয়ে গেছে' অথবা 'আমাকে সে গিয়েছিল ডেকে' কবিতাগুলি গানের উপযুক্ত। সুর প্রয়োগের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

মোটকথা জীবনানন্দের কাব্যে সাংগীতিক মূল্য ছোট ছোট কবিতার মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। এবং তা সংখ্যায় অল্প হলেও এমন একদিন আসবে যেদিন জীবনানন্দের গান সংগীত জগতে স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। অবশ্য তাঁর সংগীতে ব্যবসায়িক সাফল্য কেমন হবে সে কথা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। তবে নবীন ও প্রবীণ শিল্পী ও সুরকাররা সহযোগিতা করলে জীবনানন্দের গান সংগীত-ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারবে বলে আশা আছে। বাংলার সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে কবি জীবনানন্দের নামও যুক্ত থাকুক এই কামনাই আমরা করি সর্বান্তঃকরণে।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যে প্রকৃতি

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সকলেই কবি নয়, তবে অনেকেই কবি। এই অনেকের মধ্যে যারা কবিতার আস্বাদ হয়তো গ্রহণ করতে অক্ষম তারাও কবি। প্রকৃতি যে অকৃপণ হাতে তার রূপের কাব্য ছড়িয়েছে, মনে-প্রাণে এরা অনেকেই তা গ্রহণ করে। সে রূপের মাধুর্য হয়তো প্রকাশের অক্ষমতায় এদের বুকের মাঝে গুমরে মরে। প্রেম-প্রীতি, রূপ-রস-গন্ধ এরা উপলব্ধি করে, সে সবই আঘাত করে চেতনার তন্ত্রীতে, কিন্তু তা মূক। তবু তারা কবি। কাব্য-চেতনা হয়তো বা সবার সমান নয়—পার্থক্যও হয়তো উপলব্ধিতেও। কিন্তু যার উপলব্ধি এবং প্রকাশের ক্ষমতা তীব্র তাকে কাব্য-জগতের বিশিষ্ট আসনে বসাতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই না। কারণ Auden-এর কথায়: His gift knew what he was.

কাব্যে প্রকৃতির মিশ্রণ অঙ্গাঙ্গী। সম্পূরকও বলা যেতে পারে। 'প্রকৃতির কাব্য' বা 'কাব্যের প্রকৃতি' এক নয়। খুব স্বাভাবিক নিয়মে সাবলীল গতিতে যে কাব্য অহর্নিশি প্রকৃতির বুকে জন্ম নিচ্ছে সে কাব্য প্রকৃতির, কিন্তু কাব্যের মধ্যে প্রকৃতিকে তুলে এনে তাকে প্রকৃত 'প্রকৃতি'-রূপে চিহ্নিতকরণই কাব্যের প্রকৃতি। এখানে আর একটি কথা ওঠে। সেটা সৌন্দর্যের কথা। মাটির বুকে যার সাবলীল প্রকাশ, চন্দ্র-সূর্য-তারা ইত্যাদির প্রাত্যহিক প্রকাশে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় তা ঠিক ঠিক কাব্যে ধৃত হয় কিনা! হয়তো সকলের কাব্যে ধরা পড়ে না—হয়তো অনেকের কাব্যেই তার যথাযথ প্রকাশ। এই যথাযথ প্রকাশের কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ দাশকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে বসানো যেতে পারে। কারণ পূর্বোদ্ধৃত সেই Auden-এর ভাষায়: His gift knew what he was.

জীবনানন্দ দাশ কবি। প্রকৃতির কবি। সাম্প্রতিক কালে এমন করে প্রকৃতি আর কারো কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে নি। গ্রামবাংলার সৌন্দর্যে লীন জীবনানন্দের কবিসত্তা। পল্লী পরিবেশের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না তাঁর কাব্যে উচ্চকিত। বাঙ্ময় তিনি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে জীবনানন্দ দাশ নামক ব্যক্তিসত্তাটি কবিতার সত্তায় সম্পৃক্ত। রবীন্দ্র-পরবর্তী অনেক কবিই কাব্যজগতে বিভিন্নরূপে সাফল্যলাভ করেছেন কিন্তু প্রাকৃতিক মনোভঙ্গির

একাগ্র সাধনায় জীবনানন্দ একক এবং অনন্য। তাঁর বিভিন্ন কাব্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি এঁকেছেন পাকা শিল্পীর মতো। 'হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে—দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে,' অথবা 'সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে-আলোক জোনাকির দেহ হতে—,' অথবা 'আকাশের রং ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল,' অথবা 'হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রং-এর সূর্যের নরম শরীর' প্রভৃতি অজস্র উদাহরণে আমার এ বক্তব্য সমর্থিত হবে। ভোরের কচি ঘাসকে তিনি শুধু সবুজই দেখেন নি—অপূর্ব উপমা-ব্যঞ্জনায় অনন্য করেছেন। সে সবুজ কাঁচা বাতাবী লেবুর গায়ের সবুজ। অভূতপূর্ব ঘ্রাণ পেয়েছেন কবি সে সবুজের। গেলাসে ভরে মদের মতো পান করতে ইচ্ছে হয় সেই ঘাসের ঘ্রাণ। শুধুমাত্র পানের ইচ্ছে জাগিয়ে ক্ষান্ত হন নি কবি, জন্ম নিতে চান ঘাস-মাতার কোলে ঘাস হয়ে। এ ছবির তুলনা নেই। সবুজকে মনে-প্রাণে ভালোবেসে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে রক্তমাখা মনের ক্ষতের উপর সবুজের প্রলেপ দেওয়া যে কবির সাবলীল ইচ্ছে—তিনি মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়েও বলতে পারেন :

কি বুঝিতে চাই আর? রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

[মৃত্যুর আগে : ধূসর পাণ্ডুলিপি]

জীবনানন্দের কবিতায় বিচিত্র স্বাদ এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে দৃষ্ট হয় একটি বিশেষ ভাবলক্ষণ—যেটি তিনি সযত্নে সংগ্রহ করেছেন জীবজন্তু এবং গাছপালার জগৎ থেকে। সেখানে আছে গাংশালিখের ঝাঁক, গঙ্গাফড়িঙের নীড়, কাঁচ পোকা, প্রজাপতি, শ্যামাপোকা, শঙ্খচিল, হাঁস, মাছরাঙা প্রভৃতি অজস্র জীবন এবং হিজল, কলমী, জাম, বট, কাঁঠাল, জামরুল, অশ্বত্থ, ফণীমনসা প্রভৃতি নামের অজস্র গাছপালা লতাগুল্ম। বাংলাদেশের প্রতিটি পশুপাখি জীবজন্তু বৃক্ষলতার উপর কবির যে মমত্ববোধ, তা কাটিয়ে তিনি কোথাও যেতে চান না। তিনি এই বাংলাদেশের প্রকৃতির ছবির উপর দৃষ্টি রেখে আমৃত্যু কাটাবেন—এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। দুচোখ ভ'রে নেবেন বাংলাদেশের সবুজ রূপ। তিনি দেখবেন, ভোরের বাতাসে কাঁঠাল পাতা ঝরা, শালিখের খয়েরী ডানার প্রতি হিজল গাছের ইশারা। তিনি বাংলাদেশের মুখ দেখেছেন—সে মুখ প্রকৃতির :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে

ভোরের দোয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের ক'রে আছে চুপ ;

[রূপসী বাংলা]

অন্তরঙ্গ রূপকল্পে, অপূর্ব উপমা-ব্যঞ্জনায় এবং ছন্দের সারল্যে জীবনানন্দ কাব্যক্ষেত্রে প্রকৃতির যে নতুন স্বাদ নিয়ে এলেন এক সময়ে তা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।১. 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে'

২. 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'
৩. 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে'
৪. 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'
৫. 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'
৬. 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ'
৭. 'কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত'
৮. 'ক্ষীরের মতো ফুল'
৯. 'মশারিটা ফুলে উঠছে কখনো মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো'

ইত্যাদি বহু শ্রাবস্তীর কারুকার্যময় পঙ্‌ক্তি জীবনানন্দের কবিতায় ভাস্বর। কল্পনার সাবলীল গতি তার নতুন পথে চলেছে যেন উপমা-ধ্বনি-সংলগ্নতারূপী মণি-মাণিক্য আহরণ করতে করতে। এ কবিতা যেন আমাদের বহু-চেনা বহু-দেখা এক জগতে নিয়ে যায়। সাক্ষীরূপে দেখতে পাই প্রকৃতি ও কবিতার একাত্মতা। কবি এখানে সার্থক।

কবি-জীবনের প্রথম বেশ কিছুকাল কেটেছে গ্রামবাংলায়। পল্লীজীবনের খুঁটিনাটি কবি-মনে এমন গভীরভাবে রেখা টেনেছিল যা আমৃত্যু মুছে যায় নি। পরিণত-কাব্যেও ইট-কাঠ-পাথরের অপরিস্ফুট ছায়াপাত ঘটলেও সে কাব্য নিজেকে চিনে নিয়েছিল 'তনুবাত নীলিমার নিচে'। অনুভূত হয়েছে মানব জন্মের সাফল্য সম্বন্ধে :

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখনো এসেছি,
না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;

[সুচেতনা : বনলতা সেন]

যদি মৃত্যু আসে, বাংলার বুক থেকে যদি কালের নির্মম নিয়ম কবিকে ছিনিয়ে

নিয়ে যায় বাধা নেই। কারণ মৃত্যুর সে ইঙ্গিতে নক্ষত্র ঝরে, মৃত্যুও পরম রমণীয় হয়ে ওঠে :

··· তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা-যমুনার নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে ; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

[রূপসী বাংলা]

বাংলাকে ভালোবেসে তার সৌন্দর্যকে কবি অন্তরে এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে, সে ভালোবাসা মৃত্যুর মধ্যেও আভাসিত হয়েছে কবির মনে। এই সুদৃঢ় উপলব্ধিই কবিকে চিরস্মরণীয় করেছে।

জীবনানন্দ

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জন্মভূমিকে মাতৃ-সম্বোধন করেছেন; তাঁর এই ভক্তি শাক্তের ভক্তি। কবি জীবনানন্দ বৈষ্ণবের কান্তা-প্রেমে 'রূপসী বাংলা'-র দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শস্যশ্যামলা'-কে তিনি নাম দিয়েছেন 'বনলতা'। সেন সম্রাটদের সেই রাজলক্ষ্মীকে তিনি উপাধি দিয়েছেন 'সেন'। পঞ্চ-গৌড়ের সব সুষমায় এই তিলোত্তমার রূপ ধ্যান করেছেন: অযোধ্যার গৌড়ের 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' তার মুখে; অন্য গৌড় 'বিদিশার নিশা' তার কেশদামে; গোদাবরী-গৌড় বিদর্ভ কিংবা ব্রহ্মপুত্র-গৌড় বিদর্ভ,—এই দুই বিদর্ভ জুড়েই সে রয়েছে; বিম্বিসারের ধূসর গিরিব্রজ-রাজগৃহে সে ছিল; এমন কি সুবা বাংলায় রানী ভবানীর নাটোরেও এই রূপসী বাংলা 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে' কুশল প্রশ্ন করেছে। বাঙালী আজ 'ক্লান্তপ্রাণ' গৃহগত, কিন্তু তার সপ্তডিঙা মধুকর একদিন 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে' ঘুরে বেড়িয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'শস্যশ্যামলাং' এবং জীবনানন্দের 'বনলতা'-র মধ্যে একটি চেলাঞ্চল-গ্রন্থির মতো রয়েছে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ'-ধ্যান। দীনেশচন্দ্র দেখেছেন— এই মাগধী প্রাকৃত, এই গিরিব্রজবুলি বা ব্রজবুলির আবহ যতদূর ব্যাপ্ত ঠিক ততখানিই এই বৃহৎবঙ্গের বিগ্রহ। এই মাগধী প্রাকৃত ক্রমে অহমিয়া, বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী, অবধী, বঘেলী, ছত্তিশগড়ী ভাষায় বিবর্তিত হয়েছে, বিচিত্র হয়েছে। আবার এই সব বৈচিত্র্যকে সমন্বিত ক'রে দরবারী ব্রজবুলির চর্চাও হয়েছে। দীনেশচন্দ্র আরও দেখেছেন,—গৌরাঙ্গ গুণনিধি মণিপুর থেকে পুরী পর্যন্ত এই অন্তরঙ্গ পরিধিকে অবশেষে 'বৃহত্তর নবদ্বীপে' পরিণত করেছেন।

১৯৫৪ সালের সংকলন 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক এক অঙ্কের শ্রেষ্ঠ বাংলা বই বিবেচিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। এই সংকলনের মূল্য অন্যদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কবি স্বয়ং জানিয়েছেন যে,

এই নির্বাচনে বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি।' নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত কবির 'বনলতা সেন' কাব্য গ্রন্থ থেকে বারোটি কবিতা 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থের যে বারোটি কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন-ভুক্ত হয়েছে,' সেগুলিকে শ্রেষ্ঠের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ মানতে বাধা নেই। কবি জীবনানন্দের জীবন-দর্শনের পরিচয় প্রথমত এর মধ্য থেকেই অনুসন্ধান করছি এবং এই অনুসন্ধানে কবির নির্দেশটি স্মরণ করছি: 'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়'। এই পরিচয়ের জন্য তাঁর 'জীবনী পঞ্জী'র একটি কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়: কবি আবাল্য 'প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে পিতার উপনিষদ আবৃত্তি এবং মায়ের গান শুনতেন'।

'আমি অনেক দিন—অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে .
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে
বুঝতে পেরেছি আবার;

'অন্ধকার' কবিতার একটি অংশ উদ্ধৃত হল। 'আমি অনেক দিন' 'অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' 'নিজেকে পৃথিবীর ব'লে বুঝতে পেরেছি আবার'। আমি এক জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নির্জীব জড়ের মূঢ়তায় নিজেকে মগ্ন রেখে উদ্বর্তনের মধ্য দিয়ে জীব জগতের অগণিত প্রাণে আবার ফুটে উঠেছি। উদ্বর্তন সেখানে থেমে নেই; তাই মননশীল প্রাণী মানুষের স্তরে আমিই উচিয়ে উঠেছি; এই উদ্বর্তন 'মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছে'। এই উদ্বর্তন জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে উন্নীত হয়েই থামতে চায় না; সে আমাকে আরো উর্ধ্বের দেব-মানব স্তরে উত্তীর্ণ করতে চায়, আবার জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম-স্বরূপে ফিরিয়ে নিতে চায়। আজ সৃষ্টির মধ্যে 'শত-শত শূকরের চিৎকার' এবং 'শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর' মাত্র মনে হলেও উদ্বর্তনের সেই পরিণামকে ঠেকানো যাবে না; বরং সেই পরিণামের জন্যই 'এই সব ভয়াবহ আরতি'। উদ্বর্তন আমাদের জাগাতে চাচ্ছে, কিন্তু দেহের ধর্ম সহজে তাতে সাড়া দিতে পারছে না, তাই জিজ্ঞাসা:

'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,

হে হিম হাওয়া,

আমাকে জাগাতে চাও কেন?'

এই দেহের প্রথম প্রাপ্তিই প্রাণ; বাঁচা ও বাড়ায় সে সক্রিয়। তার সেই আদিরস-মূর্তিকে 'সুরঞ্জনা' নামে ডাকতে বাধা নেই। জীবনানন্দ সেই নামেই তাকে ডেকেছেন এবং মানুষের অন্তর্গত এই প্রাণের তাড়াকে ইতিহাসের মধ্যে সঞ্চারিত দেখেছেন :

'যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে;'

কিন্তু 'গ্রীক হিন্দু ফিনিসিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন' প্রাণশক্তিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে 'তিলোত্তমা নগরীর' মানস-লোকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে হারিয়ে গেছে। কোনো অপার্থিব কল্পলোক নয়, এই পৃথিবীর হাঁটা পথে সভ্যতা থেকে সভ্যতায়, প্রাণ-প্রবাহ চলবে। মানুষের মননশক্তি তাকে স্বর্গীয় আকাশ-নগরী দেখিয়ে ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু সিন্ধুবাদ নাবিকের মতো এই পদাতিক প্রাণকে পৃথিবীর পথেই হাঁটাতে গেলে এই ব্যর্থতা ঘটত না, অন্ধ প্রাণটাও খণ্ড মনের সদ্ব্যবহারে লাগত। যা হওয়া উচিত, সব সময় তা হয় না; বরং প্রাণপ্রবাহকে দুঃখের কারণ বললেন বুদ্ধদেব, ধর্মাশোক এবং মহেন্দ্র। কিন্তু প্রাণশক্তি একটা সুরঞ্জনা ইচ্ছা এবং

'সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।'

দেহের প্রথম প্রাপ্তি এই প্রাণকে 'পৃথিবীর বয়সিনী' বলতে বাধা নেই। 'আকাশ-লীনা' কবিতায় এই প্রাণময়ী সুরঞ্জনাকে একটা দোটানার মধ্যে কবি দেখেছেন। জড়শায়ী প্রাণ জড়ের টান অনুভব করছে, আবার সচল চঞ্চল হয়ে কোনো পুরুষের অনুগমন করছে। সুরঞ্জনা সব সময়ই শুনতে পায় :

'ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।'

'সুরঞ্জনা' যেমন প্রাণময়ী; 'সবিতা' তেমনি মনোময়ী। 'মনুষ্য জন্ম আমরা পেয়েছি' বলেই প্রাণের অতিরিক্ত এই মনোময়ীর আলিঙ্গন পেয়েছি। 'বসন্তের রাতে' এই মনোময়ী ছিন্ন মূল কল্পলোকে পাড়ি জমাতে পারে বটে; কিন্তু ইতিহাসের মধ্যেও মনের গুঞ্জন তখন সম্ভব। ইতিহাসের মধ্যে নিছক প্রাণের যে গুঞ্জন তা লুব্ধ 'মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো'। কিন্তু মনের গুঞ্জন তাতে যুক্ত হলে ইতিহাসকে সার্থকতার পথে, উৎকর্ষতার মধ্যে তুলে ধরতে পারে। এই জন্যই ইতিহাসে দেখি:

'মধ্যযুগের অবসান
স্থির ক'রে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খ্রীষ্টান।'

মানুষের মধ্যে আরো উর্ধ্বের শক্তিও ক্রিয়াশীল, সেই পরম চেতনার অবতরণ ঘটলে মানুষের দিব্যজীবন লাভ হবে; ইতিহাসও তার শেষ মোড় ঘুরবে। এই বিশ্বাসেই কবি বলেন:

'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে— এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।'

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'অন্ধকার', 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা' ও 'সুচেতনা' যথাক্রমে জড়দেহগত অচেতনা, প্রাণগত অবচেতনা, মনোগত চেতনা এবং অতিমানস চেতনা। 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে এরাই আবার নামরূপে চরিত্রায়িত হয়েছেন: 'শব' কবিতায় জড়শায়ী অচেতনা 'মৃণালিনী ঘোষাল', 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় প্রাণময়ী অবচেতনা 'বনলতা সেন' (বনলতা এখানে আর রূপসী বাংলা নন, তিনি এখানে নিখিল প্রাণের অবচেতনা), 'বুনো হাঁস' কবিতায় মনোময়ী চেতনা 'অরুণিমা সান্যাল' এবং 'শঙ্খমালা' কবিতায় অতিমানস চেতনা 'শঙ্খমালা' দেবী হয়েছেন।

অচেতনা, অবচেতনা, চেতনা, সুচেতনা,—এইসব চৈতন্যের পরম্পরাকে কবি জীবনানন্দ নামরূপে মূর্তিমতী ক'রে একটা অভিনব কাণ্ড করেছেন, এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই (১৩৩৫ বঙ্গাব্দে) মহুয়া কাব্য গ্রন্থে 'নাম্নী কবিতা-

গুচ্ছে' নারীত্বের বিচিত্র প্রকাশকে সতেরোটি নামে চিহ্নিত ক'রে সতেরোটি পৃথক কবিতা লিখেছেন: শ্যামলী, কাজলী, হেঁয়ালি, খেয়ালী, কাকলী, পিয়ালী, দিয়ালী, নাগরী, সাগরী, জয়ন্তী, ঝামরী, মুরতি, মালিনী, করুণী, প্রতিমা, নন্দিনী এবং উষসী।

এমন কি সেন সম্রাটদের রাজলক্ষ্মী এই মহাবাংলাকে বনলতা সেনের চরিত্র দেওয়ার নিদর্শনও রবীন্দ্রনাথের মহুয়া কাব্যগ্রন্থেই আছে: 'সাগরিকা',। 'সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে',—এই প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি পাঠ করলেও ইনিই যে ইন্দোনেশিয়া সে কথা কোথাও দেখা যাবে না, কিন্তু পাঠক তার নিজের অনুভূতিতে তাকেই পাবেন, অবশ্য তার যদি প্রয়োজনীয় ইতিহাস চেতনা থাকে। এই কবিতাটি কবির, বালি যবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণকালেই রচিত এবং 'বালি' শিরোনাম নিয়েই প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩৪-এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন রথযাত্রা, হোলী প্রভৃতি চিরাচরিত পাবণগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসবের চরিত্র দিয়ে বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসবের পালা রচনা করলেন 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থে, তারপরই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থটি।

কেবল দেশের নামরূপ নয়, কালের নামরূপও দেখেছি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ক্ষণিকা'তে 'নববর্ষা' কবিতায় বলা হয়েছে 'ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায়ে। ওগো নবঘন নীলবাসখানি বুকের উপরে কে লয়েছে টানি, তড়িৎশিখার চকিত আলোকে ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে।" বর্ষা এবং বর্ষার এই রূপ কল্পনা একাকার হয়ে গেছে এই কাব্য গ্রন্থেরই 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটিতে। পাঠকের স্পর্শকাতর অনুভূতি না থাকলে বোঝাই যাবে না যে মেঘলা দিনের মাঠের নামরূপ এই 'কৃষ্ণকলি'। এই কবিতায় মেঘলা দিনের মাঠের উপমা নয় 'কৃষ্ণকলি'—বরং কবিতার গুণে এখানে কৃষ্ণকলি তার নামরূপ নিয়েই সত্য সত্য এবং তারই উপমা মেঘলা দিনের মাঠ: 'এমনি করে কালো কাজল মেঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে। এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।'

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, সর্বভূতান্তরাত্মা, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, বাসুদেব সর্বমিতি,—এই ঔপনিষদিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেই বস্তুপুঞ্জের মধ্যে এমনি জীবন্ত প্রতিমাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই চেতনা রবীন্দ্রনাথের ছিল, কবি জীবনানন্দেরও ছিল। তাদের যা কিছু পার্থক্য প্রকাশরীতিতে।

জীবনানন্দ-প্রসঙ্গ

ডঃ সুশীল রায়

এক-এক সময় এক-একজন কবি আমাদের মন ও আমাদের মেজাজ অধিকার ক'রে বসেন। সেই বিশেষ সময়ের মানসিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্ভবত সেই বিশেষ কবির কাব্যের মধ্যে কোনো-না-কোনো ভাবে ধ্বনিত হয়েছে, এবং এই জন্যেই সেই বিশেষ সময়ে ঐ বিশেষ ধ্বনি সকলের মনে প্রতিধ্বনির মতন বেজে ওঠে। সমুদ্রের ঢেউ যেমন একটার পর একটা আসতেই থাকে, কবিরাও তেমনি—ঐ ঢেউয়েরই মতন। একজনের প্রভাব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজনের প্রভাব এসে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ের কিনারে আছড়ে পড়ে।

জীবনানন্দ দাশ স্বভাবকবি ছিলেন না, গোবিন্দচন্দ্র দাসের মতন স্বভাবকবি তো ছিলেনই না। কিন্তু জীবনানন্দ ছিলেন স্বভাবতই কবি। যাকে বলে মনে-প্রাণে কবি—জীবনানন্দ সেই জাতের কবি। কোনো রকম আয়োজন বা আড়ম্বর না ক'রে তিনি যেন অতি সহজেই কবিতা লিখতে পারতেন—তাঁর কবিতা পড়ে তাই মনে হয়। কিন্তু, কাজটা কি সত্যিই অত সহজ ছিল? সম্ভবত তা নয়। আপাতদৃষ্টিতে যা সহজ বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা তেমন সহজ কাজ নয়। ঐ সহজতা বজায় রাখার জন্যে কবিকে কতটা দুরূহ ক্লেশ করতে হয়েছে, তা কবি স্বয়ংই জানেন।

যাঁর বলার কথা বিশেষ-কিছু থাকে না, তাঁকেই অনেক জটিলতা সৃষ্টি করতে হয়। যেহেতু জীবনানন্দ পরিষ্কারভাবে জানতেন যে, তিনি কি বলছেন বা কি লিখছেন, এইজন্যে তিনি সোজাসুজিভাবে তা বলতে বা লিখতে পেরেছেন। সোজাসুজিভাবে তিনি বলেছেন বলেই তা সোজাসুজিভাবে আমাদের মনের কাছাকাছি এসে পৌঁছতে পেরেছে। এবং সেইজন্যেই তিনি আমাদের এতটা অন্তরঙ্গ হতে পেরেছেন।

কিন্তু আমাদের অনেক সময় মনে হয়েছে যে, তিনি আর-একটু নিপুণ ও আর একটু নিখুঁত হলে ভালো হত। মনে হয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কথা তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেইটেই তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। অনেক কথায় আমাদের মুখ ফসকেও অনেক কথা বেরিয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ আমরা তা

সংশোধন ক'রে নিই। এইজন্তে স্বতঃস্ফূর্ত কথাই সব সময় স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করা ঠিক না। জীবনানন্দ তাঁর অনেক লেখাই বিশেষ মার্জনা করেন নি বলে আমাদের মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, আর-একটু ঘষা-মাজা করলে বোধ হয় ভালো হত। ছন্দের ত্রুটিও সম্ভবত এই জন্তেই থেকে গিয়েছে।

তাঁর 'ঘাসকাটা ঘর' বা 'বনলতা সেন' বিখ্যাত কবিতা। কবির মনের বেদনা এই দুটি কবিতার পক্ষেই বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। সেই বেদনার্ত কবিকে নিয়ে এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে। যাঁরা তাঁকে বেদনা দিয়েছেন, বা যাঁদের জন্তেই তাঁর জীবনের এই বেদনা, তাঁরাও এখন জীবনানন্দের মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন। কবির জীবদ্দশায় কবি যদি তাঁদের কাছ থেকে এটুকু সহৃদয়তা পেতেন তাহলে, কি জানি, অপঘাত মৃত্যুও তাঁর না হতে হয়তো পারত।

জীবনানন্দের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে নূতনভাবে জীবিত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। সহৃদয় পাঠকের কাছে জীবনানন্দের তাই আজ এই সমাদর। পাঠকবর্গের মনের কিনারে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন তাই আছড়ে পড়ছে জীবনানন্দের কবিতা।

যে কবিতা-দুটির কথা বলা হল, তা নাকি ইংরেজি কবিতার প্রভাবে লিখিত। জীবনানন্দ কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। ইংরেজি কবিতার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ থাকা এজন্তেও স্বাভাবিক। কোনো বিদেশী কবিতা যদি তাঁর মন অধিকার ক'রে থাকে, তাহলে তার প্রতিধ্বনি তাঁর কবিতায় বেজে উঠছে—এও অসম্ভব নয়। সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকার প্রকাশিত একটি পত্রে জানা যায় যে, 'বনলতা সেন' কবিতাটি কোন্ বিদেশী কবির কবিতার প্রতিধ্বনি।

ধ্বনি হোক বা প্রতিধ্বনি হোক, আমাদের কানে যে-শব্দটা এসে পৌঁছল, তা আমাদের কান ডিঙিয়ে আমাদের মর্মে পৌঁছল কিনা, সেইটেই বিচার্য। সুতরাং ও কথা এখন থাক্। সব উত্তেজনা ম'রে গেলে তখন তার বিচার হবে।

এখন জীবনানন্দের নাম সবার মুখে মুখে। এই সময়টা এখন জীবনানন্দের। তরুণ কবিদের মধ্যে এখন তাঁকে নিয়ে বেশ উত্তেজনা। এখন কথায়-কথায় জীবনানন্দ থেকে উদ্ধৃতি। এটা জীবনানন্দের সুসময়ের।

কিন্তু কবিকে নিয়ে উত্তেজনা হবে কেন। কবি তো জন-নায়ক নন্। উত্তেজনা বা আলোড়ন হয় জন-নেতাকে নিয়ে। কিন্তু কবিকে যদি নায়কই বলতে হয়

তবে বলব তিনি মন-নায়ক। যিনি আমাদের মন পরিচালনা করছেন তাঁকে নিয়ে মনন করাই তো উচিত, এবং তাঁর কাব্য অধ্যয়ন করাই তো সংগত। এটা স্পষ্ট জানি যে, যাঁরা জীবনানন্দ তেমন পড়েন নি, তাঁরাই আজ জীবনানন্দের পরম ভক্ত। অনুরাগী হওয়া এক কথা, ভক্ত হওয়া অন্য। ওদেশের মিলটন-শেক্সপীয়র বা এদেশের কালিদাস রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন নিয়ে কেউ তো আমরা উত্তেজিত নই, কিন্তু কাউকে তো আমরা বিস্মৃতও নই। তাই মনে হয়, কবিকে নিয়ে উত্তেজনা জিনিসটাই প্রমাণ করে কবিকে না-চেনা। কবির পক্ষে এটা অবমাননা।

দিব্যনীলিমার কবি

সুনীলকুমার নন্দী

'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; কেউ বলেছেন এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; স্যুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবাই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।'—জীবনানন্দ

তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বে আমাদের যেমন প্রবল আকর্ষণ, তেমনি আবার তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রকৃতই পর্বতপ্রমাণ বিভ্রান্তি। এর মূলে হয়তো তাঁর কবিতায় দেহ-মন আর কাল-কালাতীত দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভে ফুটে-ওঠা ভিতর-উন্মোচিত বিপন্ন নীলিমা। যা পরিণামে দিব্যনীলিমায় উদ্ভাসিত। এবং সেইসঙ্গে তাঁর রচনার অসামান্য আঙ্গিক, বাংলা কবিতায় যা একেবারে নতুন, যা ইতিপূর্বে প্রায় অনাবিষ্কৃত। বস্তুত, তাঁর হাতে বাংলা কবিতার সমগ্র আদলই যেন গেছে পাল্টে—চিত্র, উপমা, চিত্রকল্প—সব কিছুই। এত দিনের প্রচলিত জগৎ থেকে সরে-সরে ভিন্ন রঙে তাঁর সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়চেতনায় বেজে ওঠা নিসর্গপৃথিবী আর মানবপৃথিবীর অঙ্গীকার বিপরীত ব্যবহারনৈপুণ্যে নতুন অনুভব, অনুভব থেকে নতুন বোধের দিগন্ত স্পর্শ করল। অনভ্যস্ত পাঠক কবিতার এ-অপরিচিত আবহাওয়ায় বিস্ময়াচ্ছন্ন হলেও পরিণাম বিশ্লেষণে প্রায়শ উদ্‌ভ্রান্ত। এমন-কি, অভিজ্ঞ কাব্য-সমালোচকদের মধ্যেও দেখি তাঁকে নিয়ে চলেছে সাহিত্যের কানামাছি খেলা। যদিচ তাঁর প্রথম ও মধ্যপর্বের কবিতার দ্বারা আক্রান্ত তিরিশের একাধিক প্রধান কবি ও চল্লিশের অধিকাংশ, আর তাঁর উত্তরকাব্যে আচ্ছন্ন পঞ্চাশের প্রায়-সমগ্র তারুণ্য—বস্তুত, রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতার মূল চরিত্রেই যে প্রাণ-প্রবাহের তাড়না, সেখানে তিনি প্রধান পুরোহিত।

বাংলা কবিতায় আষ্টেপৃষ্ঠে যখন রবীন্দ্রনাথের ছায়াপাত, তখন 'ঝরা পালক'-এর কবিতা নিয়ে তরুণ কবি জীবনানন্দ দাশের প্রবেশ। রবীন্দ্র-কাব্যের সেই

আপাতসরল দুর্মর আকর্ষণের পাশ কাটিয়ে কিঞ্চিৎ ঘুরপথে অথচ নিতান্ত সাদামাটা আবেগ-ভরোভরো পথে তিনি পা বাড়ালেন—যে-পথে তখনই থইথই করছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সর্বত্র-চারানো তারল্য আর নজরুলের উত্তল উচ্ছ্বাস।

১ সে কোন ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ-শুঁড়িখানায় বাজে
চিনি-মাখা ছায়ায় ঢাকায় চুনীর ঠোঁটের মাঝে।

২ ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর-বেষ্টন,
সমুদ্রের যৌবন-গর্জন
তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর-শের
টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছে অতীত-আখের
হে জলধি পাখি!

এখানে লক্ষণীয় সত্যেন্দ্রনাথের অনুপ্রাস-ছটা ও নজরুলের আবেগ-সর্বস্ব কাঁচা উদ্যম। ভাবতে অবাক লাগে, ওই চড়া রঙের উৎসে জীবনানন্দের আবির্ভাব। ওই উৎসভূমি থেকে যে বিবেকী ফলশ্রুতির ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য থেকে বোধ, বোধ থেকে Vision-এর মুখোমুখি হতে দেখি, তা তাঁর সৃজনপ্রতিভার প্রতি আমাদের অধিকতর উৎসাহী করে তোলে। প্রসঙ্গত, মনে রাখা ভাল, সত্যেন্দ্রনাথের চিত্রনির্মাণ তাঁর কবিতার চিত্ররূপময়তায়, অকিঞ্চিৎকর হয়েও সহযোগিতা করে নি কি? আর নজরুলের যেন অস্পষ্ট সাড়া পাই তাঁর প্রবেশ-পথের অপরিণত আবেগে। সুতরাং ওই উৎসভূমি তাঁর কবি-চরিত্র গঠনে যে ভূমিকা নিয়েছে তা একেবারে অবহেলা করবার মতো নয় নিশ্চয়ই। আমার এ-সিদ্ধান্তের সমর্থন কেবলমাত্র দুর্বল অংশে নয়, 'ঝরা পালক'-এর সম্ভাবনাময় কবিতার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দেয়।

ডেকেছিলো ভিজে ঘাস— হেমন্তের হিম মাস— জোনাকির ঝাড়,
আমারে ডাকিয়াছিলো আলেয়ার লাল মাঠ—শ্মশানের খেয়াঘাট আসি,
কঙ্কালের রাশি,
দাউদাউ চিতা
কতো পূর্ব জাতকের পিতামহ পিতা,
সর্বনাশ ব্যসন বাসনা,
কতো মৃত গোক্ষুরার ফণা,
কতো তিথি— কতো যে অতিথি—
কতো শত যোনিচক্রস্মৃতি

করেছিলো উতলা আমারে।
আধো আলো— আধেক আঁধারে
মোর সাথে মোর পিছে এলো তারা ছুটে,
মাটির বাঁটের চুমো শিহরি উঠিল মোর ঠোঁটে, রোমপুটে;
ধুধু মাঠ— ধানখেত— কাশফুল—বুনো হাঁস— বালুকার চর
বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া;

সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতায় তিনি অবশ্য পথ খুঁজেছেন মাত্র, তার অধিক কিছু হাতড়াতে যাওয়া ভুল হবে। জীবনানন্দের ভাবনা-প্রতিভাকে নির্ভর দেবার মতো সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। সেখানে, বিশেষত কবিতার গঠন-নৈপুণ্যে, এসে মিলিত হয়েছে বিদেশি কবিতার আলোহাওয়া, বিদেশি কবিতার পুষ্টি। অথচ তাঁর কবিমনের গড়নে যে মাটি-জল তা একেবারেই দিশি।

'ঝরা পালক'-এর যা ছিল সম্ভাবনার গুঞ্জন, 'রূপসী বাংলা' বা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসে তা সিদ্ধির বাজনায় বেজে উঠল।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দোয়েলপাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম— বট — কাঁঠালের— হিজলের— অশথের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল— বট— তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিলো; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো,— একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

এই চিত্ররূপময় ইন্দ্রিয়ময়তা বাংলা কবিতায় কেমন এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানলায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গের রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ — মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র চিত্রলছটায় ফুটে উঠেছে যে নিসর্গপৃথিবী, এ যেন 'রূপসী বাংলা'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নয় ; প্রকৃতির সহজবহ সৌন্দর্য অদ্ভুত নিয়মে ধূসর, রুগ্নতায় বিষণ্ণ।

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো— সোনা ছিলো যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়, যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।

আর নিসর্গপৃথিবীর অপার নিবিড়তাও জীবনের একমাত্র আশ্রয় হতে পারে কি ? প্রকৃতির অন্তরঙ্গতার মধ্যে কবির যে আকুলতা বাহু মেলতে চায় তার তলদেশে রয়েছে মানুষী প্রেমের রক্তিম অনুভব-তাড়না।

রয়েছি সবুজ মাঠে— ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হ'য়ে আকাশে-আকাশে ;
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে' ! — সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল,
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল ;
রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই ; কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি 'মেঠো চাঁদ' 'ধানখেত' 'শিশিরের জল' ইত্যাদি নিয়ে প্রেমের রূপকল্পে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করেছেন, পরবর্তী গ্রন্থ 'বনলতা

সেন'-এ তারই পরিণত রূপ, সার্থক আলেখ্য। এখানে এসে কবি যেন ইয়েটস্‌-এর মতো বলতে পারেন: 'I have no speach but symbol.' 'বনলতা সেন'— নামটিই যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। শুধু টুকরো-টুকরো আভাস নয়, প্রকৃতি সম্পূর্ণ নারীরূপে উপস্থিত। নিসর্গপ্রকৃতি আর মানবপ্রকৃতি যেন অনুভবে একাকার। প্রকৃতি এখানে আশ্রয়। প্রকৃতি এখানে উৎসাহ, শক্তি, সৌন্দর্য, বিবেকী চেতনা।

১ অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখি নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

২ শ্যামলী, তোমার মুখ সে কালের শক্তির মতন;
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে,
মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর শয্যার কথা ভুলে
সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।

৩ সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

এই হৃদয়নির্ভর প্রেম ও বিবেকী চেতনার মিলিত শুশ্রূষায় অসুস্থ পৃথিবীর ক্রমমুক্তিতে কবির গভীর প্রত্যয় ঘুরে ঘুরে কবিতায় প্রতিধ্বনি তুলেছে।

সুচেতনা, এই পথে আলো জেলে— এই পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;—
প্রায় তত দূর ভাল মানব-সমাজ

আমাদের মতো ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

কবির পরবর্তী উল্লেখ্য বাঁক 'সাতটি তারার তিমির'। 'বনলতা সেন' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর মধ্যবর্তী গ্রন্থ 'মহাপৃথিবী'। যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ, তবে কণ্ঠ প্রায় 'বনলতা সেন'-এর গা-ছুঁইছুঁই। সেই নিসর্গপৃথিবী আর মানবপৃথিবীর গলাগলি। প্রকৃতিলীন অনুভাবনায় আচ্ছন্ন কবি এ-সময় লিখলেন :

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস— তেমি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছে করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

'সাতটি তারার তিমির'। মানবিক সম্পর্কে ছিন্ন সময়ের বিপর্যস্ত চরিত্র পাঠে এ-নাম যেন অমোঘ। নিশাকরোজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল, যাকে আমরা ধ্রুব বলে জানতাম সেই আলোবিকীর্ণ আশ্রয় আজ 'আলো আর আলো নয়, অন্ধকার'। যুগচেতনার নিরালম্বতা, উৎকেন্দ্রিক অবসাদ, বিকৃতি ও বিকৃতির হাহাকার, এ-অংশের কবিতায়, তীক্ষ্ণ তির্যকতার মধ্য দিয়ে আশ্চর্য গাঢ়তায় উপস্থিত।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব,— অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

কেবলমাত্র হৃদয়বিদারক আর্তি নয়, বিধ্বস্ত পৃথিবীর উদ্বাস্তবোধ ও চৈতন্যের দ্বন্দ্ব অর্জিত বা অর্জন-সাপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধে প্রতিবিম্বিত হতে হতে এতদিনের কবিচেতনা যেন vision-এর দিব্যনীলিমা স্পর্শ করে।

১ কিছু নেই— তবু এই জের টেনে খেলি ;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি ;

জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে— অন্ধকার
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।
তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

২ তবুও তাদের ধারা— ধর্ম অর্থ কাম কলরব কুশীলব—
কিংবা এসব থেকে আসন্ন বিপ্লব
ঘনায়ে— ফসল ফলায়ে —তবু যুগে যুগে উড়ায়ে গিয়েছে
পঙ্গপাল।
কাল তবু— হয়তো আগামী কাল।
তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের
বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে ; তৃতীয় চতুর্থ— আরো সব
আন্তর্জাতিক গ'ড়ে ভেঙে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

প্রকাশিত সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এসে স্পর্শ মাত্র নয়, তিমির-খোলা দিব্যনীলিমায় কবি পরিব্যাপ্ত, কবি আত্মস্থ। এবং এ-দিব্যনীলিমার অন্তর্লীনে 'বনলতা সেন'-এর সেই নারী সেই প্রকৃতি আর প্রাকৃতচেতনার সময়শোধিত বিচ্ছুরণ।

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।
অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানব-হৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্ব'লে উঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে ;
বুঝেছি ভোরের বেলা রোদে নীলিমায়,
আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্ক শিখায় ;
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হ'য়ে গেলে
মুখে যা বলোনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

জীবনানন্দের চিত্রকল্প

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

বহু আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও কবি হিসেবে জীবনানন্দ পূর্ণ পরিচিত হয়েছেন এমন দাবি করা চলে না। কারণ কবির অতিসংগুপ্ত চরিত্র—যার ফলে নির্মোকের অন্তর্বর্তী সত্তাটিকে চিনতে ও চেনাতে রীতিমতো প্রস্তুতি প্রয়োজন। জীবনানন্দ সম্পর্কে লেখা যে এত কঠিন তা এমন করে এর আগে আর কখনো অনুভব করি নি।

প্রসঙ্গ তুলেছি বলেই বিশদ করে দেওয়া সমীচীন মনে করি। কারণ এই মীমাংসা অনুসন্ধান করতে গিয়েই জীবনানন্দ সম্পর্কে এমন কয়েকটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হল যার প্রভাব শুধু দীর্ঘপ্রসারী নয়—সম্ভবত একটু নতুন রীতিতে ভাবতে সাহায্য করবে বলেই বিশ্বাস রাখি। সত্তরের দশকে পা রেখে প্রথানুগত্যকে অতিক্রম করতে না পারলেও চেষ্টা করা দরকার এটা স্পষ্টতই স্বীকার করি। এবং সেইখানেই বোধহয় জীবনানন্দের যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব। জীবনানন্দ প্রথাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন কিনা তার উত্তর দেওয়ার সময় হয়েছে আর সেইসূত্রেই মনে রাখতে হবে তিনি নিজের কথা নিজস্ব কণ্ঠে বলতে চেয়েছিলেন।

ষাটের দশক পার হয়ে গেলেও জীবনানন্দের বিশ্লেষণ হয় নি—কালগত প্রশ্নে হয়তো সম্ভব ছিল না। ফলে যা হয়েছে, তা মুগ্ধবোধের অলসবিচরণ। এর জন্য কবি নিজেই সবথেকে বেশি দায়ী। কথাটা এলোমেলো মনে হতে পারে অতএব বিষয়টি প্রথমেই পরিষ্কার করা ভালো।

যে কোনো কবিতার দুটি বড় সম্পদ তার ছবি আর ধ্বনি। জীবনানন্দের কবিতাতেও তারা আছে কিন্তু তাদের স্বরূপ তেমন সহজ নয়। যদিও এ পর্যন্ত পাঠক ও সমালোচক জীবনানন্দের প্রতি মুগ্ধ হয়ে আস্বাদন করেছেন, তবু এই মুগ্ধতার অনুষঙ্গগুলোকে চিহ্নিত করেন নি। কবিতার আবেদন যেহেতু হৃদয়ে—মস্তিষ্কে নয়, সে-কারণে এধরনের বক্তব্য উপস্থিত করার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার ষোল আনা সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েই বলি জীবনানন্দকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করলে অনেকখানি পাওয়া হয় এবিষয়ে দ্বিতীয় মত পোষণ করি না—কিন্তু

সমস্তটাকে আরো স্বচ্ছ করে নিতে পারলে কাব্য গ্রহীতার আনন্দ বোধহয় কমে না—বরং বাড়ে।

সত্তরের দশকে আমাদের জীবন ও জগৎ অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে বলেই এভাবে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। এবং চাইছি জীবনানন্দের আবেগের বলয় থেকে নিজেকে যুক্ত করে নিয়ে কবিকে বাইরে থেকে সম্পূর্ণ 'একক' হিসেবে দেখতে। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে কবির সম্মোহন শক্তি যা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে নজরুল আর জীবনানন্দের ছিল। নজরুলের সেই পাগল করার—বাঁধন ছেঁড়ার উদ্দামতায় ভাসিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল মূলত দেশাত্মবোধ। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে বাইরের বদলে ভেতরের আয়োজন ছিল শক্তিশালী। কে জানতো আমাদের একটা নিজস্ব পরিচয় আছে—আমাদের কণ্ঠ আমাদের একেবারে স্বগত আর সবুজে ভরা, জলের নকশাকাটা একটা দেশ আছে যার নাম বাঙলাদেশ এবং দেশটা আমাদের! হ্যাঁ—নিজস্ব তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ক্লান্ত-মুহূর্তগুলোতে সেই সব স্মৃতিময়তার শীতল আমেজ আমাদের আরামে অলস করেছে—জীবনানন্দ হৃদয়মন জয় করে বসে পড়েছেন পাঠকের রসসত্তায়। ফলে একধরনের উদাসীনতায় আমরা আক্রান্ত হয়েছি। এবং একটিমাত্র কারণেই নজরুলের প্রেমের কবিতাকে অনায়াসে ভুলে গেছি, জীবনানন্দের শিল্প-সৌন্দর্যকে খতিয়ে দেখবার কথা মনে হয় নি।

জীবনানন্দের ক্ষেত্রে আমাদের মুগ্ধবোধ ভাবালুতার পেছনে আছে তাঁর নিজস্ব বর্ণবলয়ের সুতীব্র অনুরণিত প্রভাব। কবি নিজেও এক একটি আবেগে আক্রান্ত হয়েছেন যা দীর্ঘকাল তাঁকে মুক্তি দেয় নি ফলে সেই আক্রান্ত আবেগ সংক্রমণের পথে দুর্বল পাঠকচিত্তকে জয় করেছে খুব সহজেই। সত্তরের দশকে পা দিলেও এর থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি এমন দাবি করছি না। কবির অস্তিত্ব থেকে একটা অপেক্ষাকৃত দূরত্বে এসে কবিকৃতির পর্যবেক্ষণ করতে চাইছি—যার মাঝখানে মানবিকতার প্রশ্নে এক অসহ না হলেও দুঃসহ মূল্যহীনতার দশক পার হয়ে এসেছি। জীবনানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি বলেই সে দশককে কৃতিত্বের সঙ্গে পার হয়ে এসেছি বলে দাবি করতে সাহস পাচ্ছি না। কারণ? হ্যাঁ, কারণ জবাবদিহি করতে হবে অসত্য ভাষণের জন্যে যা পাঠকের চেয়ে কবির কাছে করবার সময় অপরাধবোধ মারাত্মক রকম ঘনীভূত হয়ে থাকে। কবিরা মৃত্যুর পর ছবি হয়ে গেলে বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বিশেষ করে জীবনানন্দের তো কথাই নেই, কারণ তিনি দেখেছেন,—

পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে— কবি নয়— অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই— চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে— আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো— হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

(সমারূঢ় / সাতটি তারার তিমির)

একটু বেশি সতর্ক হতে হয়েছে কারণ কবির পেশা ছিল অধ্যাপনা। সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেই তাঁর কর্মজীবনের শুরু ও শেষ। নিজের পেশার জন্যে তাঁর এই সঞ্চিত ঘৃণাই প্রমাণ করে এটা তাঁর 'নিজস্ব' বৃত্তি হতে পারে নি। এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবে অতিরিক্ত কিছু বলার দায়িত্ব নেওয়া গেল না। কিন্তু যে জন্যে কথাটা এসেছে তা এড়িয়ে যেতে চাইনে।

সাধারণভাবে সমালোচনার দুটো ধারা দেখা যায়। একটি ইম্প্রেশানিস্টিক— যখন কেমন লাগলো তার ওপরই মূল্যায়ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কবি ও সমালোচক উভয়ের ব্যক্তিত্ব, রুচি ইত্যাদির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হতে হয়। দ্বিতীয় রীতিটি বিশ্লেষণাত্মক যেখানে সমালোচকের ব্যক্তিত্বকে কখনই সমাজকালের ওপর প্রভুত্ব করতে দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় রীতিটি অসাধারণ কঠিন শুধু নয়—বাঙলাদেশে এ ধরনের আলোচনাকে 'পণ্ডিতি' নাম দিয়ে পঙ্‌ক্তিতে স্থান দেওয়া হয় নি। 'কবিতার কথা' পড়লেই জীবনানন্দকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ও সমালোচক বলে চিনতে ভুল হয় না। তার ফলে আবার সেই 'আবেগে আক্রান্ত' পর্যায়কে উল্লেখ করতে হচ্ছে। হ্যাঁ—একমাত্র ওখানেই আমাদের বিচারে পদস্খলন হতে পারে।

২

জীবনানন্দ সৌন্দর্যাভিসারী কবি। রঙ রূপের মায়ায় এমন নিপুণ অবগাহন দেবেন্দ্রনাথ সেনের পরে আর কেউ করেন নি। নজরুল ফাগুনের রঙ পেলে 'হোলি' খেলেছেন—চৈত্রের রঙ নিয়ে সর্বনাশ করতে চেয়েছেন আর মেঘের রঙ পেলে বিষণ্ণতার পায়েও নূপুর বেঁধে দিয়েছেন প্রাণপ্রাচুর্যের উদ্‌গত লাবণ্যে। রবীন্দ্রনাথ রঙ রূপের শিল্পী নন—প্রজাপতি ঋষি! পৃথিবীকে ভালবেসে আতপ্ত আবেগে তাকে অঞ্জলিভরে পান করতে দেখেছি সেই ফুলবাগিচায় দেবেন্দ্রনাথ সেনকে আর একেবারে এদিকে চিলডাকা দুপুরে ধানসিড়ি নদীতীরে সবুজ

কার্পেটে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ। দেবেন্দ্রনাথের তুলনায় জীবনানন্দ আবিষ্ট কবি। দেবেন্দ্রনাথের ক্রীড়াচাপল্য তাঁর নেই—বরং শিল্পী হিসেবে জীবনানন্দ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগোত্রীয়। ঠিক একই ভঙ্গীতে প্রকৃতির আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মহারা কবিচিত্ত জীবনের সব দুর্বহ ভার নামিয়ে হালকা হতে চেয়েছেন শিল্পী, চেয়েছেন দুচোখ ভরে স্বপ্ন দেখতে। 'ঝরা পালকের' পর্বে সেই নাগরিক গ্লানি থেকে তাই অতিসহজেই মুক্তি ঘটে যায় আকাশনীলের দরবারে—যেখানে স্বপ্নময়ূরী ডানার ছায়া ফেলে তাঁকে আশ্বস্ত করেছে—

জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি
কোন্ দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী;
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!

[নীলিমা / ঝরা পালক]

এই রূপকল্পের আত্মীয় হিসেবে প্রাচীনতর অন্য রূপকল্প মনে পড়তেই পারে, বিশেষ করে 'বিথারিয়া' শব্দের জন্যে—

সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

ছন্দের কুশলী খেলোয়াড় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'যক্ষের নিবেদন' কবিতার অংশ পাশে রাখলে মিলের পাশে অমিলকেও বোঝা যায়। জীবনানন্দের অনুভূতিতে যে 'রক্তিমতা' ও 'নীলিমা' তার মধ্যে উল্লাস নেই—বিষণ্ণতা আছে। অভিসারী চেতনা নিয়ে মুগ্ধ হবার জন্যে তিনি উন্মুখ হয়েছিলেন বলেই নীলিমা কবিতায় তিনি আত্মসমর্পিত তাঁর সমস্ত আঁধার ও যন্ত্রণা একেবারে শান্তভাবেই—

ডুবে যায় নীলিমায়—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

কীটপ্রায় ধরণীর ইমেজ বিশ্বানুভূতিতে পৌঁছে দিয়েছে এমন বলা যাচ্ছে না অনুরূপ প্রসারতা শেষ চরণটিতে অনুপস্থিত। তবু পিরামিড কবিতায় রবীন্দ্রসুলভ ইমেজ তুলনায় গভীরতর—

প্রিয়ার বক্ষের 'পরে বসি' একা নীরবে করিছো তুমি শবের সাধনা—
হে প্রেমিক—স্বতন্ত্র স্বরাট।
কবে সুপ্ত উৎসবের স্তব্ধ ভাঙা হাট
উঠিবে জাগিয়া,
সস্মিত নয়ন তুলি' কবে তব প্রিয়া
'আঁকিবে চুম্বন তব স্বেদকৃষ্ণ পাণ্ডু চূর্ণ ব্যথিত কপোলে,

এই রূপকল্পের আগের চিত্রকল্প জীবনানন্দ আশ্চর্য বিমুখতায় দেখলেন—

পিরামিড-পাষাণের মর্ম ঘেরি নেচে যায় দু-দণ্ডের রুধিরফোয়ারা—
কী এক প্রগল্ভ উষ্ণ উল্লাসের সাড়া!

কিন্তু স্বরীতিতেই তিনি প্রচলিত চিত্রকল্প গড়লেন, উল্লসিত জীবনরতির প্রচলিত বক্তব্যের উপস্থাপনায়—

গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু: নবোৎফুল্লা মাধবীর গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে;
অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে
ভুলে যাই দুই ফোঁটা অশ্রু ঢেলে দিতে।

[পিরামিড / ঝরা পালক]

জীবনানন্দ সম্পর্কে প্রচলিত বিশেষণ—তিনি সভ্যতার চাপে ক্লান্ত। এই প্রসঙ্গেই বিভিন্ন সময়ে সভ্যতাকে অবক্ষয়ী রূপে চিহ্নিত করে কবির ক্লান্তির পটভূমিকে সিদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন অনেকেই। কিন্তু মনে হয় এই মূল্যায়নের মধ্যে জীবনানন্দের স্বরূপ সন্ধান করা শুধুই কঠিন নয় কবিকে পাওয়ার সম্ভাবনাই খুব কম। কারণটা স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো। ঝরা পালকের ইমেজগুলোর মধ্যে তরলতা প্রমাণসাপেক্ষ নয় কিন্তু বাতনা অস্ফুট। এই অনুভূতিগত নির্মমতা জীবনানন্দকে জীবন সম্পর্কে অন্ত দিগন্ত খুঁজে দিতে চেয়েছিল—কিছুটা তা তিনি পেয়েছেন তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু কবির সাফল্যের পেছনে তাঁর নিজস্ব দেশকালের সুতীব্র ভূমিকাটিকে উপেক্ষা করা যায় না সেই কারণেই জীবনানন্দের ক্ষেত্রে কথাটা ভেবে দেখতে হবে। ১৯২৮ সালের ঝরা পালকের চিত্রকল্পগুলোতে মৃত্যুরতি দেখি। শুধুই মৃত্যুর কথা নয় সমস্ত অনুভূতিগুলোর মধ্যে যে পাণ্ডুর বিবর্ণতা

তা মৃত্যুরতিরই অঙ্গ। ঠিক তখন, বাঙলাদেশের জীবন ও জগৎ দীঘির মতো স্বচ্ছ স্থির কাকচক্ষুগভীর নয়—নয় কোনো প্রবল বেগবতী প্রবাহ। সাহিত্যে যে নতুনত্বের মেজাজটা ধরা পড়ছে তা রবীন্দ্রধারা থেকে সরতে চেষ্টা করছে এবং নজরুল গানে কবিতায় চঞ্চল প্রাণময় ছন্দের ঢেউ তুলেছেন। রাজনৈতিক লেখাগুলো তীব্র হতে চলেছে। তারই মধ্যে জীবনানন্দ নিশ্চুপ এবং একাকী। এই পর্বগুলোতে তিনি রোম্যান্টিক। সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে তিনি বিশ্বগত হতে চেয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্যামল শান্তিতে তিনি প্রত্যাগত। পেশার প্রশ্নে তিনি কলকাতায় আছেন। ভেঙে পড়া অর্থনীতি আর অস্থির রাজনীতির পরিমণ্ডলে দেখতে না চাইলেও বিপর্যস্ত মানুষের মিছিল তিনি দেখেছেন—কিন্তু নীলিমায় প্রতিসরিত হতে তাঁর খুব সময় লাগে নি। জীবনানন্দের 'স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে' সমস্ত গ্লানি ডুবে গেছে। জানিনা কেন সেই দেশকালের সংকট কবিকে নাড়া দিতে পারে নি। হয়তো বলে অনেক বিশ্লেষণে পৌছানো যেতে পারে তবে একটা বিশেষত্ব—যাকে সাধারণ কারণ বললে ভালো হয়—তা হল কবি স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলেন। তাই অবক্ষয়ী সভ্যতায় তিনি ক্লান্ত একথা বলার চেয়ে স্বপ্নার্ত মানুষের ঘোর মাঝে মাঝেই যে ভেঙে গেছে আর্তনাদে অথবা চীৎকারে সেইটাই কবির ক্ষোভের অন্যতম কারণ। আরো স্পষ্ট করে বললে জানিনা অশোভন হবে কিনা—তা হলে জীবনানন্দ স্বপ্নবিলাসী শিল্পী—সেই স্বপ্নের প্রয়োজনে জীবনকে গ্রহণ করেছেন—জীবনের প্রয়োজনে স্বপ্ন এসেছিল একথা প্রমাণ করা খুবই কঠিন।

সভ্যতার একটা ইতিহাস আছে। সমকাল কোনোকিছুকেই নির্বিচারে স্বীকার করেনি—আজও করবে না। তাই অনিবার্য সংঘাতের পথ বেয়েই জীবন বার বার প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে। এই সংঘাতের বেদনা এবং ব্যর্থতার জ্বালা অভিসারী কবির বোধকে উদ্রিক্ত করে তোলে। কিন্তু মুগ্ধবোধের মধ্যেই এই সংঘাত-গত প্রগত জীবনধর্মকে অনুভব করা সম্ভব নয়—সেখানে শিশুর মানসিকতা, পাওয়ার জন্যে আশা, পেলে খুশি—না পেলে অসন্তুষ্ট! জীবনানন্দ সেই অর্থেই অখুশি। কিন্তু বড় পাওয়ার জন্যে যে প্রকৃষ্ট প্রয়াস এবং সেগুলো প্রহৃত হওয়ার মধ্যে যে যন্ত্রণাবোধ তা জীবনানন্দের লেখায় উপজীব্য নয়। তিনি নির্জনতার শিল্পী। জীবনরস তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন কিন্তু জলসেচের ব্যাপারটা নেই।

এর কারণটা এইভাবে দেখা যেতে পারে। জীবনানন্দের ভাবকেন্দ্রিকতা

ক্রমশ তীব্রভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়তে থাকে। সমস্ত পৃথিবীকে ভোগের বাসনা তাঁর আছে—যার জন্যে তিনি মাঠ নদীতে বিচরণ করে। কিন্তু সে বৃহৎকে নিজের মধ্যে টেনে নিতে গিয়ে যত ব্যর্থ হয়েছেন ততই পৃথিবীর প্রান্তবর্তী বর্ণচাতুর্য ফিকে হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্রমান্বয়ে এই ব্যর্থতা কবিকে ক্লান্ত করে তুলেছে যার ফলে ১৯৩৬ সালের 'ধূসর পাণ্ডুলিপির জন্ম হল। বনলতা সেনের মধ্যেও সেই পাণ্ডুলিপির আয়োজন আকস্মিকভাবে পূর্বাপর রচনাধারাকে যুক্ত করে ফেলে। এই কাব্যের কবিতা 'মৃত্যুর আগে'র প্রথম চিত্রকল্পটিতেই সেই বিবর্ণতা—

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ;

বলাই বাহুল্য জীবনানন্দের কাছে সমৃদ্ধির লগ্নের পূর্ণতার আনন্দ ধরা পড়ে নি—কিন্তু এর জন্যে কোনো বিশেষ দর্শনকে সক্রিয় হতে দেখি না। যদি কিছু থেকে থাকে তা সেই অনুজ্জ্বল মৃত্যুর আলো। এই কবিতার শেষে নিজেই বললেন,—

'আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা।
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ;

এই মৃত্যুদর্শন পূর্ণতার প্রশ্ন তোলে নি। নিরন্তর দুঃখের মধ্যেও মানুষ আকস্মিকভাবে নন্দিত হাসিতে উপচে পড়ে—সেই মূল্যবান জীবনের অনুরণন জীবনানন্দ অনুভব করলেও লেখায় প্রকাশ হয় নি। যে ব্যাপকতর পটভূমিকে স্বীকার করে নিলে জীবনকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে পথ জীবনানন্দের নয়। কবি হিসেবে তাই তিনি ক্রমেই Local colour-এর শিল্পী হয়ে উঠতে শুরু করলেন এবং সব বর্ণবৈভবকে ব্যক্তিগত বিষণ্ণতার খাতে প্রবাহিত করে দিলেন। এদিক থেকে জীবনানন্দের অভিসার চেতনার জুড়ি মেলা ভার।

অভিস্থিতির মধ্যে যে উত্তরণ আছে কবি সে পথে গেছেন চলে মনে হয় নি। নাটোরের নায়িকা থেকে সুরঞ্জনা প্রমুখ সকলেই যেন বিষণ্ণতার কাঁথায় এক একটি নকশা। প্রত্যয়ের আলো জ্বলবে কিনা এবিষয়ে যথেষ্ট সংশয় সেই পর্বেই দেখা দিয়েছিল—

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে ;

স্বপ্ন নয়— শান্তি নয়— ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;
সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়.
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়। [বোধ / ধূসর পাণ্ডুলিপি]

তাই মনে হয়েছে জীবনানন্দের চিত্রকল্পের পেছনে যে বেদনা ছিল তা অবক্ষয় বোধ থেকে আগত নয়। বিশেষত সভ্যতার কাছে তিনি ঋণী কারণ কোনো ইচ্ছেই সরল নয়। বহু চিত্রকল্পে বৈদগ্ধ্য ও বিদেশি প্রভাব থেকে গেছে অতএব সভ্যতাকে তিনি তুচ্ছ করতে পারেন না। তাছাড়াও জীবনানন্দকে এভাবে পরিচিত করার মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি বর্তে যেতে বাধ্য। যে সভ্যতা নির্মমভাবে চলতে পারে বলেই এগিয়ে যেতে পারে তার মধ্যে ক্ষয়টুকু অনিবার্য। অবক্ষয়ের প্রয়োজনীয় ভূমিকাটুকুকে তাই অস্বীকার করার চেষ্টা করে লাভ কি ? সেই লগ্নে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বরণ বর্জনের পালায় সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়াই তো আমাদের সব থেকে বড় মানবিক দায়িত্ব বিশেষ করে কবি শিল্পীদের। তা পারলে ব্যক্তিগত ব্যাপারটা বিশ্বগত হয়ে উঠতে খুব দেরি হয় না। না পারলে নিজের বোঝা নিজেকেই বইতে হয়। একই কারণে, সন্দেহ হয়, নদী আর নীলিমা জীবনানন্দকে আশ্রয় দেয় নি, ক্লান্ত বিষণ্ণ করে তুলেছে। এমনকি তিনি ভালোবাসার দরবারেও যে ক্রমেই অপাঙক্তেয় হয়ে পড়েছেন তার জন্যে সভ্যতার অবক্ষয় দায়ী ছিল না—দায়ী সন্দিগ্ধ মনের যাচাই করার প্রবৃত্তি কারণ তিনি নিজেই স্বীকার করছেন—‘ভালোবেসে’, ‘অবহেলা করে’ ‘ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে—।’ এই ফ্রাসট্রেশন বৃহত্তর মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে নি বলেই অনুভব করেছেন—

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক’রে চ’লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে ;
তবুও সাধনা ছিলো একদিন— এই ভালোবাসা ;

আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি ; যে-নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি ;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা।

এ কোন্ যন্ত্রণার ফল! এতো বৃহত্তর পূর্ণতর সামাজিক জীবনের জন্যে উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা নয়—বরং বিশ্বাস হীনতার ধূসর গহ্বর। এই মূল্যহননের পেছনে স্বপ্নহীনতা, প্রেমহীনতা প্রচণ্ডভাবে সক্রিয়। অথচ সেই সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়েও তীব্রভাবে ভেঙে ফেলার কথা কল্লোলের কবিরা বলছেন। গড়ে তোলার কথাও যে একেবারে কেউ বলেন নি—এমন নয়। আসলে আপ্লুত আবেগে সবুজ প্রকৃতিকে আলিঙ্গন এবং তার পাশে মানব প্রকৃতিতে বিকর্ষণ—এই অতিস্পষ্ট বিষম ভাববিন্যাসে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। তবুও কথাটা এখানেই শেষ নয়—বিশ্লেষণের পথ খুলে রাখা ভালো।

জীবনানন্দ অধ্যাপককে সহ্য করতে না পারলেও নিজে সেই বৃত্তিকে ত্যাগ করেন নি—বিশ্লেষণ পছন্দ না করলেও কবিতা রসের ব্যাপার, ব্যক্তিমনের গ্রহণসামর্থ্য, বড় সমালোচকের ভূমিকা ইত্যাদি নানান প্রসঙ্গে কিন্তু বিশ্লেষণী বক্তব্যই রেখেছেন। এটিকে স্ববিরোধী বিশেষত্ব বলতে আপত্তি নেই তবে সচেতন মানসিকতা হিসেবে গ্রহণ করলে মনে হয় আমরা বেশি লাভবান হতে পারবো।

কবি হিসেবে,—হাজার বছর, ধান, চিল ধূসরতা, নক্ষত্র তাঁর অত্যন্ত প্রিয় উপাদান, —হয়তো বা তাঁর অনুভাবনার বড় অবলম্বনও। তার ফলে তাঁর বক্তব্য একই ধরনের চিত্রকল্পে ও ধ্বনি পুনরাবর্তনে গভীরতর জীবনকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। নির্জন স্বাক্ষর এই ধরনের কবিতায় একটি অন্যতম বড় উদাহরণ। 'কোনো এক মানুষী' 'নক্ষত্র' 'হেমন্তের ঝড়ে' প্রভৃতির চিত্রসামর্থ্যে ক্লান্ত কবির শান্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে। এবং এই কবিতাতেই জীবনানন্দের কাব্যসাধনায় একটা বড় দিক এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটি হল—স্পষ্ট নঞর্থক নয় অথচ অ-সদর্থক জীবন আশ্লেষ। পরবর্তী সমস্ত কাব্যের মধ্যে যা প্রকাশিত হয়েছে তা হল জীবনকে জোর করে গ্রহণ করার মতো শক্ত মুঠি জীবনানন্দের নেই—আবার সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে চলে যাবেন

সেটাও তাঁর স্বভাবে নেই। ফলে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দুলতে হয়েছে। একে প্রত্যয়হীনতা বললে হয়তো রূঢ় কথা বলা হবে। কিন্তু এমন দিন যদি আসে যখন বস্তুজগতের পটভূমিতে রেখে শিল্পীমাত্রকেই বিচার করতে হবে সেদিন সাতটি তারার তিমির ছাড়া জীবনানন্দের সম্পদ বলতে হয়তো কিছু থাকবে না। 'নির্জন স্বাক্ষর' থেকেই বার বার প্রমাণ হয়েছে নির্জনতা জীবনানন্দের বিলাস সামগ্রী সত্যানুসন্ধানের গভীরতা পটভূমি নয়।

কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ বলেছিলেন—'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।' অতএব তিনি নিজে 'বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনা' কবিতার ক্ষেত্রে অনেক বেশি মূল্যবান বলে স্বীকার করে নেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু বিশেষকে নির্বিশেষ করে তোলার দায়িত্ব স্বীকার না করলেও কবিতায় যে তা ঘটে এবং সেটি ঘটলেই কালগত ফাঁড়াটা কেটে যায় সাহিত্যের অধ্যাপক জীবনানন্দ নিশ্চয়ই তা জানতেন। সমগ্র কাব্যসাধনায় কেন যে তার স্থান তিনি রাখেন নি তা বিস্ময়কর প্রশ্ন। অথচ কিছু প্রমাণ হাতের কাছেই আছে। অবসরের গান কবিতায়—'মাঠের ঘাসের গন্ধে শৈশবের ঘ্রাণ' ফসলের স্তনে শিশিরের জল, রূপশালি ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ— থাকলেও অবসাদে তিনি আচ্ছন্ন হয়েছেন সেই পর্বেই। কারণ উৎসাহ তাঁকে উদ্যম ভাবনায় বিরক্ত করে—তাই তিনি আত্মসমর্পণ করছেন এই ভেবে,

"এখানে চকিত হ'তে হবেনাকো, ত্রস্ত হ'য়ে পড়িবার নাহিকো সময়;
উদ্যমের ব্যথা নাই—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়;
এইখানে কাজ এসে জমেনাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে;
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর;
ভালোবাসা আসিবে না—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর।"

জীবনানন্দ বিশেষকে অবলম্বন করে যেন নির্বিশেষে পৌছতে পারছেন না তার একটা আভাস এখানেই পাওয়া গেছে। অভিসারী কবিদের মতোই তিনিও পলাতক কিন্তু তফাতটা হচ্ছে অন্যেরা জীবন থেকে জীবনে, তিনি জীবন থেকে মৃত্যুর পাণ্ডুরতায়। জীবনানন্দের জনপ্রিয়তার পেছনে এই 'পাণ্ডুর শিল্পবোধ' নিদারুণ সক্রিয়। সমাজকালের প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু মানুষ প্রচণ্ড আবর্তের

মধ্যেই নিশ্চেতনায় আক্রান্ত হন—জীবনানন্দের কবিত্ব তাদের পৃষ্ঠ পোষণা করেছে। যে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কবির অনাগ্রহ সুঘোষিত তাদের কাছ থেকে তিনি পালাতে চেয়েছিলেন সবুজ বাংলার প্রাকৃতিক কোণগুলোতে—তাঁর নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির অহংকার তাঁকে অনুসরণ করেছে যার প্রভাবে অসহন চিত্রকল্প রচনায় তিনি দক্ষতা প্রতিপন্ন করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা মাটির হলেও তার অন্দরমহলের নিরাভরণ মাধুর্যটুকু আহরণ করতে পারে নি—কবিচিত্তের 'বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার স্পর্শে বাংলা শুধু রূপসী হয় নি বুদ্ধিজীবীদের কাছে আদরণীয় হয়েছে। এই কারণেই ঝরা পালক কবিকে পরিচিতি দিয়েছে মাত্র, প্রতিষ্ঠা দেয় নি—ধূসর পাণ্ডুলিপিতে পুনরাবর্ত এবং বনলতা সেনে অসহজ চিত্রকল্পের গাঢ়তা জীবনানন্দকে কিছু বুদ্ধিজীবী সমর্থক সংগ্রহ করে দিয়েছিল। যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছিলাম না, নজরুল দেশাত্মবোধে আপ্লুত হয়েছিলেন এবং মোহিতলালের ঋজু চিন্তা গ্রহণ করার মতো শক্তির অভাব ছিল ঠিক সেই কারণেই জীবনানন্দ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করলেন। তাছাড়াও এই প্রসঙ্গেই বিভূতিভূষণের কথাটা মনে পড়ছে। যে কারণে তিনি বাঙলাদেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলের মুগ্ধচেত শিল্পী হিসেবে সাহিত্যরসিকদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন—জীবনানন্দের জন্যেও সেই পথ খুলে গেছিল। পল্লীশিল্পীর যা উপাদান ছিল এখন তা নাগরিক স্পর্শ নিয়ে বিদগ্ধ এবং অবিদগ্ধ নাগরিক সমাজে পরিবেশিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মধ্যে স্বাদপরিবর্তনের ব্যাপারটা ঘটে গেল। চিত্রকল্পনির্ভর জীবনানন্দের কাব্য সেইকারণেই স্বাদু বাঙলাকে অবসাদের পটভূমিতে নতুন করে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিভূতিভূষণের মতো তিনিও জনপ্রিয় হতে থাকলেন। অথচ ভোলার উপায় নেই যে বিভূতিভূষণের সমর্পিত প্রাণের প্রকৃতি-আরতি এবং শিশুপ্রাণের বিস্ময় ও মুগ্ধবোধ কোনোটিই জীবনানন্দের অবলম্বন নয়। জীবনানন্দের বড় সম্পদ চিত্রকল্পের বর্ণ-ধ্বনি সামর্থ্য যার মধ্যে প্রকৃতিকে মুচড়ে নিয়ে (twisting the nature) ফোঁটায় ফোঁটায় রস ঝরিয়েছেন। বিভূতিভূষণের 'পজিটিভ' বক্তব্য সহজে প্রকৃতির রস সঞ্চার করতে পারে বলে তাঁর দুঃখগুলিও প্রবাহিত হয়ে সরে সরে যায়। জীবনানন্দের 'নেগেটিভ' মানসিকতা জীবনের দুঃখগুলোকে শিশিরের ফোঁটার মতো সঞ্চিত করে রেখে দেয় তারপর আলো ফুটলেই মাটি সব শুষে নেয়। সেইজন্যেই সুখের লগ্নে নয়, দৈন্যের মুহূর্তে, অসহায় পর্বে জীবনানন্দকে পরম আত্মীয় বলে মনে হয়,

হাজার বছরের পথচলা অবসন্নতা পেয়ে বসে, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, যেখানে প্রবেশাধিকার না থাকায় নায়কের বসে বসে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না · জীবনানন্দের সঙ্গে সেই সব মুহূর্তে ব্যর্থতায় আক্রান্ত মানুষ সমীকৃত হয়ে যায়। একটা অবলম্বন পাই—ভালো থাকি। সেইজন্যেই বলেছি প্রত্যয়হীনতাই জীবনানন্দের পথ—এর জন্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা, এর জন্যেই তিনি হয়তো কঠিনতম বিচারের মুখোমুখি হবেন।

যেদিন সমাজকালের পটভূমিতে রেখে তার কাব্যের মূল্যায়ন ঘটবে—অন্তত কোনোদিন যদি ঘটে আদৌ—সেদিনের জন্যে জীবনানন্দের পক্ষে আমরা একটা কথা বলে রাখতে চাই। বিশশতকের প্রথমার্ধে মূল্যানুসন্ধানের নানান পর্বে—অনেকেই পুরাতন মূল্য ত্যাগ করেছেন—কিন্তু নতুন মূল্যমান খুঁজে পান নি। খুঁজে খুঁজে হয়রান সেই সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন বলেই জীবনানন্দকে ইতিহাস উপেক্ষা করবে না। ধূসর পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ রচনা এইদিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। 'ক্যাম্পে', 'শকুন', 'স্বপ্নের হাতে' সেই অসাধারণ ক্লান্তির নির্বিশেষ চিত্রকল্প।

"যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা ম'রে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এলো যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন ;
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে— কথা ভেবে-ভেবে।
... ...
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।
পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে ; স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই।
... ...
তোমরা চলিয়া এসো সব !
ভুলে যাও পৃথিবীর ওই ব্যথা— ব্যাঘাত— বাস্তব
... ...
পৃথিবীর ওই অধীরতা
থেমে যায়— আমাদের হৃদয়ের ব্যথা

দূরের ধুলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে— ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয় ;
উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়।
পৃথিবীর পুরোনো সে—পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয় !
সময়ের হাত এসে মুছে দেখে আর সব—
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয় !

এর পর স্বীকার করতেই হয় জীবনানন্দের স্বপ্নবিলাস অনিবার্য ছিল। জীবনানন্দের চিত্রকল্পে রাজসিক আয়োজন রূপসী বাংলা ও বনলতা সেন। ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা, ধানসিড়ি, সাপের খোলস নীড় শীত, জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ অন্তরঙ্গ রূপকল্প। কিন্তু তার সবথেকে বড় বৈভব যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা—তার তীব্র উপস্থাপনা রূপসী বাংলাতেই প্রথম : 'গোলপাতার ছাউনির বুক চুমে' রচনায় 'কড়ি খেলিবার ঘর মজে গিয়ে গোখুরার ফাটলে হারায়' এবং এমন বিজন / শাদা পথ—সোঁদা পথ—বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে / চলে গেছে—দুটি ইমেজই পাশাপাশি রয়েছে 'দূর পৃথিবীর গন্ধে' কবিতায় এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা এত তীব্র যে অনুভবের যন্ত্রণাও সঞ্চার করে দেয়—

…একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে,
তবুও সে ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন
মউরির মৃদু গন্ধে ভ'রে র'বে ;—কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হ'য়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে
পৃথিবীর সব দেশে—

'সবুজ মৃদু ঘাস', 'পাখির হৃদয় ঘাসের মতন', 'নক্ষত্রের নীল ফুলে' অনুভূতি প্রতিসরিত হতে থাকলেও জীবনানন্দ বললেন,—

'আকাশের বুকে তারা যেন চোখ—শাদা হাত—যেন স্তন—ঘাস—।'

বনলতা সেনে এসে কবি স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারলেন—এবং সেটা জীবনগত হতাশা। এর আগে বার বার নানা চিত্রকল্পে যা কিছুকে গ্রহণ করেছেন

সকলকে তিনি অন্ধকার কফিনে ঢুকিয়ে নিলেন। তখন সব আলো নেভে, অতিপ্রিয় রোদ মাখা চিলও নেমে আসে শুধু 'জোনাকির রঙে ঝিলমিল' কিছু গল্প জেগে থাকে। মৃত্যুর চোখ দিয়ে এদের দেখতে হয় অথবা কিছুই দেখা যায় না। তবু 'আমাকে তুমি' কবিতায় 'পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়', যখন—'খর রৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায় / এই দুপুরের বাতাস। তবু ভুলতে পারেন না জীবনগত হতাশা যে নেগেটিভিটি অবশেষে তাঁর কাব্যে পজিটিভ ব্যাপার হয়ে দেখা দিলে একেবারে স্পষ্টভাবে :—

মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার
এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।

ফলে 'তুমি' কবিতায়··· পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

এই জন্যেই জীবনানন্দের কাব্যে প্রত্যয়হীনতাকে বড় স্পষ্ট করে মনে পড়েছে। এমন কি সংকটের মুহূর্তে কোনো উত্তরণের পথ কবিচিত্ত পায় নি—যেখানে বিশেষ নির্বিশেষ হয়ে ওঠে। 'অন্ধকার' কবিতায় এক অসাধারণ যন্ত্রণা দেখেছি যার বশিষ্ঠতা জীবনানন্দ-সুলভ নয়—

'মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।

যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি
শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এই সব ভয়াবহ আরতি।

অতএব নিষ্ক্রিয় জীবনের প্রার্থনায় জীবনানন্দ বললেন,—

'ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো—ধীরে—পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগবো না জেনে—

কোনোদিন জাগবো না আমি— কোনোদিন আর।

ভাবতেও অদ্ভুত লাগে ঘৃণিত কলকাতায় ট্রামের ধাক্কায় তিনি নিহত হলেন— এবং কোনোদিনই আর জাগবেন না। অথচ বেদনার্ত কবি অনেকদিন আগে 'আবহমান' কবিতায় অনুভব করেছিলেন—

সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ;
তবু তারা করেনাকো পরস্পরের ঋণশোধ।

এই সব চেতনা যা বিশিষ্ট চিত্রকল্পের জন্ম দিয়েছে তার পেছনে থাকা সত্যটি 'তোমাকে' কবিতায় আত্মগোপন করে আছে। সেখানে 'আবিষ্ট পুকুর' 'নির্জন জলের রং' পার হলে দেখি :

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত :
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

মহাপৃথিবী কাব্যে একই চেতনার সঞ্চার ঘটছে। ফলে তার নিজস্ব অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। 'হাজার বছর খেলা করে' কবিতায় সেই বনলতা সেন, শব, সিন্ধুসারস সব যেন একই রকম। ইমেজের দিক থেকে হঠাৎ চোখে পড়বে খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত বিচূর্ণ থামের মতো' [হাজার বছর] অথবা 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ' [হায় চিল] মনের মধ্যে পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলনায় প্রকৃষ্ট প্রতিপন্ন হবে।

বুনো হাঁস, 'শঙ্খমালা' বিড়াল সবই সেই করুণ ক্লান্তিকে টেনে আনছে, কারণ জীবনানন্দ স্বীকার করছেন—

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রং-এর সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো। [বিড়াল]

মহাপৃথিবীর দুটি কবিতা গুরুত্বের প্রশ্নে লক্ষণীয়। জীবনানন্দের দুঃখের একটা হদিস যেন পাওয়া যায়। নগ্ন নির্জন হাত কবিতায়। তরল দুঃখ যেন চকিতে রোম্যান্টিক ক্রস্ট্যাল হয়ে উঠতে চেয়েছে—

'যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,

সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠছে।
মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।'

ইংরেজ কবিদের রূপকল্প বিভিন্ন সময়ে জীবনানন্দকে প্রভাবিত করেছিল সেটা দোষের কিছু নয়—বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেই অল্প বিস্তর প্রভাবিত। প্রভাবিত না হয়েও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার তীব্রতায় যিনি স্মরণীয় তিনি গোবিন্দচন্দ্র দাস। প্রভাবিত জীবনানন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার গুণে গোবিন্দচন্দ্র দাসের উত্তরসূরী। ইংরেজ কবি Burns অভিসারী আবেগে Sods of grass হতে চান—কথাটা মনে পড়ে 'ঘাস' কবিতা পড়লে—সাধর্ম্যের দিক থেকেই। জীবনানন্দের এই আশ্লেষই তাঁকে সাহিত্যের আসরে দীর্ঘজীবী করবে—

'এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।'

'সাতটি তারার তিমিরে' জীবনানন্দসুলভ ইমেজগুলো কিছু অন্যকথা বলেছে যা পরবর্তীকালে স্থায়ী হতে পারে নি। ঝরা পালকের যুগে যে জীবনকে তিনি এড়িয়ে গেছেন এই পর্বে তাকে আর উপেক্ষা করতে পারেন নি বললেও এক বিশেষ ধরনের ঋজুতা এসেছে এমন কি শ্লেষাত্মক আঘাতও তিনি করতে পেরেছেন, 'সমাদর' ইত্যাদি কবিতা তার দৃষ্টান্ত। জীবনানন্দের মানসিক ধারার সাতটি তারার তিমির যথার্থ ব্যতিক্রম—যার আত্মাও শরীরের অস্থিমজ্জা সবকিছুকে এই আলোচনার ধারায় স্থাপন করা যায় না। করলে অন্যায় হবে কারণ তাতে কাব্যটির নিজস্ব মূল্য হারাতে পারে। জীবনানন্দের প্রিয়—এবং তার পাঠকদেরও প্রিয় সেই অসহ ক্লান্তির প্রবাহ আসলে সাতটি তারার তিমিরে উপজীব্য নয়—বরং যন্ত্রণাগত একটা দীপ্তি আছে সেখানে। বলা যায় না, বনলতা সেনের প্রতিপত্তি একাব্য কোনোদিন ক্ষুণ্ণ করলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। অবশ্য সেটা কবিতার গ্রাহক সমাজের ওপর নির্ভর করছে।

'বেলা অবেলা কালবেলা'তে জীবনানন্দ অভিভূত। উজ্জ্বল জগতে নয়—প্রত্যয়ের পরিমণ্ডলেও নয়—একাধিক অভিসারী কবির মতো তিনিও মিস্টিক কবির পরিণাম এড়াতে পারছিলেন না। সে পরিণতির সূচনা হয়েছিল,

'মাঘসংক্রান্তির রাতে' 'কিংবা সূর্যনক্ষত্র নারী' পড়লেই তা বোঝা যায়। কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন—

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।

অথবা অনুভব করেন 'জন্মজন্মান্তের মৃত স্মরণের সাঁকো'। জীবনানন্দের অভিজ্ঞতার প্রতিস্ফূর্তি লক্ষ্য করতে তাই অনুরোধ করি,—

"আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে বিদ্যুতের মতো
তুমি যে শরীর নিয়ে র'য়ে গেছ, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু—হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষমানুষ?—
ভাবি আমি; — জানি আমি, তবু
সে-কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার নেই;—
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হ'য়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে।

[সূর্য নক্ষত্র নারী]

না, এইসব রূপকল্পের মধ্যে যে জীবনানন্দকে বাঙালী পাঠক ভালোবাসে সেই কবি-ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এখানেই এ আলোচনা শেষ হওয়া শোভন।

জীবনানন্দের জগৎ

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

যে-বয়সে পরীক্ষা পাশের তাগিদে পাঠ্য বইয়ের কবিতা মুখস্থ করতে হয়, ঠিক সেই বয়ঃসীমার শেষাশেষি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়তে শুরু করেছিলুম। ক্যালেণ্ডারে নির্দেশিত তারিখটা মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, 'ঝরা পালক'-এর একটি কবিতার নাম, 'মৃত্যুর আগে' বড ভালো লেগেছিল।

কিন্তু কেন? কি কারণে এই ভালো-লাগা?

মনে হয়, প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে যে-প্রখর বিষাদ লুকিয়ে থাকে, তারই ছোঁয়াচ লেগেছিল আমার মনে। যাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না, তেমনি একটা ভালো-লাগার সম্মোহ ছিল ঐ কবিতায়।

সে কি মৃত্যুর বিষাদ?

না, বোধ হয় না। মৃত্যুর আগে যে আসল আলো জ্বলে উঠলে চারদিক স্পষ্ট হয়, সমস্ত অতীত কোলাহল করে ওঠে, ইন্দ্রিয় সতর্ক হয় এবং পুরনো স্মৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটে—তেমনি এক আশ্চর্য আলোর স্পর্শ অনুভব করেছিলুম সেদিন। চেনা অথচ চেনা নয়, এমনি একটি ম্লান জগতের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। অনুভব করেছিলুম প্রতিদিনের ক্ষয় ও পতনশীলতার জন্য গভীর ক্ষমতা : The woods decay and decay and fall.

সৃষ্টির আদি-মুহূর্ত থেকে যে-ক্ষয়, যে-পতন চলে আসছে, যাকে কোনো সম্পন্নতা দিয়ে ঢাকা যায় না, তারই জন্য ফেলেছিলুম গোপন দীর্ঘশ্বাস। যতদূর চোখ যায়, সৃষ্টির যতদূর ব্যাপ্তি আছে, ততদূর এই হাহাকার ও পতনের সীমা প্রসারিত। হেমন্তের মাঠে দাঁড়িয়ে হয়তো সেজন্যেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন জীবনানন্দ। তাঁর একদিকে ভাঁড়ারের সম্পদ, অন্যদিকে ধান-কাটা মাঠের রিক্ততা।

জীবনানন্দের জগতে প্রবেশের বোধহয় সেটাই ছিল আমার কাছে বড় টান, বড় আকর্ষণ।

আমি শুনেছিলুম, তাঁর ডাক, তাঁর সংকেত। এমনি গোপন নগর মায়াবী যে, তাতে সাড়া না দিয়ে পারি নি। প্রতি মুহূর্তে আমাদের চারদিকে যে স্মৃতির উৎসব চলছে, দেখেছি তারও কানামাছি।

২

আর কি কি দেখলুম তাঁর জগতে? কাদের নিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য? সেই পরিচয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। বিদেশীর মতো আমি তাঁর জগতে প্রবেশ করেছিলুম। আজও সেই বিদেশীই রয়ে গেছি। স্বভাবতই আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত।

দেখলুম, তাঁর জগতে মানুষের সংখ্যা কম। কারু পুরো শরীর দেখা যায় না, মুখের আদল, অস্পষ্ট, রহস্যময়। এবং তারা যে-ভাষায় কথা বলে, সে-ভাষায় কোনো বাস্তব মানুষ কথা বলে না। অথচ একেকটি অসম্পূর্ণ সংলাপ যেন অনেক না-বলা কথাকে সম্পূর্ণতা দেয়।

স্বভাবতই তাঁর জগতে সংলাপের চেয়ে ইঙ্গিতের ব্যবহার বেশী।

মনে পড়ে, ভালোবাসার উত্তাপে আলোচিত হবার সময়, আমি তাঁর 'বনলতা সেন' পড়েছিলুম। এবং ঐ একই কাব্যগ্রন্থের আরেকটি কবিতা 'সুরঞ্জনা'। অতি পৃথিবীর আলোকে ঢাকা তাদের চোখ-মুখ, তাদের হৃদয়। এরা কেউ পৃথিবীর নয়, তবু যেন 'পৃথিবীর বয়সিনী কোনো এক 'মেয়ের মতন'।

সেদিন অনুভব করেছিলুম, জীবনানন্দের মেয়েদের সঙ্গে গল্প করা যায়, ঘর-বাঁধা চলে না। ভিখিরীর জন্য তিনি অনেক ঐশ্বর্য দিয়েছেন, যা উপভোগ করা যায়, দ্বিতীয় কাউকে ডেকে বলা যায় না: এই যে দেখো, কী সম্পদে আমি সম্পদশালী!

পরে, তাঁর জগতে কিছু পুরুষের প্রবেশ ঘটেছে। কেউ-বা কুষ্টরোগী, কেউবা পণ্ডিত। জীবনানন্দের ভালোবাসা ছিল না তাদের প্রতি। আর, যে-চাষী তাঁর ভালোবাসা পেয়েছে, সে এক রহস্যময় পুরুষ। জীবনানন্দের মাঠে সে-ই ফলিয়েছে অজস্র ফসল।

স্বভাবতই তাঁর জগতে পথের চেয়ে প্রান্তর বেশী।

রাস্তাঘাট চেনা চেনা, আকাশে সোনালি ডানায় চিল, কিছু সারস, অজস্র পাখি, কিন্তু শব্দহীন—স্পর্শগন্ধময় এক আশ্চর্য সমারোহ। আছে গাছগাছালি —বাবলা, আম, জাম, নিম, হিজল—অধিকাংশই অচিহ্নিত। জীবনানন্দ তাদের নামকরণ করে নি, কিন্তু সবকিছু থেকে যে-সবুজ আলো ফুটে ওঠে, তার আভায় আমাদের পথ দেখিয়েছেন। আছে অজস্র ঘাস, শিশিরের জল।

আমি তাঁর জগতে প্রবেশ করে, গ্রীষ্মের উত্তাপে কষ্ট পাই নি, বর্ষার উৎপাতে কিছু বোধ করি নি। দেখেছি, শীত আর হেমন্তের কুয়াশা ও হলুদ আলো। দেখেছি, আদিগন্ত ধান-কাটা মাঠ, ভাঁড়ারের ধারে ইঁদুর, অন্ধকারে পেঁচার অবিরল যাতায়াত।

আহ্নিক গতির নিয়মে সময়ের যে-পরিবর্তন ঘটে, তাতে সকাল, সন্ধ্যে আর রাত্রির মুখই দেখেছি বার বার। দুপুর বড় ক্ষণস্থায়ী। যেমন ঋতুর ক্ষেত্রে শীত-হেমন্ত ছাড়া অন্য ঋতুর প্রাধান্য কম। মাঝে মাঝে, ঘুরে-ফিরে একটা বেড়ালের সঙ্গে দেখা হয়।

এই দেখার মধ্যে কোনো ছল ছিল না। সেদিন তো নয়ই, আজও নয়।

আজো দেখি, তাঁর জগতে মৃত নক্ষত্রের ভিড়, কড়ির মতন শাদা মুখ, ধবল বক, ক্লান্ত কাক, গভীর হাওয়ার রাত, বালির ওপরে জ্যোৎস্না, রাত্রির অন্ধকার, ইতস্তত খেজুর ছায়া, সন্ধ্যার ভিজে আঁধার—সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য জগতের আবহ।

এখানে আছে, ধানসিড়ি নদী, রূপশালি ধান, ধানের দুধ, খালবিল, সোঁদা গন্ধ। এখানে বধিরের ঠাঁই নেই। প্রতিটি বস্তুই অলৌকিকভাবে সজীব। প্রত্যেকেই ভাষা হয়ে উঠতে চায়। এমন কি যে-রৌদ্র বিকেলের মাঠকে রহস্যময় করে তোলে, তার গন্ধে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়। লৌকিক জগতের প্রান্ত ছুঁয়ে এ যেন এক অলৌকিক জগতের অবস্থান।

৩

জীবনানন্দ বলতেন, প্রকাশ করার আগে নিজেকে ভালো করে জেনে নিতে হয়। এবং এই জানা যেমন-তেমনভাবে হলে চলে না, পুরোপুরি হওয়া চাই।

কথাটা আমি ভেবেছি অনেকদিন, 'রূপসী বাংলা' পড়তে পড়তে। কোথায় ছিল, জীবনের সঙ্গে তাঁর 'সুভঙ্গ-লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ'? জীবনানন্দের জগতে প্রবেশ করে, এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলুম, সম্বন্ধের ধূসরতায় ও নতুনত্বে। দেখেছিলুম, বাংলাদেশের মুখ, অনিঃশেষ এই দেখা।

আজও দেখি, নক্ষত্রময় নীল-আকাশ, জাফরান রঙের রৌদ্র, চতুর্দিকে মাটির সোঁদা গন্ধ। দেখি, একজন পর্যটক ইঙ্গিতে আমাকে ডাকছেন : দেখো, এই রৌদ্র জ্যোৎস্নার খেলা, এইসব ফসলের মাঠ,—মাঠের ফসল। দেখো, এই নদী, আমি তার হৃদয় থেকে কথা বলি। অতিপৃথিবীর আলো এসে পড়ে এখানে, এই অনৈতিহাসিক ইতিহাসের দেশে সীমান্তহীন ভৌগোলিকতার ওপর।

আমার বাস্তবে-দেখা পৃথিবীর সঙ্গে তার মিল অনেকটা, তবু যেন সম্পূর্ণ মিল নেই,—অমিলের ভাগটাই বেশি।

জীবনানন্দ যেন বলেন, এই আমার বাংলাদেশ, এখান থেকেই আমি যাত্রা

করেছি গোটা পৃথিবীর দিকে, মানুষের হৃদয়-অভিমুখে, ইতিহাসের পথে, সময় থেকে নিঃসময়ে। এখানকার সবুজ আলো আমার চোখে-মুখে, অন্তঃসত্তায়। পায়ের তলার মাটিকে চিনে, জীবনানন্দ চেনালেন তার রূপ, তার ভাষা, তার সংগীতময় সংলাপ। যেহেতু অতি-মানবীয় স্পর্শে সবই রহস্যময়, সেই হেতু কুয়াশার আবরণ এই জগতের অপরিহার্য একটি চন্দ্রাতপ।

আসলে, তাঁর জগতে আমি কোনো বস্তু দেখি নি, দেখেছি বস্তুর হৃদয়। আমরা সাধারণত বস্তুকে বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে অভ্যস্ত। তাঁর জগতে সেরকম বস্তুর ভার নেই, থাকলেও সামান্যই, অনেকটা আসবাবের মতো। অভিধানে যেমন অনেক অব্যবহার্য শব্দের মানে থাকে, জীবনানন্দের জগতেও তেমনি কিছু বাহুল্য থাকা অসম্ভব নয়। তাঁর জগতের বাসিন্দারা তাদের পায়ে মাড়িয়ে চলে যায়, জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে না।

জীবনানন্দ নদীকে দেখেছেন, হৃদয়ে ধারণ করে, কিংবা তার স্রোতোধারায় অবগাহন করে। আকাশ এবং প্রকৃতিকে দেখেছেন অন্তঃসত্তায়। সবই সজাগ এবং সতর্ক, ভাষাময় এবং আলোড়িত। কিন্তু সেই ভাষা ও আলোড়নের কোনো মানবীয় অভিব্যক্তি নেই, আছে অতিমানবীয়— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি।

৪

এবং দেখেছি, এক আশ্চর্য আঁধার, যে-আঁধার আলোর অধিক,—নিজেকে চেনায়, অন্যকে চিনতে সাহায্য করে, জীবনানন্দের জগৎ জুড়ে আছে সেই অন্ধকার। এই অন্ধকারে অনেক দূরের বস্তু নিকটে চলে আসে, সময় সীমা হারায়। এই অন্ধকারের আছে অদ্ভুত এক আত্ম-আবিষ্কারের আলো।

তাহলে জীবনানন্দ কি বিশ্বাস করতেন, সেই অতিপৃথিবীর আলো-কে, যার স্পর্শ পেলে আর কোনো মানবীয় ভাষার প্রয়োজন হয় না? তিনি কি বুঝেছিলেন এমন কোনো ভাষা কিংবা ভঙ্গী আবিষ্কৃত হয় নি, যা মানুষকে সম্পূর্ণ করতে পারে?

হয়তো বুঝেছিলেন, হয়তো বোঝেন নি।

য়ুরোপীয় বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যিকরা, জীবনানন্দের জীবিতকালেই খুঁজে পেয়েছিলেন এমনি এক আলোকিত অন্ধকার। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, (এখনো অনেকে করেন) মানুষ কথা বলে, সংলাপ উচ্চারণ করে, নিজেকে গোপন করে। কেননা, প্রতিদিন প্রতি-মুহূর্তে যে আশ্চর্য ভাবনার বিকিরণ হচ্ছে, তাকে পরিপূর্ণভাবে—অবিকৃত ও অখণ্ডভাবে তুলে ধরার মতো কোনো মানবীয় ভাষা আজো আবিষ্কৃত হয় নি। সম্পূর্ণকে অসম্পূর্ণতা দিয়ে প্রকাশ

করা যায় না। সেই আলোকময় অন্ধকারে প্রবেশ করলেই প্রকৃত ছবিটা ধরা পড়ে।

জীবনানন্দ সচেতনভাবে হয়তো এই অন্ধকার সৃষ্টি করেন নি। তবে বুঝেছিলেন, মানবীয় ভাষার অসম্পূর্ণতার কথা। তাঁর জগতের প্রতিটি প্রাণী ও অপ্রাণী, আকাশ এবং প্রকৃতি, মানুষ ও মাটি সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে উপলব্ধি করেছে এমন এক অন্ধকারের অস্তিত্ব, যে-অন্ধকারে প্রতিফলিত দেশ জাগ্রত হয়, সঙ্গতি সৃষ্টি করে, যেন হৃদয়ের ভিতরে হৃদয়।

অবশ্য জীবনানন্দের জগতে মাঝে মাঝে এসে পড়েছে বস্তুজগতের ছায়া, প্রকৃত অন্ধকার। এসবই আকস্মিক উৎপাতের মতো। নীরস পাণ্ডিত্যের বোঝা বয়ে যাঁরা সমাজ-শাসন করেন, তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতে গিয়ে তিনি দেখেছেন সেই বহির্জাগতিক অন্ধকারের মুখ: "শেয়াল ও শকুনের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

৫

আমি জীবনানন্দের জগৎ পর্যটন করে দেখেছি, নিঃসময়ের ডাকে তিনি অধিকতর স্বচ্ছন্দ হলেও সময় তাঁকে ক্ষমা করে নি। বাইরের পৃথিবী তাঁকে ডেকে গেছে। তিনি তাতে সাড়া দেন নি, কিংবা দিলেও নিজের জগৎ থেকেই তা মুখ বাড়িয়ে সামান্য আলাপ মাত্র, যেন জানালা খুলে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলা।

জানিনা, মন্তব্যটা ঠিক হলো কিনা। বিচারকের রায় ঘোষণা করা আমার কাজ নয়। তাঁর জগৎ ঘুরে এসে কেউ বিচারকের আসনে বসতে পারে বলেও আমার মনে হয় না, কেমন যেন খটকা লাগে।

প্রথম দুটো কাব্যগ্রন্থ—'ঝরা পালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়ার পর, তাঁর জগৎ সম্পর্কে যে এলোমেলো ধারণাটা জন্ম নিয়েছিল, তারই শেকড়ের সন্ধান পেলুম 'রূপসী বাংলা'য় এসে, অনেকটা স্থিরতর আলোর ভেতর, জন্মভূমির নিবিড়তায়।

আর, এখানেই লেখা হয়ে গেল তাঁর আত্মপরিচয়, পূর্ণ ইতিহাস। এখান থেকেই তিনি সঞ্চয় করছেন যাবতীয় অভিজ্ঞতা, পৃথিবীর আলো, অতি-পৃথিবীর আকাশ, এবং জীবনযাপনের পদ্ধতি ও প্রণালী। এখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন, কবিতার অস্থি ও প্রয়োজনীয় অলঙ্কার। আর, যাত্রা করেছেন 'মহাপৃথিবী'র দিকে।

সত্যিকথা বলতে কি, এই পর্যটনের সঙ্গী হতে মন্দ লাগে না।

জীবনানন্দের জগতে, এতদিন পাঠ্যবস্তুর অভাব ছিল। বিশেষ করে ইতিহাসের উপাদান, নাম ধাম, এত কম ছিল যে বস্তুপিপাসু মানুষের তৃপ্তি মিটছিল না। বোধহয়, 'ঝরা পালক'-এ পিরামিডের উল্লেখ ছিল।

'বনলতা সেন' থেকে তিনি এমন সব প্রাচীন সভ্যতা, শহর-বন্দর ও সমুদ্র-দ্বীপের নাম উচ্চারণ করতে থাকেন, যাদের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় কস্মিন-কালেও ছিল না, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল জীবনানন্দের ঘরে, রূপসী বাংলার আলোয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে-সব স্মৃতি সঞ্চিত হয়েছিল, তাদেরই যেন মুখ দেখলুম, খুব কাছ থেকে, ঘনিষ্ঠ হয়ে।

যেহেতু জীবনানন্দ পর্যটক, বেশীর ভাগ সময়েই ভ্রাম্যমাণ, সেহেতু তাঁর পথ সংক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। বড় দীর্ঘ, বড় দীর্ঘকাল ঘুরে ঘুরে কেবল স্মৃতি সঞ্চয় করেছেন, কিন্তু বস্তুকে প্রাধান্য দিতে পারেন নি।

আসলে, এইসব নামধাম, তাঁর জগতে এসে মূল্য হারিয়ে ফেলে অচিহ্নিত হয়ে গেছে। সুদূর স্মৃতি যেন একটি দীর্ঘশ্বাস, আর অনিমেষ হাহাকারের মতো জেগে রয়েছে দীর্ঘকাল।

উত্তরকালে যখন তিনি নাগরিক হবার কথা ভেবেছিলেন, ভেবেছিলেন কিছু শহুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা, তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাঁর জগতে আর কোনো নতুন বস্তু রাখার মতো ঠাঁই ছিল না। সেজন্যই কলকাতায় এসে তিনি জনকোলাহল বেশী শুনতে পান নি। দেখেছেন রাত্রির নিঃসঙ্গ ট্রাম লাইন, ক্রমাগত সঙ্গহীনতায় ডুবতে ডুবতে, প্রান্তর হয়ে যায়।

কবি জীবনানন্দ প্রসঙ্গে

কল্যাণকুমার বসু

জীবনানন্দের জন্ম বরিশাল শহরে ৬ই ফাল্গুন, ১৩০৫, ইংরেজি ১৮৯৯ সালে। পিতা সত্যানন্দ, মাতা কুসুমকুমারী।

জীবনানন্দের পূর্বপুরুষ বিক্রমপুরের মুন্সি পরিবার নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। জমিদারীও ছিল। দস্যু ও কীর্তিনাশার অত্যাচারে অবস্থান্তর ঘটে। যাই হোক ৺চন্দ্রনাথ মুন্সি বাখরগঞ্জে সেরেস্তাদারী কাজ করে সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সত্যানন্দর পিতামহ ৺বলরাম দাশ কিছুকাল 'নেমকের' দারোগা ছিলেন।

জীবনানন্দর প্রপিতামহ বলরাম দাশ মহাশয়ের তিন পুত্র ৺তারিণীচরণ, ৺ভোলানাথ এবং ৺সর্বানন্দ। সর্বানন্দ সর্বকনিষ্ঠ। সর্বানন্দ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের একজন অন্যতম প্রচারকও ছিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং খাঁটি মানুষ, সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সর্বানন্দ দেহত্যাগ করেন কলেরা রোগে। শোনা যায় তাঁর দেহ নিয়ে বরিশাল শহরের চারদিকে প্রসেসন করার অনুমতি দিয়েছিলেন বরিশালের কালেকট্রি। সর্বানন্দর বংশতালিকা দেওয়া হল।

পিতামহ সর্বানন্দের পর পিতা সত্যানন্দের কথা। সর্বানন্দ যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন তখন সর্বানন্দের দুই পুত্র হরিচরণ ও সত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পরে আর পাঁচটি পুত্র এবং চারটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হিন্দু সমাজের আত্মীয়গণের সান্ত্বনার জন্যে সর্বানন্দ তাঁর প্রথম সন্তান হরিচরণকে হিন্দুসমাজের মধ্যে রেখে দেন। হিন্দু আত্মীয়রা কেউ ধনশালী ছিলেন না কিন্তু তাঁদের যে আন্তরিকতা তা এ যুগে বিরল। তখনকার কালে নানাবিধ সাংসারিক কার্য ঘরামীর কাজ, দরজির কাজ, মালির কাজ, সাধারণ ভৃত্যের কাজ, অফিস আদালত এবং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবে নানা প্রকার কাজে সর্বানন্দ পিছু-পা হতেন না। পুত্র হরিচরণ ও সত্যানন্দও সব কাজে পিতাকে সাহায্য করতেন। হরিচরণ এবং সত্যানন্দ বরিশালের জেলা স্কুলে পড়তেন। পরে দুই ভাইয়ের কলকাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুলে পড়া শুরু হয়। হরিচরণ কলকাতার একটি মেসে থাকতেন। সত্যানন্দের ভবানীপুরে স্বনামধন্য দুর্গামোহন দাশ

- বলরাম দাশ (দাশগুপ্ত)
  - তারিণীচরণ দাশ
  - ভোলানাথ দাশ
  - সর্বানন্দ দাশ
    - হরিচরণ দাশ (দাশগুপ্ত) — সুশীলাবালা
      - অমিয়া রায়
      - সুষমা দাশগুপ্ত
      - সুরুচি দাশ
    - সত্যানন্দ দাশ (দাশগুপ্ত) — কুসুমকুমারী দেবী
      - জীবনানন্দ দাশ — লাবণ্য দাশ
        - মঞ্জুশ্রী
        - সমরানন্দ
      - অশোকানন্দ দাশ — নলিনী দাশ
      - সুচরিতা দাশ
    - প্রিয়ম্বদা সেন — ব্রজেন্দ্রনাথ সেন
    - যোগানন্দ দাশ — প্রফুল্লকুমারী দাশ
      - নির্মলানন্দ
      - বিমলানন্দ
      - বেলা সেন
    - প্রেমদা চক্রবর্তী — মনমোহন চক্রবর্তী
      - কল্যাণ চক্রবর্তী
    - ডাঃ প্রেমানন্দ দাশ — সুপ্রভা দাশ
      - ডাঃ অমলানন্দ দাশ
    - স্নেহলতা দাশ (কুমারী)
    - বিনোদা দাশ (অল্পবয়সে মৃত)
    - অতুলানন্দ দাশ — সরযুবালা দাশ
      - জ্যোৎস্না দাশ
      - অরূপানন্দ দাশ
    - ব্রহ্মানন্দ দাশ — প্রভাময়ী দাশ
      - সুপ্রিয়া দাশ
    - জ্ঞানানন্দ দাশ (অবিবাহিত)

ও ভুবনমোহন দাশের বাড়িতে আশ্রয় মিলেছিল। সত্যানন্দ মাঝে মাঝে কলকাতার মেসে দাদার কাছে থাকতেন। সেখানেই একদিন ডাকযোগে অকস্মাৎ পিতা সর্বানন্দের মৃত্যু-সংবাদ পেলেন। বিপদে দিশেহারা হরিচরণ ও সত্যানন্দ। বিপদের দিনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এলেন অপরাহ্নে একদিন—বলভরসা দিলেন। সহায় সম্পর্কহীন শোকসন্তপ্ত দু'ভাই বরিশালের বিয়োগকাতরা জননী ও অল্পবয়স্ক ভাই-বোনদের মধ্যে এসে কিছুকাল রইলেন। ব্রাহ্ম সমাজের যাঁরা সর্বানন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—দুর্গামোহন দাশ, রাখালচন্দ্র, জগচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত—তাঁরা এই দুঃস্থ পরিবারকে তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন। অশ্বিনীকুমার এই পরিবারের বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু—বরিশালের তিনি রাজার রাজা। অশ্বিনীকুমার সত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগানন্দর কলেজের সমস্ত ব্যয় বহন সেদিন করেছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই পারিবারিক এই দুর্ঘটনায় হরিচরণ ও সত্যানন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের আশা-ভরসা ফুরিয়ে গেল। জীবন সংগ্রাম শুরু হল। হরিচরণ পোস্ট অফিসে চাকরি পেলেন। সত্যানন্দর হরিগঞ্জে শিক্ষকতা আরম্ভ হল। এরপরে দুর্গামোহন দাশের একান্ত চেষ্টায় বরিশাল জেনারাল পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট জেনারেল অফিসে সত্যানন্দ চাকরি পেলেন। বলা হল এ চাকরিতে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলে মাসে ৩০০/৪০০ টাকা বেতন হবে। কিন্তু ঈশ্বরের বোধহয় তা ইচ্ছে নয়। কাজেই দুচার দিন থেকে সত্যানন্দ চাকরি ত্যাগ করে পরীক্ষা দিতে গেলেন। ইতিমধ্যে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে প্রবেশ করেছিলেন। হরিচরণও পোস্ট-অফিসের কাজ ত্যাগ করে স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেন। শিক্ষকতাই এই পরিবারের একমাত্র কর্ম। দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করে পরিবারটির দিন এগিয়ে চলল। হরিচরণ বার বার এফ এ পরীক্ষা দেবার জন্যে চেষ্টায় আয়োজন করেও সাংসারিক সংকটে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি। ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা এবং প্রাইভেট টিউশানীর মাধ্যমে অতিকষ্টে এই বিরাট সংসারকে দুই ভাই এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন।

বরিশালের সর্বানন্দ যেখানে বসবাস করেন—যে বাড়িতে তিনি দেহত্যাগ করেন বিশেষ কারণে তা সত্যানন্দ দাশ পরিবারের হস্তচ্যুত হয়। তারপর কিছুদিন বরিশালেরই একস্থানে ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন। কিছুকাল পরে ৺সর্বানন্দ দাশের বন্ধু স্বর্গীয় জগচন্দ্র দাশের পত্নী মুক্তকেশী গুপ্ত সস্নেহে তাঁর বসতবাড়ির এক অংশে হরিচরণ ও সত্যানন্দ দাশদের গৃহ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। সম্ভবত এইখানেই কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম হয়। 'গৃহ

নির্মাণ প্রসঙ্গে' কবির পিতা সত্যানন্দ লিখেছেন "আমাদের যে নিজ গৃহ থাকিবে না—বাড়ি থাকিবে না, দাদার তাহা সহ্য হইত না। গুপ্ত পরিবারের জায়গায় যে আমাদের দু-তিনখানি গৃহ ছিল তাহা দাদারই একান্ত যত্ন পরিশ্রমের ফল। তাহার পর যখন বাড়ির জন্যে জায়গা দেখা হইত—দাদার তখন অত্যন্ত উৎসাহ। বর্তমান বাসভবন নির্মিত হইবার পূর্বে আমরা এ জায়গা দেখিতে আসিয়াছিলাম, দুজন ব্রাহ্মবন্ধু আমাদের সাথী হইলেন। দাদার জায়গা ক্রয় করিবার একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহ—কিন্তু অর্থ নাই। সাধ্যের অতিরিক্ত কার্য করিতে আমি কোনদিনও অগ্রসর ছিলাম না কাজেই এ-বাড়ি করিতে আমি কোনদিনও উৎসাহ দেখাই নাই। বরং প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। দাদা উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে এ বাড়ি কোনদিনও হইত না। আমি আমার কোন বাল্য বন্ধু ও কোন সম্পদশালী ছাত্রবন্ধুদিগের নিকট হইতে ঋণ করিয়া অর্থদ্বারা দাদার বাড়ি নির্মাণে সাহায্য করিয়াছিলাম। এ ছাড়া সামান্য সামান্য পরামর্শ যাহা দিয়াছি—এতদ্ব্যতীত এ কার্যে আমি তাঁহার কোন সাহায্য করিতে পারি নাই। এবং ইহার অল্পকাল পরেই দৈব-দুর্বিপাকে আমাকে শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল। এই বাসভবনের নির্মাণ কার্য একমাত্র তাঁহারই চিন্তা-ভাবনার ফল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান যোগানন্দ অতঃপর পিতার নামে এই বাসভবনের নাম 'সর্বানন্দ ভবন' রাখিয়াছেন। কিন্তু 'সর্বানন্দ ভবন' রচনা দাদার জীবনের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য। দাদার জীবতকালেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় অতুলানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এ বাড়ির ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছেন।"

সর্বানন্দ ভবনের মূল জমি ছিল অর্জুন নারায়ণ দত্তের। অর্জুন দত্তের জমি দুভাগে বিভক্ত হয়। ১১ আনি—পুত্র কালীকুমার দত্ত পান, ৫ আনি পান ধনলক্ষ্মী দত্ত। পরে কালীকুমার দত্তের সম্পত্তি (জমি) নিলাম হয়। সম্পত্তি ক্রয় করেন রাজকুমার ঘোষ। রাজকুমার ঘোষের জমি ক্রয় করেন হরিচরণ দাশ (এগারো আনি অংশ)। এবং শোনা যায় বগুড়া পাড়ায় এ-জমিখানি ক্রয় হয় কবি জীবনানন্দর ঠাকুমার নামে। এগারো আনি অংশের জমির অর্ধেক নিলেন সর্বানন্দ-পরিবার। বাকি অর্ধেক দুভাগ হয়ে এক ভাগ নিলেন শ্রীমন্মথমোহন দাশগুপ্ত এবং একভাগ নিশিকান্ত বসু। পরে নিশিকান্ত বসুর জমি ও বাড়ি কিনে নিলেন মনমোহন চক্রবর্তী—সর্বানন্দের জামাতা।

সত্যানন্দ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় জীবন পার করেছেন। লোক প্রসিদ্ধ সফলতার চূড়ায় পৌঁছবার এরকম আশ্চর্য ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত নিজের ইচ্ছায় শিক্ষাব্রতই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সম্মুখে নানা

অর্থকরী পথ উদ্দীপ্ত হয়েছিল, মেনে নিতে পারলেই সে সবের যে কোন একটি উপায়কে তিনি সম্মানিত করতে পারবেন। কিন্তু তিনি সুচিন্তিতভাবে এবং আন্তরিক প্রেরণায় ঠিক করলেন যে তাকে শিক্ষকই হতে হবে। তিনি বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রচারক ' বরিশালের সে সময়ের ব্রাহ্ম প্রচারকদের মধ্যে ছিলেন মনমোহন চক্রবর্তী, মন্মথমোহন দাশ, কালীমোহন দাশ, রাজকুমার ঘোষ, জগচন্দ্র দাশ, রায় সাহেব হরকিশোর বিশ্বাস। বরিশাল থেকে দুখানি পত্রিকা প্রকাশ হতো। বরিশাল হিতৈষী যার সম্পাদক দুর্গামোহন সেন। এবং অন্যটি ব্রহ্মবাদী—ব্রাহ্মদের পরিচালিত পত্রিকা ব্রহ্মবাদী পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সত্যানন্দ দাশ। পরবর্তীকালে মনমোহন চক্রবর্তী পত্রিকাখানির পরিচালনা এবং সম্পাদনা করেছিলেন।

ব্রজমোহন বিদ্যালয় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষায় দীক্ষায়, নৈতিক চরিত্রে দেশের ছেলেদের এক আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। অশ্বিনীকুমারের স্বপ্ন—ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একসময়ে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে পরিগণিত হয়েছিল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষকতা করেছেন। প্রধান শিক্ষকমশাই, জগদীশচন্দ্র, পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কামিনী বিদ্যা-বিনোদ, সত্যানন্দ দাশ, হরিচরণ দাশ।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন "কার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলাম আমরা? তিন জন মানুষের কাছে—একজন, বাবা একজন মা আর একজন ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাস্টার জগদীশ মুখোপাধ্যায়। বরিশাল ইস্কুল থেকে পাস করে অনেক বড় বড় কলেজে পড়েছি, Universityতে পড়েছি। কিন্তু আজ জীবনের মাঝপথে এসে প্রতিনিয়তই টের পাচ্ছি যে আমার জীবনের শিক্ষার ভিত্তি এঁদের হাতেই গড়া, এক এক সময় মনে হয় মহাভারতের রচনাকর্তা বেদব্যাসের মতো দৃষ্টি নিয়ে এঁরা সবাই শিখিয়েছিলেন আমাকে, আমার জীবনে সে শিক্ষা যদি ব্যবহারিকভাবে ফলপ্রসূ না হয়ে থাকে তা'হলে তাঁদের কোন দোষ নেই। যদি মন-লোক কিছু সার্থক হয়ে থাকে তা'হলে এঁদেরই প্রশস্ত দানের ফলে। নানা নামী কলেজের বড় বড় অধ্যাপকদের কাছে পড়েছি বটে, সাহিত্যদর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক খবর যুগিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু বোধির অভাবে সে খবর পরীক্ষার খাতায় পর্যবসিত হয়ে ডিগ্রীদান করে অন্ধকারে বিলীন হয়েছে! জীবনের যা কিছু কাণ্ডজ্ঞান, মর্মজ্ঞান, রসস্বাদ, যা কিছু লোকসমাজের এষণাশক্তি কিংবা নির্জনে ভাবনা প্রতিভা যা কিছু

mother writ, যা কিছু সংবাদকে বিদ্যায় পরিণত করতে পারে, বিদ্যাকে জ্ঞানে—সমস্ত জিনিসেরই অন্তর্দীপণ ও বিধিনিয়ম এদের কাছ থেকে লাভ করার সুযোগ হয়েছিল আমার ”

বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধানশিক্ষক জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তর প্রিয়পাত্র ছিলেন। অশ্বিনীকুমার জগদীশবাবুর মতো আদর্শ শিক্ষকের হাতে বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। জগদীশবাবু ছাত্রদের অতি প্রিয়পাত্র এবং আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তিনি ব্রজমোহন কলেজেও 'লজিক' পারটাইমে পড়াতেন।

তৎকালীন ব্রাহ্মদের মতো তাঁর মুখও শ্মশ্রুযুক্ত। সৌম মূর্তি, গৌরবর্ণ দীর্ঘ শরীর।...সে-সময়ে ব্রাহ্মদের এবং হিন্দুদের মধ্যে কেমন যেন একটা দূরত্বের সম্পর্ক ছিল। ব্রাহ্মদের শ্মশান ভিন্নস্থানে, হিন্দুদেরও ভিন্নস্থানে। ব্রাহ্মদের শ্মশান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রতি মাঘোৎসবে ব্রাহ্মদের শ্মশান থেকে 'নগর সংকীর্তন' বেরুত। নগর সংকীর্তনে অবশ্য হিন্দুরাও থাকতো। দলের সঙ্গে থাকতেন বরিশালের ব্রাহ্মপ্রচারকগণ—ব্রাহ্ম যুবক, বৃদ্ধ, বালক-বালিকা সকলেই। আর থাকতো যজ্ঞেশ্বর, চারণকবি মুকুন্দদাস। তখনও তিনি মুকুন্দ দাশ হন নি। বিশাল দেহ মুকুন্দ দাশ তখন খোল বাজাতেন। মুকুন্দ দাশের কাছেই ব্রহ্মানন্দ (জীবনানন্দর খুড়ো) খোল বজানো শেখেন।*

জগদীশবাবু থাকতেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের জমিতে বিদ্যালয়েরই নির্মিত একটি কুঠিতে। সেখানে আরো কয়েকটি ঘরে কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্র থাকতেন। জগদীশবাবু বড় নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। জগদীশবাবু যেখানে থাকতেন সে জায়গাকে বরিশালবাসী সকলে বলতেন 'জগদীশবাবুর আশ্রম'। পরে জগদীশবাবুর মৃত্যুর পর সেই জায়গায় জগদীশ বালিকা বিদ্যালয় নামে এক বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়।

জগদীশবাবুর আশ্রমের কাছেই থাকতেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের পণ্ডিত কামিনী বিদ্যাবিনোদ এবং কালীশ বিদ্যাবিনোদ। কামিনী বড়, কালীশ ছোট। কামিনী বিদ্যাবিনোদ খুব নীতিবাগীশ পণ্ডিত ছিলেন। কালীশ বিদ্যাবিনোদ সারা বরিশালের মধ্যে নমস্য ব্যক্তি ছিলেন। 'কালীশ পণ্ডিতের' কথায় সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নত করতেন। তিনি মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তর

---

* এই প্রসঙ্গে জানা যায় চারণকবি মুকুন্দ দাশের অনেক প্রখ্যাত গান তাঁর রচনা বলে যেগুলি পরিচিত তাঁর অনেকগুলিই 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার সম্পাদক বরিশালের বিশিষ্ট ব্রাহ্মপ্রচারক ও কবি মনমোহন চক্রবর্তীর রচনা।

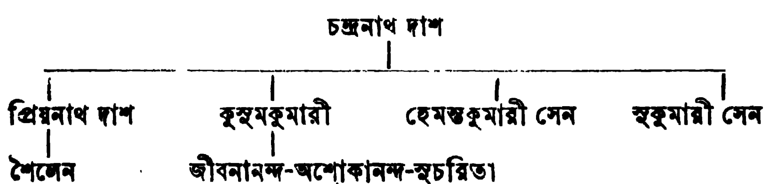
প্রেরণায় Little brothers of the poor বা 'আশাবাহিনী' নামে একটি সেবাদল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় ছিলেন। সেবাধর্ম তার প্রধান কাজ ছিল। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি অনেক রোগকে এবং রোগীকে লোকে বড় ভয় পেত—কোথাও কোনো রোগ হলে রোগীর ধারে কাছে কেউ যেতে চাইত না। পণ্ডিতমশাই তাঁর ছাত্রদলকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সেবাকার্যে এগিয়ে চললেন। যে কোনো কাজে ছাত্ররা পিছুপা নয়। বন্যাত্রাণে, আগুনে, সেবাকাজে, দাহকাজে তাঁর ছাত্রদল সব সময়েই অগ্রবর্তী। একবার একজন মুসলমানের পথের ধারে কলেরা হয়েছে। অবস্থা খারাপ, ধারে কাছে কেউ নেই। কালীশচন্দ্র তাকে পিঠে তুলে নিয়ে সদর হাসপাতালে উপস্থিত। তাকে ভর্তি করে নিতে হবে। কলেরা রোগীকে হাসপাতাল ভর্তি করবে না কারণ সংক্রামক ব্যাধির জন্যে হাসপাতালের কোনো ওয়ার্ড নেই। কালীশচন্দ্র সংকল্পে দৃঢ় 'তাহলে আমি রোগীকে কোথায় রেখে আসবো। পথের ধারে মারা যাবে বলে তো রোগীকে আমি তুলে আনি নি।' তাকে হাসপাতালে নিতেই হবে। শেষে কালীশচন্দ্রের জন্যে রোগীকে ভর্তি করা এবং কলের ওয়ার্ড খোলা হল।

কালীশচন্দ্র সাধারণত বি, এম স্কুলের অল্পবয়স্ক ছাত্রদের ডাক্তার ডাকা, ওষুধপত্র আনা, 'একে খবর দাও, ওকে খবর দাও' কাজে নিযুক্ত করতেন। বড়দের এবং বি, এম কলেজের বড় ছাত্রদের রোগীদের পাশে সেবাকাজে নিযুক্ত রাখতেন। রোগীদের সেবার কাজে—এবং সেবাকার্যে ছাত্রদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়েছিল। তবে অনেক ছাত্রদের অভিভাবকের পছন্দ ছিল না এই সেবাকাজ। কেননা বাড়ির ছেলে, এবং 'ছোঁয়াচে' রোগের ভয় থেকেই এই বিরুদ্ধতা। বরিশালের উকিল গোরাচাঁদ দাশ চাইতেন না তাঁর পুত্র সত্যভূষণ দাশ এমন কাজ করুক। সত্যভূষণের পরোপকারে নেশা ছিল। তাই তিনি লুকিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের কাজে নামতেন। সত্যভূষণ পণ্ডিত মশাইয়ের মৃত্যুর পর দলের নেতা হয়েছিলেন। পণ্ডিত কালীশচন্দ্রকে ছাত্ররা খুব ভালোবাসতো। জীবনানন্দের মনেও তাঁর প্রভাব পড়েছিল বৈ কি। কালীশচন্দ্র দেহরক্ষা করেন বরিশালেই। তাঁকে যেখানে দাহ করা হয় শহর থেকে দূরে ফাঁকা মাঠে, যেখানে একখানি ঘর করা হয়, যেখানে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় 'কলেরা ওয়ার্ড', এখন সেখানে লোকালয়। কাছেই বাজার। জীবনানন্দের সহপাঠী ছিলেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমলেন্দু সেন, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়?), শৈলেশ সেন, হরিজীবন ঘোষ।

হরিজীবন ঘোষের সঙ্গে বি, এম স্কুলে থাকাকালীন জীবনানন্দর পড়াশোনায় খুবই প্রতিযোগিতা হোতো। কবি পড়াশোনায় খুব ভালোই ছিলেন। সারা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় জীবনানন্দ হরিজীবনের থেকে এগিয়ে থাকেন সর্বদাই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে। পরে বি, এম কলেজে, প্রেসিডেন্সিতে পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনানন্দ পড়াশোনা করেন। এম, এ, পরীক্ষার সময়ে জীবনানন্দের শরীর খুব খারাপ হয়—ব্যাসিলারী ডিসেন্টিতে। পরীক্ষায় বসার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু সত্যানন্দ তাকে পরীক্ষায় বসতে বলেন। জীবনানন্দ ইংরেজীতে এম, এ। কিন্তু পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হল না।

জীবনানন্দর ছোট পিসিমা স্নেহলতা দাশ বরিশালে 'বড়দিদিমণি' নামে খ্যাত ছিলেন। বরিশালে 'বালিকা বিদ্যালয়' নামে একখানি পাঠশালা ছিল। পাঠশালাটির গোপাল পণ্ডিত ও বসন্ত পণ্ডিত পরিচালনায় ছিলেন। স্নেহলতা সেই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে যোগদান করে নামকরণ করেন 'সদয় বালিকা বিদ্যালয়'। তিনি স্কুলটির অনেক উন্নতি করে হাইস্কুলে উপনীত করেন পরে কতৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। স্নেহলতা বগুড়া পাড়ায় সর্বানন্দ ভবনের মধ্যেই আর একখানি বিদ্যালয় স্থাপন করেন—রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়। যাঁর অন্যতম পরিচালিকা কবি জীবনানন্দর জননী কুসুমকুমারী দেবী। কুসুমকুমারীর পিতা বরিশালের আলেকান্দা পাড়ার ব্রাহ্ম প্রচারক পিতা চন্দ্রনাথ দাশ বরিশালের পুরাতন অধিবাসী। তাঁর তিনকন্যা এবং এক পুত্র; নিচে কবি জীবনানন্দর মাতৃকুলের বর্ণনা দেওয়া হল।

কবি জীবনানন্দর মাতৃকুল



চন্দ্রনাথ দাশ অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন। তাঁর রচিত হাসির গান এক সময়ে পুর্ব বাংলার মানুষের বড় প্রাণের জিনিস ছিল। কবি কুসুমকুমারী সম্বন্ধে জীবনানন্দের রচনার মধ্যে পাই "আমার মা শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাশ বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতায় বেথুন স্কুলে পড়তেন। খুব সম্ভব ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপরেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। তিনি অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় খুব ভালো করতে পারতেন এ

বিষয়ে সন্তানদের চেয়ে তাঁর বেশী শক্তিই ছিল.. সাহিত্য পড়ায় ও আলোচনায় মাকে বিশেষ অংশ নিতে দেখেছি। দেশী বিদেশী কোন কোন কবি ও উপন্যাসিকের কোথায় কি ভালো, কি বিশেষ দিয়ে গেছেন তাঁরা, এ সবের প্রথম পাঠ তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি। শেলী ব্রাউনিং ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনেক ছোট ছোট কবিতা, তাঁর মুখে শুনেছি। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের দেশের কবিতার মোটামুটি ঐতিহ্য জেনে ও ভালোবাসে ও বিদেশী কবিদের কাউকে কাউকে মনে রেখে তিনি তাঁর স্বাভাবিক কবি জনকে শিক্ষিত ও স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন।...মা বেশী লেখার সুযোগ পেলেন না। খুব বড় সংসারের ভিতর এসে পড়েছিলেন যেখানে শিক্ষা ও শিক্ষিতদের আবহাওয়া ছিল বটে কিন্তু দিনরাতের অবিশ্রান্ত কাজের ফাঁকে সময় করে লেখা তখনকার দিনের সেই অসচ্ছল সংসারের একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠল না আর। কবিতা লেখার চেয়ে কাজ ও সেবার সর্বাত্মকতার ভেতরে ডুবে গিয়ে তিনি ভালোই করেছেন হয়তো। তাঁর কাজ কর্মের আশ্চর্য নিষ্ঠা দেখে সেই কথা মনে হলেও...তিনি আরো লিখলে বাংলা সাহিত্যে কিছু দিয়ে যেতে পারতেন।...মার কবিতার আশ্চর্য প্রসাদগুণ, অনেক সময়ে বেশ ভালো কবিতা বা গদ্য রচনা করেছেন দেখতে পেতাম। সংসারের নানান কাজকর্মে খুব ব্যস্ত আছেন এমন সময়ে ব্রহ্মবাদীর সম্পাদক আচার্য মনমোহন চক্রবর্তী এসে বললেন এক্ষুনি ব্রহ্মবাদীর জন্যে তোমার কবিতা চাই। প্রেসে পাঠাতে হবে লোক দাঁড়িয়ে আছে :"

আমার লেখা কোনো কবিতা তো নেই এখন ?

লিখে দাও। আমি বসছি।

"শুনে মা কলম খাতা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে এক হাতে খুন্তি আর একহাতে কলম নাড়ছেন দেখা যেত। যেন চিঠি লিখছেন। বড় একটা ঠেকছে না কোথাও, আচার্য চক্রবর্তীকে প্রায় তখনই কবিতা দিয়ে দিলেন। স্বভাব কবিদের কথা মনে পড়ে আমার। আমাদের দেশের লোক কবিদের স্বভাবী সহজতাকে। অনেক আগে প্রথম জীবনে মা কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। যেমন 'ছোট নদী দিন রাত বহে কুলকুল' অথবা 'দাদার চিঠি' কিংবা 'বিপাশার পরপারে হাসিমুখে রবি ওঠে।' একটি শান্ত, স্নিগ্ধ ভোরের আলো, শিশির লেগে রয়েছে যেন এ সব কবিতার শরীরে। সে দেশ মায়েরই স্বকীয় ভাবনা কল্পনার স্বীয় দেশ। কোনো সময় এসে সেখান থেকে এদের স্থানচ্যুত করতে পারবে না।"

যদি উপন্যাস, নায়ক জীবনানন্দ

সত্য গুহ

কারুর কাছে যদি জীবনানন্দ দাশের কবিতা ছন্দে সুরে মেধা ও হৃদয়বোধে বাঁধা একটা উপন্যাস মনে হয়, আমি তাতে আপত্তির কারণ দেখি না। হতেই পারে। তবে, নায়কের নাম জীবনানন্দ দাশ এবং নায়িকা রূপসী বাংলা। নায়ক ও নায়িকার জীবনকাল অনন্ত সময়গ্রন্থীতে বাঁধা। বিরহ মিলনের নাটকীয় সংঘাতের এক চূড়ান্ত মুহূর্তে অস্থিমজ্জারক্তমাংস মেধা ও হৃদয় সংবলিত জীবন—না, সর্বেন্দ্রিয় প্রখর মানবিক অস্তিত্ব আলিঙ্গনে পেয়েছেন শ্যামশ্রী ও মুখের বাংলাকে। অন্ধকারে—শুধু দু-দণ্ডের জন্যে এবং তাই-ই শান্তি। 'মুখোমুখি বসিবার শান্তি। এবং নায়কের স্বগত সংলাপ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।'

এবং এ মিলন রাজধানী—আধুনিক সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল প্রতীক কলকাতা থেকে দূরে, নির্জনে। তিনি একা। মানুষের কোলাহল—লৌকিক পৃথিবীর রিরংসা কাম ক্রোধ লোলুপতা, তার যান্ত্রিক জৈবিকতাকে অসহ্য মনে হয়েছে জীবনানন্দর। একে এড়িয়ে যেতেই তাঁর চলেছে ইতিহাসের দেশে দেশে অপূর্ব মানসযাত্রা। আধুনিক যুগ জটিলতা ও অশান্তির আবর্তকে অবহেলা করে তিনি তাই চলে গেছেন 'আরো দূর অন্ধকারে—বিদর্ভ নগরে' 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ'-এর স্মৃতি তার অস্তিত্বে—স্মৃতির কোঠায় মিসর ব্যাবিলন আশিরিয়ার প্রমৃত মরা-ধূলের স্তর। স্বপ্নিল জগতের গোটা ছবি মনে নেই, শুধু একটু একটু মনে পড়ে বিচিত্র সৌন্দর্য লোকের টুকরো টুকরো ছবি। হয়তো 'নগ্ন নির্জন হাত' নয়তো কারুকার্যময় তরমুজের হিম মদের পাত্র। আর কবির অভিজ্ঞতা থেকে খসে পড়া এই সব প্রায় জাগতিক আশ্চর্য বিস্ময়ের একটুকু ছোঁয়া পেয়েই পাঠকের হৃদয় ধরে গেছে। নায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হয়েছে তাকে। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় তাই জীবনানন্দই বড় বেশি।

অনিবার্যভাবেই 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক উপন্যাসের আধুনিক নায়ক জীবনানন্দকে সমগ্র পরিবেশ পরিস্থিতি ক্লান্ত করেছে। অসহ্য মনে হয়েছে জীবন যাপন। অন্ধকার কুয়াশা শীত, নির্জনতা, হেমন্ত, ধূসরতা, ফসল

কাটা হয়ে যাওয়া মাঠ, পাখির ঝরা পালক, পাখির নীড়ের থেকে খসে পড়া খড়, শর কাশ হোগলার ফিসফিস হিস-ইস আওয়াজ, সাপের খোলস, ভাঙা শামুক, জোনাকির নীল আলো ইত্যাদি রিক্ততা ও নির্জনতার অনুসঙ্গগুলো কবির নিঃসীম একাকীত্বের পরিচয় বহন করে নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে তখন বাণিজ্যিক লেন-দেন 'রোধ—অবরোধ—ক্লেশ কোলাহল।' সম্রাট সেজে বসেছে কোনো 'ভাঁড়', 'কোথাও নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়।' নায়কের আর্ত অনুরোধ 'আমার চোখের পায়ে আলিয়োনা সৈন্যদের মশালের আগুনের রং'।

তিনি নির্জনতার সাধক। আপন চেতনার স্তরে স্তরে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের যে রং প্রেম ভালোবাসা এবং মানুষিক আলোর যে স্মৃতি তিনি জমিয়ে রেখেছেন তাকেই আস্বাদন করার জন্যে একখানা রমণীয় হাতের মধ্যে আপন হাতের উষ্ণতা রুয়ে দিয়ে নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকতে চেয়েছেন জীবনানন্দ। এই নির্জনলোক থেকে তাঁর 'পৃথিবীরে মায়াবীয় নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়'। তিনি এই লোকায়ত অলৌকিক জগতের নির্জনতায় নিমজ্জিত, কারণ, 'এখানে চকিত হ'তে হবেনাকো, ত্রস্ত হ'য়ে পড়িবার নাহিকো সময় / উদ্যমের ব্যথা নাই--এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয় / এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে, / মাথার চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে / এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর, / রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর। ভালোবাসা আসিবে না— / জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর।' 'এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।'

এক ভাষায় বলা যায় আত্মহৃদয়রমণে স্বকীয় অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় হয়ে থেকে জীবনানন্দ পেতে চেয়েছেন বিশ্বসমাজ ও জীবনের অনুভব। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই তাকে সচকিত হতে হয়েছে 'শিশিরের শব্দ-'এ 'পাখির নীড়ের থেকে খড়' পড়ার শব্দে, 'দাইমৃগীর' ডাকের শব্দে, গুলির শব্দে। 'জলের গন্ধ' 'শিশুর মুখের ঘ্রাণ', 'ঝিঁঝির গন্ধ' ও ঘামের গন্ধে কবি যখন হেমন্তের 'করুণ জ্যোৎস্নায়' অবস্থিত, 'শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর'-এ নিজেকে অত্যাচারিত বোধ করেছেন নায়ক কবি। স্মৃতিতে পেয়েছেন 'একদিন—এক রাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা।' প্রেমে উদ্দাম 'হলদে পাতার মতো আমাদের ওড়া উড়ি' এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে দিতে 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়' জলে উঠে মনে হয়েছে 'আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়ের নয়।'

এই বোধ একবার অস্তিত্বে ধরে গেলে নায়কের সন্ন্যাসী হওয়া ছাড়া আর কি হওয়ার থাকে। পথে পথে ছুটেছেন এক অতীন্দ্রিয় ইচ্ছা বহন করে। বোঝাতে চেয়েছেন 'সেই ইচ্ছা সংঘ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়, / আরো আলো মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।' এবং এই 'হৃদয়' লাভের জন্যে যে অনন্ত যাত্রা, সেই যাত্রা পথে বিশ্বের শব্দ গন্ধ স্পর্শ স্বাদ-ময় ছবির অফুরন্ত অজস্রতা নায়ক উপলব্ধি করেছেন। দেখেছেন, 'আকাশের রঙ ঘাস-ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল' 'রোদের পরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল।' কিন্তু জিজ্ঞাসা 'জীবনের রঙ তবু ফলানো কি হয়। এই সব ছুঁয়ে ছেনে।' না, তা হয় না। 'বাসি পাতা ভূতের মতন উড়ে আসে।'

সন্ন্যাসীকেও ফিরে আসতে হয় লৌকিক পৃথিবীর সন্নিদ্ধে। কেন না 'সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে যেতে হয় / কী কাজ করেছি আর কি কথা ভেবেছি।' মানুষের এই রীতি, এটাই মানুষ জন্মে উৎসাহ আর প্রেরণা।' কিন্তু এসে কি মহত্তর লাভ হোলো, এই জিজ্ঞাসার ক্লান্ত নায়ক যখন নতুন পৃথিবীতে চলতে থাকেন তাঁকে চমকে উঠতে হয়। 'একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে'। তিনি অনুভব ক'রেন 'কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরের মতো এই যে ছড়িয়ে আছে / পায়ের তলে, সমস্ত শরীরে রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ' বেঁচে থাকাকে করে দেয় যন্ত্রণা। চারদিকে যান্ত্রিকতা, 'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ / মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর ; / যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ; / মানুষের লালসার শেষ নেই ; / উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতুক্ষণ / অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ / অপরের মুখে ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই। / ...মানুষের দুঃখকষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়।' এখানে নায়কের চোখ স্বচ্ছ। তিনি বস্তুর ভেতরে প্রবেশ করে—বস্তুর ভেতরে চলাচল ক'রে দেখতে পান 'অনেক রক্তের ঢকে অন্ধ হয়ে তারপর জীব / এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ'। আপন সময়ের মানুষিক পরিবেশের দিকে তাকিয়ে নায়কের মনে হয়েছে। মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিতো— / স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিলো ভুলে, / অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিতো, / পরচুল এঁটে নিতো স্বাভাবিক চুলে, / সর্বদা এসব কাজ ক'রে যেত যদি / যেমন সে প্রায়শই করে, / পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হ'তো, আহা, / অথবা মুখোশ খুলে খুশি হ'তো কে নিজের মুখের রগড়ে।'

নায়ক ঠিক 'আউটসাইডার'। তাঁর কাছে মনে হয়েছে, মানুষেরা 'বাজারদরের

চেয়ে বেশি কালোটাকা ঘুষ দিয়ে / জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে / যেন কোনো জীবনের উৎস-অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে ; / পরস্পরের থেকে দূরে থেকে ; ছিন্ন হয়ে ; বিরোধিতা করেছে। সকলের আগে নিজে—অথবা নিজের দেশ—নিজের নেশন / সবের উপর সত্য মনে ক'রে ;—জ্ঞানপাপে, অস্পষ্ট আবেগে।'...'কোথাও সার্থককাম কেউ নয়'। কবি নায়ক জিজ্ঞাসা চোখে 'সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি—;/এখনো কি ভালোবাসি?' একেবারেই উপক্রুত পৃথিবীর বহিরাগত নায়কের অস্তিত্বের স্বর। 'মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর ভরে গেছে ; স্পষ্টোক্তি। এতে কি পাপ হয়েছে? না এর জন্যে নায়ক দায়ী নন. কেউ যদি আপনি আপনিও মরে যায়, তার জন্যে তিনি দায়ী নন। তবু 'বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে / সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিলো কোনো উজ্জ্বল চোখের / মনীষী লোকের কাছে এই সব অণুর মতন / উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।' এটা ভেবে তিনি বেদনাহত হন। কেননা দেখেন 'বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু।' এবং কবি নায়ক জলাজর্জর উদাসীনসত্তায় তাই উপলব্ধি করেন 'অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয় / ক'রে ফেলে বুঝেছি সময় / যদিও অনন্ত, তবু প্রেম যে অনন্ত নিয়ে নয়।' এবং ভাব নায়িকাকে জানান 'তবুও তোমাকে ভালোবেসে। মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে এসে / বুঝেছি অকূলে জেগে রয় : / ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ হৃদয়।'

অফুরন্ত 'ড়' দণ্ডে'র স্ট্রিম অব কনসাসনেস। ড়-দণ্ডের এক্‌জিসটেন্‌স। এর মধ্যেই জীবনের রূপ আর রক্তিম নির্দেশ / পৃথিবীর কাজ আর বিচ্ছেদের ভূমা—মনে হয়—এক চিলের সমান ; / কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি—অফুরান।'

নায়ক স্পষ্টতই দেখেছেন 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,/ যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে ত্মাখে তারা : / যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই / পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া / যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি / এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয় / মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা / শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।' অতএব নায়ককে নিজের এই ক্ষণিকের জীবন ও পৃথিবী থেকে আবার রেজিগনেশন দিতে হয়। নায়কের প্রত্যয় লেখা থাকে সাম্প্রতিক মানুষের জন্যে এপিটাফে খোদিত বাক্যের মতো 'আমি সেই মহাতরু—লাবণ্যসাগর থেকে নিজে / উঠে তুমি

জাগিয়েছ অনাদি স্বর্গের নীলিমায়—/ পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ ক'রে অবিনাশ স্বর / আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায় / অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।'

যা বলছিলাম, কেউ যদি জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে উপন্যাস মনে করেন, করতে পারেন, আপত্তির কারণ দেখি না। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের 'নীলিমা' কবিতা থেকে 'দু-দিকে' কবিতাটি পর্যন্ত যে 'ভাবনা স্রোত' তা আধুনিক যুগের বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টির সমগোত্রীয়। নায়কের আন্তর জগৎটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তাকে পরিবেশন করা হয়েছে অবারণ ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করেছেন যুগমানুষের কাছে। অতি আধুনিক যুগের লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তি, অনির্দেশ্য হৃদয় বিক্ষোভ, জ্বালা, আশাহীন ভরসাহীন অস্থিরতাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিমালাকে তিনি অনন্ত নক্ষত্রের নীল আলোকে ছুঁপিয়ে পরিবেশন করেছেন। আত্মমগ্ন অনুভূতিকে তিনি বিশ্বের জ্বালাময়ী বস্তুর পীড়ন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অভূতপূর্ব প্রকৃতি তন্ময়তা ও সৌন্দর্যে অবসিত হয়ে বিশ্বরহস্য উপলব্ধি করেছেন। বাইরের বস্তু নয়—বস্তুর নিহিত সত্তাকে পৌঁছে দিয়েছেন। নিজের জীবনে যেমন জুড়ে নিয়েছেন বিশ্বাতীত গতি তেমনি বাইরের মানুষটাকে নয়, পাঠকের ভেতরকার মানুষটাকে আশ্চর্য আবেগে সেই গতিতে সমর্পিত হতে বাধ্য করেছেন। সত্যিই তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বা অন্তরের উপন্যাসটাকে পড়তে পড়তে আমারও মনে হয়, উপন্যাস পুরোনো হয়ে যায়, কিন্তু একে বার বার ফিরে ফিরে পড়েও কিছুতেই পুরোনো করতে পারলাম না।

অথচ আমি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাইনি এবং জীবনানন্দকে অবিশ্বাস করার সাধ্য আমার নেই। সাহস নেই। সাম্প্রতিক কবিরা কবে তাকে অস্বীকার করবে। কবে মানবিক আলোভরা পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত প্রেম ভালোবাসার গান শোনাবে। আমি পিপাসিত।

জীবনানন্দ ঃ আমার স্বদেশ ও সংকল্প

তুলসী মুখোপাধ্যায়

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় যেদিন ওঁর সচিত্র মৃত্যুসংবাদ ছাপা হল—সেদিনই প্রথম ওঁর নাম জানলুম। জেনে অবাক হলুম। কই এই নামের কোনো কবির নাম তো আগে কখনো শুনি নি। কিংবা শুনলেও স্মরণে রাখি নি। অতএব হয়তো বা সবিস্ময়ে ভেবেছি—উনি এমন কি একজন বড় কবি—যাঁর মৃত্যু সংবাদপত্রের অনেকটা জায়গা ছিনিয়ে নিল! কিন্তু হায়! সেদিন কি বুঝতে পেরেছি বাংলার ভাণ্ডার থেকে কতবড় ইন্দ্রপতন হয়ে গেল! না বয়স নয়, এই অজ্ঞতার পেছনে স্পষ্টতই কারণ ছিল দুটি। প্রথমত তখনো অবধি আমার কবিতা পড়ার দৌড় পাঠ্যপুস্তক এবং রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী" পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত মফঃস্বলী সংকীর্ণতা, তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এমন এক পরিমণ্ডলের মধ্যে চলে এলুম যারা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে বদ্ধপরিকর এবং সেক্ষেত্রে একান্ত আন্তরিক। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে—বিশেষত সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে অত্যন্ত কট্টরপন্থী। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবল কিরণে সে অবরোধ খড়কুটোর মতো ভেসে গেলেও আমরা দেশবিদেশের অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলুম। জীবনানন্দের কথা তো উঠতেই পারে না। কেননা তিনি বাঙালী। পরন্তু অনেকের কাছেই তিনি নির্জনতাবিলাসী বলে আখ্যাত। ধূসর জগতে স্বেচ্ছানির্বাসিত এক পলাতক অধিবাসী। সুতরাং জীবনানন্দ যতই প্রসারিত হতে লাগলেন—আমরা ততই সযত্ন চেষ্টায় ওঁর থেকে দূরে সরে যেতে লাগলুম। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমাদের সঙ্গে ততদিনে একজন "বিদ্রোহী" মানুষ জুটে গেছেন। সামাজিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও যাঁর সমান আগ্রহ। তাঁর শ্রুতি এবং স্মৃতি, তাঁর আবেগ এবং রসবোধ দিয়ে সহজেই তিনি আমাদের আঁকশির মতো করে টেনে নিলেন। প্রচণ্ড সাহসে তিনি সমস্ত সংস্কার ভেঙে ফেললেন। স্পষ্ট মনে আছে তাঁর 'খপ্পরে' পড়া কয়েকজন যুবকের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর তিনি একদিন আবৃত্তি করলেন "বনলতা সেন"। স্থান—একটি বিদ্যালয় সংলগ্ন খোলা মাঠ। কাল—গ্রীষ্মের এক পড়ন্ত বিকেল।

আমাদের সেই "ফ্রেণ্ড-ফিলোযোফার অ্যাণ্ড গাইডে"র কণ্ঠে, যেন এখনো শুনতে পাচ্ছি, ধ্বনিত হচ্ছিল—

"সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার নাটোরের বনলতা সেন।"

ইতিমধ্যে পেছনের আকাশ চুঁয়ে হলুদ রোদ্দুর ক্রমে ডুবে যাচ্ছে ঘাসের ভেতর। পাখির দল ইতস্তত ফিরে যাচ্ছে যে যার নিজের নিবাসে। আমরা এবং কবিতা যেন মিশে গেলাম একাকার হয়ে। একটা অদ্ভুত বেদনাময় আনন্দে আমরা যেন খানিক সময়ের জন্য বিলুপ্ত হলাম। অতঃপর দেবদূতের মতো ভদ্রলোক জীবনানন্দ বিষয়ক কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি কবিতার কিছু কিছু টুকরো অংশ উদ্ধৃতি দিলেন। প্রত্যেকটি শব্দ সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে চাইলুম—ভক্ত যেমন করে নতজানু হয়ে ভগবানের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। সমস্ত আলোচনা, সমস্ত শব্দ, সমস্ত ছবি আজ আমার মনে নেই। কেবল মনে আছে সেই অপরূপ সন্ধ্যার রোমাঞ্চিত অনুভূতি এবং উদ্ভাসিত অস্তিত্বের স্মৃতি। "বনলতা সেন" কবিতাটি জীবনানন্দের কবিতায় তেমন উল্লেখযোগ্য নয় আমার কাছে। তবুও কবিতাটির লাইনগুলি যেন আজো বুকের মধ্যে গেঁথে আছে। প্রথম পরিচয়ের উত্তেজনার জন্য, না কবিতাটির অতুলনীয় কারুকাজের জন্য—বলতে পারি না।

সেই থেকেই আমার জীবনে জীবনানন্দের জয়যাত্রা ; দেরি হয়ে গেছে অনেক। প্রচণ্ড উন্মাদনায় তাই জীবনানন্দ সংগ্রহে ব্রতী হলুম। এক একটি কবিতা পড়ার শেষে যেন নবজন্ম। বিশেষত "মহাপৃথিবী", "সাতটি তারার তিমির", "রূপসী বাংলা", এবং অবশেষে "বেলা অবেলা কালবেলা" ; রবীন্দ্রনাথ পেরিয়ে তদ্দিনে আমরা নজরুল, যতীন সেনগুপ্ত এবং আরো পরের অনেককে জানার চেষ্টা করছি। আমাদের চেতনা নড়েছে, কোনো কোনোক্ষেত্রে আহত হয়েছি, হয়েছি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। এবং হ্যাঁ—কখনো কখনো প্রেরণাও পেয়েছি বই কি। কিন্তু কবিতা পড়তে পড়তে কখনো কান্নায় ভেঙে পড়ি নি, কখনো রোমকূপগুলো খাড়া হয়ে ওঠে নি ভীষণ মোচড়ে। রক্তাপ্লুত অবস্থায় কখনো কোনো কবির কাছে ভিক্ষে করি নি সময় ও পৃথিবী। যখন পড়ি—

"অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে"

কিংবা

"মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল
মানুষের লালসার শেষ নাই:
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।
কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখকষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়।"

কিংবা—(না, উদাহরণ দিতে গেলে তো অধিকাংশ জীবনানন্দ উপস্থাপিত করতে হয়—) তখন প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাই। নিষ্পেশিত ডালিমদানার মতো রক্তাক্ত হয়ে গড়িয়ে পড়ি। অসহায় আর্তনাদে হা-হা করতে থাকে বুক, কেঁপে ওঠে পাঁজরের হাড়।

আমার জানার পরিধি নিতান্ত সীমিত। তাই জ্ঞানের গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবনানন্দ বিশ্লেষণে আমি অক্ষম। কোথায় তিনি বড়, তাঁর উপরে ইয়েটসের প্রভাব কতখানি, কবি হিসেবে তিনি কোন্ গোত্রের, বাংলা কাব্যে তাঁর অবদান কি—এসব গম্ভীর আলোচনা আমার কাছে নেহাত অকিঞ্চিৎকর। আমার কাছে প্রকৃত কবিতা কিছু বলে না—মারাত্মক কিছু ঘটিয়ে দেয়। বোধ ও বুদ্ধির বিস্ফোরণ ঘটায়, কল্পনা আর অনুভূতির প্রসার ঘটায়। আর সেই প্রসারিত কল্পনা আর অনুভূতি ছাড়া জীবনে ভালোবাসার আবেগ আসে না, মানুষে বিশ্বাস আসে না। সেই অর্থে জীবনানন্দ আমার কাছে কবি, কেবলি কবি নয়, কবির কবি। কবি কেন না, জীবনানন্দের নিজের ভাষায়, "তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকীরণ তাদের সাহায্য করছে।"

শুধু তাই নয়। বক্তব্য আরো দূর পর্যন্ত টেনে নেওয়া যেতে পারে। কবি মাত্রই ঋষির মতন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা—আগামীকালের অনিবার্য ভাষ্যকার এবং জীবনানন্দ সেই ঋষি-কবি। তা না হলে মন্ত্রের মতো এই শব্দগুলি তাঁর কলমে আসে?

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।"

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দ। কেবলমাত্র বাংলাদেশে নয়—পৃথিবীতে এঁরা কদাচ আসেন। বাংলা কবিতার প্রাণবায়ুতে এখন জীবনানন্দের কণ্ঠস্বর। বাংলা কবিতা আজো জীবনানন্দের প্রেরণায় উদ্ভাসিত। তাঁর শব্দ চয়ন, তাঁর ভাষা নির্মাণ, তাঁর বর্ণ ও গন্ধময় চিত্রের সমারোহ, তাঁর অনির্বচনীয় বাচনভঙ্গী এবং সর্বোপরি ধীমান আন্তরিকতা বাংলা কবিতাকে আরো অনেকদিন পথ দেখাবে। অথচ জীবনানন্দ কেমন অকালে চলে গেলেন। হায়! মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে নগর সভ্যতার বলি হলেন ধ্যানমগ্ন জীবনানন্দ। আজ বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হত মাত্র বাহাত্তর। আমার নিজের পরমায়ু দিয়ে তাঁকে বাঁচানো যেত? যায় না নিশ্চয়ই। কিন্তু মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় থাকলে—হাসপাতালে তাঁর শেষ শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে অন্তত অসংখ্য বার প্রার্থনা করতুম। কেন না, স্বাধীনতা নষ্ট শসার মতো পচতে শুরু করার আগেই তিনি চলে গেলেন। ভয়াবহ ষাটের দশক তিনি দেখে যেতে পারলেন না। তিনি বেঁচে থাকলে আর কিছু না হোক—অন্তত কড়া চাবুকের কশাঘাতে আমাদের পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতুম।

ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, বেশ কিছুদিন কবিতা না লিখতে পারলে আমি কয়েকদিন কেবলমাত্র জীবনানন্দে মগ্ন থাকি। আর তখনই বিস্ফোরণ ঘটে যায় রক্তপ্রবাহে। বিলুপ্তির চোরাবালু থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ি। অনুভব করি লেখার তাগিদ। অর্থাৎ জীবনানন্দ না পড়লে কিছুদিন পর চেতনার খড়ি পড়ে ঝিমিয়ে আসে অস্তিত্ব। আমার কোনো কোনো বন্ধু বলেন, "তোমার কবিতায় জীবনানন্দ তেমন কোথায়? তাহলে তুমি কেন জীবনানন্দের কথায় এমন বিহ্বল হয়ে ওঠো?"

আমি বলি, "অনেক চেষ্টায় পোষাক হয়তো কিঞ্চিৎ পাল্টাতে পেরেছি। কিন্তু ভেতরটা দেখেছ? সেখানে জীবনানন্দের অক্ষম অনুবাদ। কেন না, জীবনানন্দ আমার সংকল্প, জীবনানন্দ আমার স্বদেশ।"

আবহমান বাঙালী কবি

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

কেউ বললেন, তিনি নির্জন অথবা নির্জনতম ; কারো মতে তিনি কবি প্রধানত প্রকৃতির। কেউ মাথা নাড়লেন, উহুঁ, তা নয়, তাঁর কবিতা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার ; ঘোরতর আপত্তি করে অন্যজন লিখলেন, নিশ্চেতনাই তাঁর কাব্য-প্রকৃতি। কারোর চোখ তাঁর কাব্যে প্রতীক খুঁজেই ক্ষান্ত ; কোনো সমালোচকের ঘোষণায় এ কাব্য সম্পূর্ণ অবচেতনার ফল ; কারোর বা ফতোয়ায় এই কবি স্যুররিয়ালিস্ট। সব তিনি শুনেছেন। সেই কবি। তারপর শান্ত স্বরে মন্তব্য করেছেন, প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য— কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতা সৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষপর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার ; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসার এত তারতম্য। একটা সীমা রেখা আছে এ-তারতম্যের ; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হ'তে হয়।

প্রবন্ধ রচনায় হাত দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধকারের পক্ষে কবির সেই উক্তি বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই। আংশিক সত্য পার হওয়ার জন্য তার গভীর যন্ত্রণা। তার সমগ্র অনুভবে কবির স্পষ্ট অস্তিত্ব। অধিকন্তু মৃতেরাও 'কোনো কোনো অঘ্রানের পথে পায়চারি-করা শান্ত মানুষের হৃদয়ের পথে' থাকে, এবং 'কেউ কেউ কবি'র কোনো কবিই মৃত নন। সান্ত্বনা শুধু বড়ো সমালোচক সে নয়। তাই 'ঝরা পালক' কুড়িয়ে সে পথ চলতে শুরু ক'রে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এসে থেমেছে। বার বার তার এই পথ-পরিক্রমা। একটা দৃষ্টিকোণ সে পেয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত পূর্ণতার পরিবর্তে সম্ভবত অংশই। তবু তার মূঢ় মনের অলীক ধারণা এই বক্তব্যের সামনে কবি আপত্তি জানাতে ভুলে গিয়ে শান্ত সমাহিত হয়ে পড়বেন। অন্তত ভরসা কবির সেই উদ্ধৃতি : 'কবিতা-পাঠ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার।'

জীবনানন্দ শুধু 'রূপসী বাংলা'র কবি বলেই নয়, অবশ্য বাংলার কোন কবিরই বা কাব্যগ্রন্থের নামের সঙ্গে বাংলা বিযুক্ত হয়ে আছে, এবং সেই বাংলা-নামাঙ্কিত কাব্যগ্রন্থের সবগুলো কবিতাই, অর্থাৎ বাটটি কবিতারই উপজীব্য

বাংলা বলেও নয়, এবং সেই কাব্যগ্রন্থ 'আবহমান বাংলা, বাঙালী'কে আশ্চর্য ভাবে উৎসর্গীকৃত, সে কারণ বিস্মৃত হলেও, প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, বাংলা 'রূপসী বাংলা'র আঙিনা ছাড়িয়ে গেছে, লেগেছে 'ঝরা পালকে,' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেও তার চিহ্ন, 'বনলতা সেনে'র সর্বাঙ্গে, 'মহাপৃথিবী'র আনাচে-কানাচে, 'সাতটি তারার তিমির-আকাশে সে তারারই মতো, 'বেলা অবেলা কালবেলা'য়ও সে সুর অস্তমিত নয়; এবং এ সবই স্বাভাবিক ও অনিবার্য হয়ে আছে; কেননা সেই কবির সমস্ত হৃদয় জুড়ে বাংলা। এই বোধের উৎসে উগ্র জাতীয়তা-চেতনা নয়, উচ্ছল দেশপ্রেমের বন্যা নয়, নয় উদ্ধত গর্বের নিশান; এ শুধুমাত্র প্রকৃতি-প্রেম নয়, ইতিহাস-চেতনা নয়, নয় দুঃখ দারিদ্র্যের উপলব্ধির দহন; এই বোধ আরো ব্যাপক আরো গভীর; তাঁর সত্তায় বাংলার অকপট অস্তিত্ব, তাঁর চেতনায় বাংলার সহজাত সহাবস্থান, তাঁর মানস তন্ত্রীর তন্ময়তায় বাংলার আবহমান প্রবাহ।

বাংলা বাঙালী কবির কাব্যে বঞ্চিত নয়, বরং তার স্বাধিকার-সঞ্জাত প্রবেশ যথেষ্টই স্পষ্ট, আধুনিক বাংলা সাহিত্য-স্মরণে সে সত্য প্রোজ্জ্বল হয়। 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' মধুসূদনের আত্মগ্লানির কণ্টকবৃন্তে প্রস্ফুটিত বাংলা-কুসুম; 'সুজলাং সুফলাং' শস্য-শ্যামলাং' বাংলার ভাবরূপের সামনে বঙ্কিমচন্দ্র সশ্রদ্ধ সন্তান; 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি,' 'বাংলার মাটি বাংলার জল' রবীন্দ্রনাথের অন্তহীন ভালোবাসার অর্ঘ্য এবং অনুপস্থিত ঐক্য সাধনের তৎপরতা; 'আমরা বাঙলী বাস করি সেই' 'সে আমাদের বাংলা রে' সত্যেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ জাতীয়তা-সঞ্জাত ফসল; আরো অনেক কবিতা ও গীতে পরাধীনতার মর্মবেদনা; সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত থেকে অতি সাম্প্রতিক কবিদের ওপার বাংলায় যুধ্যমান গণ-মানসের সহমর্মিতা কবিদের সংগ্রাম চেতনায় ভাস্বর; অর্থাৎ বাংলা কবিতায় বাংলা অনুক্ত অবহেলিত নয়।

জীবনানন্দের কাব্যে বাংলার উপস্থিতি শুধু পরিমাণ-গত বিশালতায় নয়, প্রগাঢ় ব্যাপকতা ও উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। এই বাংলা-বোধের প্রকৃতি কি? এই বোধের সুস্পষ্ট ফসল অর্থাৎ কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা' দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। 'খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল।' এবিষয়ে কবির বক্তব্য: 'এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিকবোধে একশরীরী; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ-প্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো

পরস্পর-নির্ভর। তাই এসমস্ত সনেটের পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয় নি। আসলে সমস্ত কবিতাগুলোকে পৃথকভাবে 'রূপসী বাংলা' নামে অভিহিত করা হলেও অনুপযুক্ত নামকরণ হয় না। সমস্ত কবিতা পাঠের ফলশ্রুতি একটিই আস্বাদ এবং সেই আস্বাদের একটিই নাম অর্থাৎ কবির বাংলা-বোধ। 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে / রয়ে যাব'; 'আমি এই বাংলার পাড়াগাঁয়ে বাঁধিয়াছি ঘর'; এই জাতীয় অকপট বিবৃতি গ্রন্থের যত্রতত্র; আম জাম কাঁঠাল বট শটি বেত হিজল কলমী ধান পাট বাসক শর এবং বাংলার আরো কত বৃক্ষলতা গুল্ম শস্যের মহিমাময়ী শ্যামলিমা; ধানেরই কত বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি ঘাস এবং বাংলার সজল সবুজ ঘাস। 'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে', 'জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে—আর এই বাংলার ঘাস / রবে বুকে'; শালিখ দোয়েল বক মাছরাঙা খঞ্জনা নিমপাখি বউকথাকও শঙ্খচিল অজস্র পাখির চক্রমান বাংলা তথা কবিতার আকাশে। গাঙুড় ধলেশ্বরী জলাঙ্গী রূপসা মেঘনা ইছামতী পদ্মা আর ধানসিড়ি জলসিড়ি বাংলার সেই সব নদীর নিরন্তর কল-কল্লোল; অপরাজিতা পদ্ম করবী কাঁঠালি চাঁপার সৌরভ এদেশবাসীর প্রতিটি নিঃশ্বাসে সম্পৃক্ত; কাঁচপোকা প্রজাপতি মৌমাছি শ্যামাপোকা সুদর্শন সাপমাসী ভোমরা জোনাকি বাংলার গ্রামীণ পরিবেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছও দৃষ্টির অন্তরালে নয়। 'কার্তিকের নীল কুয়াশা,' 'শিয়রে বৈশাখ মেঘ', 'নিশুতি জ্যোৎস্নার রাত', 'শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ' বাংলার কত বিশিষ্ট অথচ চিরকালীন কালবিন্দু। চাঁদসদাগর বেহুলা মনসা সনকা সীতারাম রাজারাম বল্লাল সেন রাজবল্লভ চণ্ডীদাস রামপ্রসাদ রায়গুণাকর দেশবন্ধু পর্যন্ত বাংলার রূপকথা লৌকিককাব্য ইতিহাস বর্তমানে চিরায়ত মিছিল। কীর্তন যাত্রা পাঁচালী পরণ-কথা এদেশের আদরণীয় যা কিছু তাঁর কবিতায় বিধৃত। কিন্তু এই সমস্তই বহিরঙ্গের কথা। এ সবই খুবই স্পষ্ট সত্য, কিন্তু সব নয়। প্রকৃতি বর্ণনা, দেশপ্রেম, ঐতিহ্য-সচেতনতা সবই কাব্যের বিষয়বস্তুর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যে এহ বাহ্য। কেননা বাংলার অন্তরঙ্গ রূপটির অবদান জীবনানন্দের কাব্যে স্ব-প্রকাশ। সজল ছায়াচ্ছন্ন শিশির-স্নিগ্ধ সেই রূপ। কবি যে সে রূপ শুধু আবিষ্কার করেছেন, গ্রহণ করেছেন, প্রকাশ করেছেন তাই নয়, কবির মানসিকতায় সেই সব কিছু ওতপ্রোত উপাদান হয়ে উঠেছে। কবি যখন বলেন, 'বাংলার আমি মুখ দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ / খুঁজিতে যাইনা আর'; তখন রূপ-সম্ভোগ নয়, গভীর আন্তর-উপলব্ধির প্রত্যয়ই প্রকাশিত হয়। কিংবা 'পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি,

হায়, এমন বিজন / শাদা পথ,' এই বিজন শাদা পথ অবশ্যই কবির নিগূঢ় উপলব্ধির সত্যালোকেই উদ্ভাসিত। 'এই ভাঙা ছেড়ে হায়, রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে' আসলে বাংলার রূপাতীতের আবিষ্কারেই কবির এই সতৃপ্ত অঙ্গীকার। এবং এইখানেই বাংলা বিষয়বস্তুর গণ্ডী ছাড়িয়ে জীবনবোধের অঙ্গীভূত। আবার এই উপলব্ধি সীমাবদ্ধ সময়ের নয়, আবহমান বাংলার ; প্রগাঢ়তার হেতুও তাই। 'এজন্মে নয় যেন—এই পাড়াগাঁর / পথে তবু তিনশো বছর আগে হয়তো বা—আমি তার সাথে / কাটায়েছি ; পাঁচশো বছর আগে হয়তো বা সাতশো বছর / কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে'। বাংলা-বোধের এই অতি-বিশিষ্টতা তবুও সংকীর্ণতা বোধে কবিকে গ্লানিময় করে না এবং কবিতার বিশ্বজনীন আবেদনের অন্তরায় হয় না, কেননা কবির দৃষ্টিতে এই খণ্ডাংশেও অসীম ভূমণ্ডলের প্রতিফলন : 'পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ; / পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ; পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনার মনে ; আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে অকাশে আকাশে।'

বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের এই উভয় দিকই জীবনানন্দের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও প্রসারিত। কখনো একটি কবিতার সামগ্রিক অবয়বে, কখনো বা পঙ্‌ক্তি অথবা পঙ্‌ক্তি-ভগ্নাংশে কখনো অনুভূতির স্তরে, কখনো বা প্রকৃতি-রূপায়ণে চিত্রকল্পে উপমায়, কখনো স্মৃতি-রোমন্থনে, কখনো বা স্নিগ্ধ সজল একটি মেজাজের সাযুজ্যে। 'ঝরা পালকের' 'সেদিন এ-ধরণীর' কবিতায় 'ডেকেছিলো ভিজে ঘাস-হেমন্তের হিমমাস—জোনাকির ঝাড়, / আমারে ডাকিয়াছিলো আলেয়ার লাল মাঠ শ্মশানের খোয়াবাট আস', বা 'মাটির বাঁটের চুমো শিহরি উঠিল ঠোঁটে, রোমপুটে ; / ধুধু মাঠ—ধানক্ষেত—কাশফুল—বুনো হাঁস—বালুকার চর' ; 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে' 'অবসরের গান' 'মাঠের গল্প'-শিরোনামার কবিতাবলী ; 'বনলতা সেনে'র 'ধানকাটা হ'য়ে গেছে,' 'অন্ধকার' ইত্যাদি কবিতা 'পথ হাঁটা'য় নগরাতেও আবিষ্কৃত গ্রামীণ শান্ত নির্জনতা কবিকে আবিষ্ট করেছে এবং বিদিশা ও শ্রাবস্তী পার হয়ে শেষ পর্যন্ত 'বনলতা সেন' নাটোরের ; 'মহাপৃথিবী'র 'হায় চিল,' 'কুড়ি বছর পরে,' 'বিভিন্ন কোরাস' ; 'বেলা অবেলা কালবেলা'র 'সে', '১৯৪৬-৪৭' ; এই সমস্ত উদ্ধৃতি ও নামোল্লেখ অজস্রের মধ্যে ক্ষুদ্র অংশের চয়ন মাত্র।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাংলা-বোধের ব্যাপকতা ও বিশিষ্টতায় জীবনানন্দ সবাপেক্ষা উল্লেখ্য কবি। এই বোধ স্বতন্ত্র নিগূঢ় এবং আন্তরিক। কবিসত্তায়

অবিচ্ছিন্ন, মানসিকতায় অনিবার্য। বাংলা সাহিত্য আলোচনায় সমগোত্রীয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বিচার ও সাদৃশ্য-সন্ধান প্রচলিত রেওয়াজ। এ ব্যাপারে জীবনানন্দ একটি ব্যতিক্রম। জীবনানন্দ-আলোচনায় পাশ্চাত্য-পরিপ্রেক্ষিতের অপ্রয়োজনীয়তার উৎসে সম্ভবত কবির বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সত্তা, যে সত্তা এই ভূখণ্ডের অন্তরের অন্তস্তলের মর্মবাণীর বিশুদ্ধ বোধে উজ্জীবিত। জীবনানন্দের কবিতায় এই বোধের প্রবেশ শুদ্ধ কল্পনা অথবা বুদ্ধির পথে নয়; কবির অভিজ্ঞতা ও চেতনারই প্রস্ফুটন। এবং এই প্রসঙ্গে কবিতার সংজ্ঞায় কবির বক্তব্য সবিশেষ গ্রহণীয়: 'কবিতা এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।'

আমার দেখা জীবনানন্দ

রমাপতি বসু

যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করেন : আপনার প্রিয় কবি কে ?

আমি তার উত্তরে বলবো : জীবনানন্দ দাশ।

জীবনানন্দ দাশ জাত কবি। আজ পর্যন্ত তাঁর যত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে আমি তা সব পড়েছি। বার বার পড়েছি। আজও সময় পেলে আমি তাঁর কবিতা পড়ি।

আবার যদি কেউ প্রশ্ন করেন : জীবনানন্দ দাশের কবিতা আপনার এত ভাল লাগে কেন ?

আমি তার উত্তরে বলবো : জীবনানন্দের কবিতার ভাষা আমার খুব ভাল লাগে। শুধু ভাব নয়—ওঁর ভাষাটা আমার সবচেয়ে প্রিয়। আর তাছাড়া জীবনানন্দকে বুঝতে হলে তাঁর কবিতা বার বার পড়া উচিত। কেননা যতবার পড়া যাবে ততবার সেই কবিতার নতুন নতুন মানে খুঁজে পাওয়া যাবে। আমার তো মনে হয় জীবনানন্দর কবিতার এক একটি পঙ্‌ক্তি নিয়ে এক একটি প্রবন্ধ লেখা যায়।

'বনলতা সেন' যখন আমি প্রথম পড়ি তখন আমার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আজ আবার এই বয়সে যখন পড়ি তখন 'বনলতা সেন' আমার মনে অন্যভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'বনলতা সেন'-কে যেন আমি নতুনভাবে আবিষ্কার করার সুযোগ পাই। আসলে সে দিনের উপলব্ধির সঙ্গে আজকের উপলব্ধির যেন অনেক প্রভেদ। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন স্বাদ আমি গ্রহণ করে থাকি। শ্রাবস্তীর কারুকার্যময় মুখ। পাখির নীড়ের মতন চোখ। এই সেই নাটোরের বনলতা সেন। অন্বেষণের শেষ নেই। এই বনলতা সেন দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল।

তারপর দেখি :

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ; / থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার নাটোরের বনলতা সেন।

এ কবিতা পড়েই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : চিত্ররূপময়। আর বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন : চিত্রবহুল, বর্ণবহুল।

আমার মনে হয় জীবনানন্দর কবিতায় চিত্র, বর্ণ ও গন্ধ আছে। যেমন দেখা যায়:

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়/ পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;/ কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।

আমাদের সব কটি ইন্দ্রিয় দিয়ে এ কবিতা উপলব্ধি করা যায়। আর যদি বলা যায় এ শুধু কবি জীবনানন্দর পক্ষেই সম্ভব। তা হলে বোধহয় খুব বাড়িয়ে বলা হবে না।

সত্যি কথা বলতে কি এমন ভাষা আমি আর কারুর কবিতায় দেখি নি। এ যেন জীবনানন্দ দাশের নিজস্ব ভাষা। ভাষা দেখলেই বোঝা যায় এ জীবনানন্দর কবিতা। অনেকটা রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের গানের মতন। শুনলে যেমন কোনটা কার গান সহজেই বোঝা যায়। জীবনানন্দর কবিতাও হাজার কবিতার সঙ্গে মিলে থাকলেও সহজেই খুঁজে বার করা যায়। অনেক ছবির মধ্যে যেমন যামিনী রায়ের ছবি চিনে নিতে অসুবিধা হয় না, তেমনি অনেক কবিতার মধ্যে জীবনানন্দকে খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধাই হয় না। এর জন্য কোনো পরিশ্রম করতে হয় না।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে জীবনানন্দই একমাত্র কবি—যিনি আপন স্বকীয়তায় আপনি উজ্জ্বল। আজকের দিনে জীবনানন্দর প্রভাবমুক্ত কবিতা সহজে চোখে পড়ে না। বেশ বোঝা যায় জীবনানন্দর পরিবর্তীকালের কবিতা।

জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: অপূর্ব চিত্রকল্প প্রয়োগ রীতি, অনুভূতির তীব্রতা ও চিন্তাসূত্রের সীমিত ব্যবহার। এই সব কারণে জীবনানন্দর পাঠকরা কবির আত্মপ্রকাশের মাধ্যমটা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। কবির জীবনদর্শনকে আমরা খুঁজে পাই তাঁর প্রতীক নির্মাণের অভিপ্রায় থেকে। অথচ প্রথম দর্শনে জীবনানন্দর কবিতা সহজ ও সরল। যেন তিনি প্রকৃতির কবি। তাঁর কবিতায়—মেঠো চাঁদ, ধানসিঁড়ি, নদী, আকাশ, বাতাস, সূর্য, পাখি, হরিণ প্রভৃতি যত্রতত্র দেখা যায়। কবি জীবনানন্দ এমনভাবে এসব তাঁর কবিতায় উপস্থিত করেন যে তা আমাদের কাছে দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য হয়ে ওঠে। অথচ জীবনানন্দ বিষাদের কবি। তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতার আমেজ যেমন দেখা যায়—তেমনি দেখা যায় ইতিহাস ও কালের স্বাক্ষর। আত্মবিস্মৃত উন্মাদনা। এই কবি যখন ধর্ষিত সৌন্দর্য থেকে ক্ষয় চেতনায় উপস্থিত হন তখন তা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। আবার দেখা যায়

জীবনানন্দ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন—নগর সভ্যতার যন্ত্রণা বা দৈহিক অনুভূতি থেকে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে জীবনানন্দের দৃষ্টি থেকে কিছুই যেন এড়িয়ে যায় না। তাঁর কবিতায় আমরা যে অস্থিরতা দেখি—তা আমাদের বুদ্ধিকে নাড়া দেয়। ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

আমার মনে হয় এইটেই হচ্ছে জীবনানন্দের সাফল্যের চাবিকাঠি। ইংরেজি ১৯৩৯ সালে কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমার প্রথম পত্রালাপ শুরু হয়। 'অগ্নি' কবিতাটি পড়ে আমার খুব ভাল লাগে। আমি এই কবিতাটি আমার সম্পাদিত '১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক সংকলনের জন্য নির্বাচন করি। কবি তখন বরিশাল বি, এম কলেজের অধ্যাপক। পুনর্মুদ্রণের অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখতে কবি সানন্দে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে তাঁর সম্মতি জানালেন।

এই কবিতাটির শুরুতে ছিল :

'আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তব ঘরে।
জানো নাকি রাত্রি এসে ঘিরিতেছে আরো এক দীর্ঘতর বৃত্ত রোজ মানুষের জীবনকে।'

আর শেষে ছিল :

'গফুরের শীর্ণ গোলাঘরে, শ্মশানে, কবরে, আমাদের সবের হৃদয়।
এই প্রত্যয়ের থেকে গভীর অগ্নির জন্ম হয়।'

জীবনানন্দর জাগ্রত ও সন্ধানী মনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তখনই আমার মনে হয়েছিল তিনি জ্ঞানী ও প্রবীণ। অবশ্য এই উৎকাঙ্ক্ষা পরবর্তী কালে তাঁর 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দেখা গেছে। বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কবিতা'-য় জীবনানন্দের কবিতা প্রকাশিত হতো। এই সময় শনিবারের চিঠির 'সংবাদ সাহিত্যে' আধুনিক কবিতা নিয়ে নানা ধরনের সমালোচনা ও টিপ্পনী প্রকাশিত হতে দেখেছি। সজনী-কান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' তখন এই কারণে খুব জনপ্রিয় ছিল। এই সময় দেখেছি জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে শনিবারের চিঠিতে অনেক রসাল মন্তব্য। এমন খুব কম সংখ্যা ছিল—যে সংখ্যায় জীবনানন্দর কবিতার উল্লেখ নেই। আবার পাছে কেউ জীবনানন্দকে জীবানন্দ বলে মনে করে—সেজন্য সব সময় বন্ধনীর মধ্যে লেখা হতো : জীবানন্দ নহে।

যাই হোক এ সব কারণেই আমি বিশেষভাবে জীবনানন্দর অনুরক্ত হয়ে উঠি। অবশ্য এজন্য বুদ্ধদেব বসু ও সজনীকান্ত দাস ধন্যবাদার্হ।

অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যে আজকের দিনে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত কবি—তাঁদের কবিতা 'পরিচয়' ও 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত করে কবি-প্রতিভা আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করে গেছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতা "পরিচয়" (সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত) 'কবিতা'' ও পরবর্তীকালে 'চতুরঙ্গে' প্রায়ই প্রকাশিত হতো।

এরপর প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ত্যাগ করে 'নিরুক্ত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন—তখন 'নিরুক্ত'-য় জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ার সুযোগ পেয়েছি। তিরিশের দশকে 'কবিতা' আজকের দিনের মতন এত কৌলীন্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল: তখন কবিরা নিজেরাই কবিতার বই প্রকাশিত করে আত্মসুখ উপভোগ করতেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ছাড়া আর কারুর বই তখন তেমন বিক্রি হতো না। অবশ্য উপহার দেবার জন্য শ্যামাপদ চক্রবর্তী, কান্তিকুমার ঘোষ ও নরেন্দ্র দেবের 'মেঘদূত' বা ওমর খৈয়াম জাতীয় কিছু সচিত্র কবিতার বই-এর কিছু বিক্রি ছিল।

এর পরবর্তী কালে দেখেছি বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'অমাবস্যা', অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' ও জীবনানন্দর 'বনলতা সেন' সাধারণ পাঠাগারে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে কবিতার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নাম চিরস্মরণীয়। এঁদের সঙ্গে আর একটি নাম সহজেই মনে পড়ে—তিনি হ'চ্ছেন বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক সুশীল রায়। সুশীল রায় 'জীবাণু' কবিতা-পত্রিকার কর্ণধার থাকা কালে বহু তরুণ কবিকে কবিতা লেখার জন্য উৎসাহিত করতেন। তাঁর ও বুদ্ধদেব বসুর মতন কবিতার প্রতি অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'জীবাণু'র পর সুশীল রায় 'ধ্রুপদী' নামে আর একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করে কবিতার প্রতি তাঁর মমতা বোধের পরিচয় রেখে গেছেন।

তিরিশের দশকে কবিতার জন্য কোনো পারিশ্রমিক দেওয়ার তেমন রেওয়াজ ছিল না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। কেননা 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হতো এবং শুনেছি এ জন্য তিনি যথাযথ পারিশ্রমিক পেয়ে থাকতেন। এত কথা বলার একমাত্র কারণ—সে সময় বাংলা সাহিত্যের কবিদের আর্থিক অবস্থাটা বোঝানোর জন্যই কেবল মাত্র উল্লেখ করেছি। কেননা আজকের দিনে প্রথম শ্রেণীর দৈনিক ও

সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকাগুলির পূজা সংখ্যা বা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলে প্রত্যেক রচনার জন্য এমনকি কবিতার জন্যও পারিশ্রমিক দেওয়ার রেওয়াজ চলে আসছে। অথচ এক সময় কবিতা কেবলমাত্র পত্রপত্রিকায় পাদপূরণের জন্য প্রকাশিত হতো, পারিশ্রমিকের প্রশ্ন তো ওঠেই না। যাই হোক এমনি এক সময় পূর্বাশা কার্যালয়ে বসে আমরা প্রায়ই আড্ডা মারতাম। অচিন্ত্য-কুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বহু প্রবীণ ও নবীন কবি, ঔপন্যাসিক এই আড্ডায় এসে জমা হতেন। এমনি একদিন পূর্বাশা কার্যালয়ে বসে সঞ্জয় ভট্টাচার্যর সঙ্গে আলাপ করছি—এমন সময় একজন খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোক এলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যর কাছে। পরনে ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি ও ধুতি। অতি সজ্জন ও বিনয়ী বলে আমার মনে হলো। মুখে হাসি এনে তিনি নমস্কার জানিয়ে বললেন, আজই বরিশাল থেকে আসছি। সঞ্জয়বাবু অতি সজ্জন ও বিনয়ী ছিলেন। কাজেই উভয়ের মধ্যে এমন শিষ্টাচারপূর্ণ ও হার্দ্য আলাপ আলোচনা হতে লাগল যে তা দেখে আমি সত্যি খুব মুগ্ধ হয়ে গেছলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম—ভদ্রলোক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি। কিন্তু পরিচয় ছিল না বলে আমি ছিলাম নীরব শ্রোতা।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর হঠাৎ সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমাকে দেখিয়ে ঐ ভদ্রলোককে বললেন: এঁর সঙ্গে পরিচয় নেই? ভদ্রলোক আমার দিকে এমনভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন যেন তিনি আমার মুখ দেখে আমার পরিচয়টা বার করার চেষ্টা করছেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন: জীবনানন্দ দাশ।

কবি তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: এঁর পরিচয় তো জানলাম না।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য তখন বললেন; '.৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সম্পাদক রমাপতি বসু। গীতিতির কবি।

জীবনানন্দ দাশ বলে উঠলেন: পত্রযোগে আমাদের পরিচয় আছে। চাক্ষুষ পরিচয় এখন হলো।

তারপর কবি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: আমার ধারণা ছিল আপনি আমাদের সমবয়সী হবেন। তাই আপনার নাম শুনে আমি শুধু আপনাকে বার বার দেখছি।

সেই দিনটার কথা আজো আমার বেশ মনে আছে। অনেক কথা হলো। সাহিত্য ছাড়া নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলো। ঐ দিনে ঐ সময়ে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন মজুমদার ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরও এসেছিলেন পূর্বাশা কার্যালয়ে।

কবি জানালেন দু'দিন কলকাতায় থেকে তিনি আবার বরিশালে চলে যাবেন। এই পরিচয়ের পর কবির সঙ্গে আমার চিঠির আদানপ্রদান যেন আরো বেড়ে গেল। 'সর্বানন্দ ভবন' বরিশাল থেকে কবি আমাকে প্রায় চিঠি লিখতেন। ৭২-এর আন্দোলনে আমি যখন জেলে যাই—ঐ সময় পুলিস তল্লাশি চালিয়ে আমার বহু চিঠিপত্র আটক করে। আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রোঁলা, ক্রিস্টোফার ইস্পার উড, স্টিফেন স্পেণ্ডার এবং জীবনানন্দ দাশেরও বহু চিঠি ছিল। পুলিস তল্লাশি চালিয়ে এই সব চিঠিপত্র নিয়ে যায়। বিনা বিচারে দীর্ঘকাল আটক থাকার পর প্রেসিডেন্সি জেল থেকে যখন মুক্তি পাই তখন আমি এই চিঠিপত্রগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই চিঠিগুলি এবং সুভাষচন্দ্রের স্বাক্ষরিত 'তরুণের স্বপ্ন' এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের স্বাক্ষরিত 'নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন' প্রভৃতি বইগুলি কোনোক্রমেই উদ্ধার করতে পারি নি। যদিও এ জন্য আমি তৎকালীন অবিভক্ত বাঙলার সরাষ্ট্র বিভাগের সচিব মিঃ বাপাৎ-কে পত্রাঘাত করেছিলাম। মিঃ বাপাৎ আমাকে এ সব ফেরত দেবার আশ্বাস দিয়েও তা ফেরত দেন নি। এর প্রধান কারণ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের জার্মান স্ত্রী থাকার জন্য আমরা সবাই বৃটিশ সরকারের চোখে সন্দেহভাজন ব্যক্তি। যাই হোক প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালে জীবনানন্দ দাশ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমাকে বহু বই পাঠিয়েছিলেন। আর এই সব বই প্রেসিডেন্সি জেলের সিকিউরিটি কর্মীদের কাছে খুব প্রিয় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সময় সাধারণ মানুষ বৃটিশ সরকারের ভয়ে আমাদের মতন রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে সাহস করতো না, সেই সময় এই দু'জন অগ্রজ কবি আমার প্রতি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন—তা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আগামীকালের কবিতা'-য় কোনো রাত্রির মৃত্যুতে কবিতাটি আমি জীবনানন্দ দাশকে নিবেদন করে লিখেছিলাম। 'আগামী-কালের কবিতা' প্রকাশিত হবার পর একটি কপি আমি কবিকে পাঠিয়েছিলাম। সে সময়ের কথা বলছি—সে-সময় র‍্যাডক্লিফের অস্ত্রোপচারে ভারতবর্ষ দু-ভাগ হয়ে যায় নি, সারা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ আছে।

কবি আমাকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা আমি এখানে হুবহু উল্লেখ করছি :

সর্বানন্দ ভবন

বরিশাল

২. ৭. ৪৬

প্রীতিভাজনেষু

June মাসে আমি বরিশালে ছিলাম না। দু এক দিন হ'ল ফিরে এসেছি। আপনার কবিতার বই পুস্তিকা ও চিঠি পেয়েছি। ধন্যবাদ জানবেন। 'এখানে ছিলাম না বলে প্রাপ্তি সংবাদ দিতে দেরী হয়ে গেল। মার্জনা করবেন না কি ?

আপনার সাহিত্য প্রীতি আমার ভাল লেগেছে। আপনার বইয়ের ভিতরে তার প্রমাণ পেলাম ; সাহিত্যিক উৎকর্ষের পথে আপনাকে নিয়ে যাবে আশা করি। দশ বারো দিন পরে আবার কলকাতায় যেতে পারি।

প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

এরপর দেশবিভাগ হলে কবি কলকাতায় চলে আসেন। আমি ১৮৩ নং ল্যান্সডাউন রোড-এর (অধুনা শরৎ বসু রোড) বাড়িতে বহুদিন গেছি। কবির সঙ্গে নিভৃতে কত মধুর সন্ধ্যা কাটিয়েছি। সন্ধ্যাবেলায় আমরা দুজনে লেকের ধারে বেড়াতে যেতাম। ঘাসের ওপর বসে কবি তাঁর কত সুখ দুঃখের কথা বলতেন। হঠাৎ কবি নিজেই আবৃত্তি করতে লাগলেন :

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সব চেয়ে সুন্দর করুণ ;
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল ;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশথ, বট, জারুল, হিজল ;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে,—সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল ;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর ;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে ;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার ; এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে

তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো—বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

আবৃত্তি শেষ হলো। কবি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : ভিজে ভিজে ঘাস ও জলের ধারে এসে আমার দেশের বাড়ির কথা খুব বেশী করে মনে পড়ে। মন খারাপ হয়ে যায়।

এই সময় কলকাতার এই বাড়িতে জনৈক এক ভদ্রলোক কবির একটি ঘর জোর করে দখলে রাখে। কবি সেজন্য খুব মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলেন। যতদূর মনে হয় ১৯৫৩ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস হবে। কবি এই অশান্তির হাত থেকে মুক্তি চাইতেন। এ সময় একদিন দেখা না হলে কবি আমাকে চিঠি লিখে তাঁর অভিযোগ জানাতেন। বহুদিন দেখেছি অন্ধকারে কবি বারান্দায় একা বসে আছেন। এমনি একদিন রাত্রি প্রায় আটটা কি সাড়ে আটটা হবে কবির সঙ্গে দেখা করতে গেছি। কবি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। টেবিলের ওপর কবির সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন' রয়েছে। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন এ যুগের প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

আমি হাতে তুলে নিয়ে বললাম : বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন।

কবি আমাকে বললেন : প্রচ্ছদপট সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ?

আমি বললাম : প্রকাশনার ক্ষেত্রে সিগনেট প্রেস তো যুগান্তকারী বলা যায়। আপনার কি রকম লাগছে বলুন।

কবির মুখ দেখে আমি বুঝেছিলাম কবি এই প্রচ্ছদপট দেখে অখুশী।

তিনি শুধু বললেন : আমার বনলতা সেন এমন দেখতে নয়। এ যেন রাজকুমারী অমৃত কাউরের মতন কেউ হবে।

কবি ক্ষুব্ধ। অথচ কেমন যেন বিমনা।

আমি তখন বললাম :

'প্রেমিকের মনে হল : এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে ;
সেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর—জনিত বাসনা নিজে—বাসনার মতো ভালবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।'

আবৃত্তি শেষ হতে দেখলাম : কবির চোখ দুটি জলে ভরা। এমন বিষণ্ণ ভাব আর কখনো দেখি নি।

আমার 'শিলাহার' কবিতার বই তখন ছাপা হ'চ্ছে। এটি আমার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। কয়েকটি ছাপা ফর্মা নিয়ে চলেছি কবি জীবনানন্দ দাশকে দেখাতে।

বর্ষা শুরু হয়েছে। ল্যান্সডাউন রোডে জল। জল ভেঙে নির্দিষ্ট সময়ে যখন কবির কাছে উপস্থিত হলাম কবি তখন আমাকে দেখে বললেন: একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি। একটা কাপড় দেবো বদলে ফেলবেন?

আমার কেমন যেন লজ্জা হলো। আমি বললাম: না না ওসবের কোনো দরকার হবে না। 'শিলাহারে'র কয়েকটা ফর্মা এনেছি। আপনি যদি দয়া করে ভূমিকাটা লিখে দেন তা হলে গভীর খুশি হবো।

কবি জিজ্ঞেস করলেন: আপনার বইয়ের প্রচ্ছদপট কাকে দিয়ে আঁকাচ্ছেন।

আমি বললাম: অন্নদা মুন্সী।

'আমাকে আগে দেখাবেন।' বললেন কবি জীবনানন্দ দাশ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কবি আমাকে স্বেচ্ছানির্বাসিত কবি বলে ডাকতেন। বোধ হয় আমি সব সময় সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতাম না। এখনও পারি না।

জীবনানন্দ আমার কবিতা পড়ে তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন: 'রমাপতি বসুর কয়েকটি কবিতা পড়েছি। বাংলাদেশের ও পশ্চিমের কয়েকজন বড় পূর্বজ কবির কবিতা তাঁর ভাল লেগেছে উপলব্ধি করলাম। তাঁর কবিতার ভেতর এ সব কবিরা রয়েছেন রমাপতিবাবুর নিজের ভঙ্গি ও ভাবনায় নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে।

তাঁদের উত্তরাধিকার তিনি নিজের ভাবে অনুপ্রাণিত করে দেখতে চেয়েছেন। নিজের সুরে নিজের পৃথিবী নির্মাণ করবার কাজে হাত দিয়েছেন; নানা কবিতায় তার নিদর্শন তাঁর কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে কৌতূহলী করেছে।

তিনি কবিতার বিষয় নির্বাচন করেছেন এ কালের মন নিয়ে; কাজেই তাঁর কবিতায় নানা বিষয়ের সমাবেশ; লিখেছেন একজন বিপ্লবী চিন্তানায়ককে লক্ষ্য করে; নারীর ওপর; কাঠবিড়ালীর ওপর গদ্য কবিতায় লিখেছেন: পৃথিবী পুনরাবৃত্তির পথে যায় এগিয়ে, তবুও আখরোট গাছের ডালে কাঠ-বিড়ালীর ঘোরাফেরার নিস্তার নেই; সময়ের গতির সঙ্গে ভাব গতির সামঞ্জস্য: একটা ভবিষ্য পৃথিবীর ইশারা করে লিখেছেন:

'আজকের এই বেষ্টনীর আয়ু অল্প, আগামী কালের যা প্রতিচ্ছবি হবে—তা মাত্র একটি রেখায় বেষ্টিত হবে;' 'আনিব আগামীকাল সম্ভাবনাময় / সূর্যের কৌতুকে আর আনন্দ কৌতুকে / সে দীপ্ত দিনের জন্য থাক ইতিহাস / আমি তার পূর্ণ প্রতিভাস।

কবি জীবনানন্দর এই অভিমতটি আমি আমার 'শিলাহার' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করতে পারি নি। এর প্রধান কারণ কেন জানি না আমার বার বার মনে হয়েছে আমি কবি নই। আমি যা লিখেছি তা কবিতা নয়। জীবনানন্দ দাশের পাশে আমার কবিতা কত নিষ্প্রভ। আর এই কারণে আমি কবিতা না লিখে গল্প, উপন্যাস লেখায় মন দিই। এরপর যে কবিতা লিখি নি— তা নয়। তবে তা কবিতা হয়েছে কি না—সে বিচার পাঠকেরা করবেন।

আমি জীবনানন্দ দাশের ভক্ত। কাজেই তাঁর কবিতা আমার মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে—তা কোনোদিন আমি প্রকাশ করি নি। এটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তবে 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা অবেলা কালবেলা', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে বহু কবিতা আছে। এখন আমায় যদি কেউ প্রশ্ন করেন: এই সব কবিতা পড়ে আপনার কি মনে হয়েছে?

আমি তার উত্তরে বলবো: জীবনানন্দ দাশ শিল্পীমানসের অধিকারী। সুন্দরের উপাসক অথচ বেদনায় মহিমান্বিত। যখনই তাঁর কবিতা পড়া যায়— তখনই মনে হয় তিনি আধুনিক। আর সব চেয়ে বড় কথা—তিনি যে ভাবে কবিধর্ম পালন করেছেন; সেই শক্তি ও সৎসাহস এ যুগেও বিরল। তাঁর কবিতায় নিজস্ব মহিমা ও কাব্যমূল্য আছে। সবচেয়ে বড় কথা জীবনানন্দ দাশ সংযমী ও আত্মবিশ্বাসে স্থির। জীবনজিজ্ঞাসা বলতে যদি বোঝায় প্রজ্ঞা-প্রীতি ও দর্শন, তাহলে সহজ করে বলা যায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সহজেই সত্যের উদ্ভাস হয়। বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা নয়, অনুভূতি দিয়ে আরো অন্তরঙ্গ করে জীবনানন্দর কবিতা পড়লে—বোঝা যাবে তাঁর কাব্য বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্য। তাঁর আসন বাংলা কাব্যে ধ্রুব।

আমার বন্ধু জীবনানন্দ

সুবোধ রায়

ভোলা যায় না। ভোলা অসম্ভব।

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে সব কথা।...কবি জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে কিছু বলতে বা লিখতে গেলে তাই আজো মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসে কতো হারানো সুর, কতো অজস্র কথা। আর সব কিছুকে ছাড়িয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ে মৃত্যু-মর্মর একটি বিবর্ণ, বিষণ্ণ রাত্রির কথা।

উনিশশো চুয়ান্ন সালের চোদ্দোই অক্টোবর, বিষ্যুৎবার।

প্রায়োত্তীর্ণ সেই এক সর্বনাশা ধূসর সন্ধ্যা।

ঘটনাট. যেমন আকস্মিক, তেমনি মর্মান্তিক।

চোখের সামনে এখনো ভাসে সর্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজে বাঁধা মৃত্যুপথযাত্রীর একটি করুণ, অসহায় মুখ। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের সেই অতি পরিচিত দু নম্বর ওয়ার্ড। ডাক্তার, নার্স, পেথিড্রিন, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, চূর্ণিত রক্তাক্ত বুকের পাঁজরা। সেই এক বিশ্রী, বেদনাবহ পরিবেশ। চারিদিকে রাত্রির কুয়াশার মতো ছড়ানো নিথর, নিঃশব্দ মৃত্যু-বিভীষিকা।

তাই প্রায়শই আমি সজীব, সতেজ, সুস্থ জীবনানন্দকে-ই ভাবতে চেষ্টা করি। ভাবতে ভালো লাগে।

বহু পরিচিত, বহু আলোচিত এই আত্মগত, বিশিষ্ট কবিকে অনেকেই হয়তো চেনেন, কিন্তু মানুষ জীবনানন্দকে চেনা-জানার সুযোগ বোধ করি আমিই পেয়েছি সবচেয়ে বেশি। অবারিত মেলামেশা এবং ঘন সান্নিধ্যের জন্যই শুধু নয়, দু'জনের কাছে আমরা দু'জনে ছিলাম নিঃশঙ্ক, নিঃসংকোচ। অপরিচয়ের লজ্জা নেই। দূরত্বের কোনো ব্যবধান নেই। তাঁর বাড়িতে ছিলো আমার স্বচ্ছন্দ, অবাধ গতিবিধি। তাই অনায়াসেই হয়ে পড়েছিলাম কবির সান্ধ্য-ভ্রমণের নিত্য সহচর।

আর তাঁর মনের গভীরে জলস্রোতের মতোই যে মিশেছিলাম একদিন। সে কথা কবিজায়া লাবণ্য দাশ সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় এবং শ্রীমতী কবিতা সিংহ সম্পাদিত "দৈনিক কবিতা" পত্রিকায় ছাপার অক্ষরেই বলেছেন।...স্পষ্টই বলেছেন লাবণ্য দাশ: শুধু প্রাত্যহিক সঙ্গী নই, আমিই ছিলাম কবির অতি

প্রিয়, সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। গল্পের বিরাম নেই। কখনো কখনো রাত্রি একটা দুটো পর্যন্তও চলতো আমাদের গল্পের আসর।

…কিন্তু সে কথা থাক। সে অন্য প্রসঙ্গ।

আমি এখন মুখ্যত কবির ব্যক্তিজীবনকে নিয়েই আলোচনা করবো। আত্মভোলা, অন্তর্মুখী, একান্তভাবে আত্মসমাহিত জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে। আর সত্যি কথা বলতে কি, সেই আমার নিজস্ব এলাকা। ·· কবির অনন্য-সাধারণ কাব্যপ্রতিভা, সুদুর্লভ মনস্বিতা, তাঁর আশ্চর্য সুন্দর শব্দ যোজনা, বাচনভঙ্গিমা, প্রতীক নির্মিতির সুনিপুণ কৌশল অথবা কবিতার মাধ্যমে তাঁর দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা আলোচনা করুন বুদ্ধিজীবী, বিদগ্ধ সমালোচক সমাজ। সে কাজ আমার নয়। আমার স্থান সেখান থেকে যোজন দূরে। তা এতে লজ্জা, সংকোচের কিছু নেই। আমার এই অক্ষমতা আমি অকপটেই স্বীকার করছি।

কাজে কাজেই মানুষ জীবনানন্দকে আমি যেমন দেখেছি, যেভাবে পেয়েছি, সেই কথাই এখানে বলার চেষ্টা করবো। আমার নিজের ধারণা, অল্পবিস্তর সব কবি ও লেখকদেরই একটা নিজস্ব সত্তা, স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং কিছুটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকেই থাকে। তাই স্বভাবতই তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনকে চিনতে ও জানতে আমাদের এমন অদম্য কৌতূহল। এবং বোধ করি এই কারণে ঠিক আমার মতোই এক অতৃপ্ত সাধ ও কৌতূহলকে চরিতার্থ করতে চেয়েছিল কবি এবং গল্পকার অরবিন্দ গুহ-ও। এখন যে "ইন্দ্রমিত্র" ছদ্মনামে 'সাজঘর', 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', "আপন জন" প্রভৃতি আরো বহু গ্রন্থের খ্যাতিমান লেখক।

কথা প্রসঙ্গে একদিন আমি বলেছিলাম অরবিন্দ গুহকে :

জীবনানন্দের ছেলে সমরানন্দের জন্যে ভালো একজন প্রাইভেট টিউটর যোগাড় ক'রে দাও না? তোমার তো জানাশোনা কতো লোক আছে।

আছে ঠিকই। তবে…দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে তাকালে অরবিন্দ: কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন সুবোধদা…অর্থাৎ বলছিলাম কি…মানে কথা হচ্ছে, আমার থেকে যোগ্যতর ব্যক্তি তো আমি কাউকে দেখছি নে আর।

বাকপটু ক্ষুরধার বুদ্ধি এই ছেলেটিকে আমি দীর্ঘদিন চিনি।

বললাম: কী মুশকিল—আরে তোমাকেই তো চাইছিলাম। একটু শুধু পরীক্ষা ক'রে দেখলাম। ঠিক কিনা জিজ্ঞেস ক'রে দেখো। জীবনানন্দকে আমি তোমার কথাই বলেছি। জিজ্ঞেস ক'রে দেখো তুমি।

ব্যস্ আর কথা নয়। তক্ষুনি রাজী অরবিন্দ গুহ। কবি জীবনানন্দ দাশ শুধু তো ওর অধ্যাপক নন প্রিয়তম কবি। কতো যে প্রিয় সে কথা তো আমি আগেই জানতাম। টিউশ্যানি তো গৌণ, এখানে দুর্লভ কবিকে আবার অনেক দিন পর কাছে পাবার আনন্দটাই তো মুখ্য।

আমার কথাও তাই।

এই বিরাট প্রতিভার অবারিত সঙ্গ-সান্নিধ্য পেয়ে আমিও একাধারে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয়ে কবির খুব কাছে যাবার অজস্র-অফুরন্ত সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। ভাবতে অবাক লাগে, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা-রাত আমার অবারিত, অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতিতেও কোনোদিন তাঁর ক্লান্তি ছিল না। বিরক্তি ছিল না।

শুধু অনুপস্থিত ছিলাম একটি দিন। সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার দিন।

মৃত্যুগন্ধমাখা সেই এক কুহকিনী রাতকে আবার মনে পড়ছে।

ডাউন বালিগঞ্জ ট্রামের এক দুর্বার, দুর্নিবার আকর্ষণকে সেদিন এড়িয়ে যেতে পারলেন না অন্যমনস্ক এক বিভ্রান্ত পথচারী। রক্তপিপাসু যন্ত্রদানবের মৃত্যু আলিঙ্গনে চূর্ণ-বিধ্বস্ত হয়ে গেল রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আধুনিক বাংলার সর্বাগ্রগণ্য কবি জীবনানন্দ দাশ।

জ্বর হয়েছিল আমার। তাই বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও কবির কাছে সেদিন আর যেতে পারি নি। ঘরে চুপচাপ বসেই ছিলাম। আমার স্ত্রী আবার একবার বলল : ভারি তো জ্বর ··ঘুরেই এসো না - কবি এত ক'রে বললেন।

সেই ভালো। ঘুরেই আসি।···ল্যান্সডাউন রোডে কেবল পা বাড়িয়েছি, দেখি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, ফ্যাকাশে, অস্বাভাবিক চেহারা, একেবারে হন্তদন্ত হ'য়ে আমারই কাছে ছুটে আসছে রঞ্জু ··কবি জীবনানন্দ দাশের প্রিয়তম সন্তান : জানেন কাকাবাবু, সর্বনাশ হয়ে গেছে। উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কালো রঞ্জুর মুখ : আপনি তো চলে এলেন...ঠিক তারপরেই—জানেন আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাবাকে এইমাত্র হাসপাতালে নিয়ে গেল।

সে কি ? আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম : কি বলছো তুমি ? এই তো কিছুক্ষণ আগে—উনি কি একাই বেরিয়েছিলেন নাকি ?

হাঁ একা। আপনি চ'লে আসার কিছুক্ষণ পরেই।

—কিন্তু খবরটা পেলে কার কাছে ? তোমার বাবাই যে জানলে কি করে ?

ঐ যে 'জল খাবার' মিষ্টির দোকান...তার মালিক এসে বলে গেছেন।

—বৌদি— মঞ্জু —এরা বাড়ি নেই কেউ ?

—না।

আর কথা নয়। রোগ যন্ত্রণা ভুললাম। রঞ্জুকে নিয়ে ছুটে গেলাম সেখানে। রাসবিহারী ল্যান্সডাউনের মোড়ে টুকরো টুকরো ভিড় তখনো এখানে সেখানে ছড়ানো। য়ুনিভার্সাল ফার্মেসির সামনের ফুটপাথে জলের দাগ এখনো মুছে যায় নি। ইতস্তত ছড়ানো রক্তমাখা তুলো আর বরফের টুকরো। তাজা চাপচাপ কালচে রক্ত রাস্তাতেও।

আসল খবর সংগ্রহ করলাম 'জলখাবারের' স্বত্বাধিকারীর ভাই প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীচুনীলাল দের কাছ থেকে। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার প্রথম থেকেই প্রাথমিক চিকিৎসায় তিনি আপ্রাণ-আন্তরিক সাহায্য ক'রেছেন।···খুবই স্বাভাবিক। পরোপকারী, এই কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান যুবককে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এই রকম :

'জলখাবার' ('শেলি কাফে' নামে সে মিষ্টির দোকানটি অধুনা নামান্তরিত) ছাড়িয়ে "জুয়েল হাউসের" সামনে দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন জীবনানন্দ দাশ। চুনীবাবুর মতে শুধু অন্যমনস্ক নয়, কী এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন কবি। স্টপিং স্টেশন থেকে তখনো ট্রাম প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে। ক্রমাগত ঘণ্টা বাজানো ছাড়াও বারবার সাবধান ক'রে দিয়েছিল ট্রাম ড্রাইভার। তবুও যা অনিবার্য তাই ঘটল। গাড়ি থামল এখন, প্রচণ্ড এক ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই কবির দেহ যখন ক্যাচারের ভেতর ঢুকে গেছে।

ক্যাচারের কঠিন কবল থেকে অতিকষ্টে টেনে হিঁচড়ে বার করলেন সবাই কবির রক্তাপ্লুত, অচৈতন্য দেহ। কেটে ছিঁড়ে থেঁতলে গেছে এখানে সেখানে। রক্তের ছোপ মাথায়, হাতে বুকে— ডান চোখের এক কোণে। চুরমার হ'য়ে গেছে বুকের পাঁজরা, ডান দিকের কণ্ঠা, কনুই আর উরুর হাড়। আঘাত হেনে যন্ত্রদানব-ও অক্ষত রইল না। তুবড়ে গেল ক্যাচার, তুবড়ে গেল সামনের খানিকটা অংশ। কোনো নিশ্চল, স্থির ল্যাম্পপোস্ট কিংবা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে নয়। এক অসহায়, নিরীহ পথচারীকে আঘাত ক'রে।

ধরাধরি ক'রে সবাই মিলে কবির বেহুঁশ দেহ নিয়ে গেলেন রাস্তার ওপারে।··· তারপর জল-বাতাস-বরফ। ধীরে ধীরে বেশ কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে পেলেন কবি। রক্তে ভেজা আধা আধা চোখের পাতা খুললেন :

কি হয়েছে ? আমি এখানে কেন ?

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। আচ্ছা বলুন—আপনি কোথায় থাকেন ? আপনার নাম-ঠিকানা কি ?

জীবনানন্দ দাশ। ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। অতি অস্ফুট কণ্ঠ। খানিক এদিক ওদিক তাকালেন :

আমি এখন বাড়ি যেতে পারি ?

তা যেতে—মানে—আমতা-আমতা করলেন ভদ্রলোক :

অবিশ্যি যদি আপনার মনে হয়···হাঁ—তা · যেতে পারেন বই কি।

উঠতে গিয়েই কবি ধড়াস ক'রে ফুটপাথের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন, উঠবেন কি ক'রে ? ছাতু হ'য়ে গেছে ডান পা। নড়বড়ে অসাড় শরীর। যেমন তেমন জখম নয়। অত্যন্ত গুরুতর আঘাত। এইবার এতক্ষণে সবাই বুঝলেন।

অতএব আর এক মুহূর্তও দেরি নয়।

তক্ষুনি ডাকা হ'ল ট্যাক্সি। ···উদার, উপচিকীর্ষু মন নিয়ে এগিয়ে এলেন ডোভার লেনের এক কর্তব্যপরায়ণ তরুণ, শ্রীবিমলেন্দু শীল···উক্ত ট্রামেরই অন্যতম যাত্রী। সঙ্গে গেলেন শ্রীচুনীলাল দে এবং আরো দু'একজন। একজন পুলিস-ও।

রঞ্জুকে বললাম, আমি যাচ্ছি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। তুমি তোমার কাকামণি ও কাকীমাকে (কবি অনুজ অশোকানন্দ দাশ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী নলিনী দাশ) শীগগির গিয়ে খবর দাও। এখুনি যাও। দেরি ক'রো না। ···বারান্দায় শুয়ে আছেন কবি। কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ। স্ফীত, বিকৃত মুখ। চেনাই যায় না। ডান চোখের ওপর ঢিপি হয়ে উঠেছে মাংস পিণ্ড। অস্ফুট আর্তকণ্ঠ। ছটফট করছেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়। পাশেই বসে আছেন কবির অতি আদরিণী কনিষ্ঠ সহোদরা—শ্রীমতী সুচরিতা দাশ। গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন স্নেহময়ী মার মতো। কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে গায়ে হাত দিলাম আমি-ও। বরফের মতো ঠাণ্ডা শরীর! আমাকে দেখে চোখ তুললেন : এসেছেন ? দেখুন তো কি সব হয়ে গেল। আচ্ছা—আমি বাঁচবো তো ?

কেন...কি আর এমন হয়েছে আপনার ? দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। স্তোক বাক্য। যন্ত্রচালিতের মতো মুখস্থ বলে গেলাম।

আরও খানিক বাদে এলেন কবিজায়া শ্রীমতী লাবণ্য দাশ। ত্রস্তা, শীতার্ত পাতার মতো কম্পমানা। নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন স্বামীর কাছে। হাতে হাত রাখলেন প্রথমে। তারপর ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা পাঞ্জাবিটা সরিয়ে হাত বুলোলেন বুকের ওপর।...

জ্বলে যাচ্ছে   জ্বলে যাচ্ছে · উঃ আর পারছিনে। অসহ্য···আমি আর পারছিনে। সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে ··উঃ কী অসহ্য যন্ত্রণা। ···ফোলা ফোলা চোখ দুটো অতি কষ্টে আবার বুঝি খুললেন একবার : 'কে ?...উঃ কী যে হল'।

না-না তুমি কিছু ভেবো না !···কোনো ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

এদিকে ডাক্তার···অক্সিজেন সিলিণ্ডার পেথিড্রিন নার্স···কিছু উৎসুক, উৎকণ্ঠিত লেখক ভিজিটার্স। পাগলের মতো দিশাহারা হ'য়ে ছুটোছুটি করছেন, কবি অনুজ শ্রীঅশোকানন্দ দাশ। সর্বক্ষণ অস্থির, চিন্তাকুল। স্তব্ধ নির্বাক কুণ্ঠিতা দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীমতী নলিনী দাশ। গভীর চিন্তাকুল তিনিও।

পরদিন সকালে আবার গেলাম। ছটফটানি অস্থিরতা তখনো কিছু কমে নি। উশখুশ করছেন···আর ক্রমাগত বলছিলেন বমি করবো—আমি বমি করবো। তোমরা কেউ ধরো আমাকে·· আমি বমি করবো।

করলেনও বমি। বোধহয় বার তিন চার। রক্ত বমি। তাজা লাল দলা দলা রক্ত। · দু'বেলা রোজ যাই।···তৃতীয় দিন অবস্থাটা কিছু ভালোর দিকেই বলা যায়। ·· ডাঃ এ কে বাসু আর অমল দাশকে নিয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও স্বয়ং উপস্থিত হলেন একদিন। আর যা হয় সাধারণত। ডাঃ রায়ের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন এক জাদুমন্ত্রে হাসপাতালের চেহারা ও ব্যবস্থায় রাতারাতি একটা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। অন্য পরিবেশ। এ যেন অন্য এক হাসপাতাল।

চতুর্থ দিনে কবিকে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। বেশ সুস্থ, স্বাভাবিক চেহারা। কাছে যেতেই বললেন : এই খানিক আগে বুদ্ধদেব আর প্রতিভা বসু এসেছিল। কি যেন চিন্তা করলেন একটুক্ষণ···একে একে সবাই তো এল সুধীন দত্ত, অচিন্ত্যকুমার ; সজনী দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নীরেন চক্রবর্তী, দিনেশ দাস, অরুণ সরকার, অরবিন্দ গুহ, আলোক সরকার, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়···আরো কতো নাম যেন মুখস্থ বলে গেলেন। কিন্তু হতাশ, বেদনার্ত কবির কণ্ঠ : কিন্তু কই—প্রেমেন তো এল না।

হঠাৎ অন্য এক প্রসঙ্গ। অবুঝ শিশুর মতো কেমন এক লোভাতুর দৃষ্টি : শুনছেন ? বিকেলে একটু আচার নিয়ে আসবেন তো। খুব আচার খেতে ইচ্ছে করছে।···

সর্বনাশ! কী বলছেন আপনি! ডাক্তার, সিস্টার র্যাটেনডাণ্ট সবাই ঘুরছে ফিরছে···হঠাৎ কানে গেলে ভাববে কি ? হাসপাতালে আছেন, এবার পাগলা গারদে পাঠাবে!

আনবেন না? ঠিক আছে। না আনলেন।...হাঁ ভালো কথা, শুনুন এই যাঁরা আমায় দেখতে আসছেন না নাম ধাম ঠিকানা সময় সব ঠিকঠাক লিখে রাখবেন কিন্তু। দেখবেন যেন ভুল না হয়। লাবণ্য তো সবাইকে চেনে না।

আরও একদিন পর।··

সেদিন কেমন একটা আচ্ছন্ন মুহ্যমান ভাব দু একটা কথা বলেন আর ঘুমিয়ে পড়েন। হবে না? সাতখানা পাঁজরার হাড় গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গেছে। চুরমার হয়ে গেছে বুক। রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে সর্বক্ষণ। পাঁজরার একটা হাড় ফুসফুসের মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় ফুসফুস-ও গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে।···

অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে স্পষ্ট বোঝা যায়।

বাইশে অক্টোবর। শুক্রবার...

সকাল থেকে কথা বলতে গেলে বন্ধ-ই হয়ে গেল কবির। অনেক চেষ্টা, অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রেও কিছুই আর খাওয়ানো গেল না। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে আবার ৬০০ সি-সি রক্ত আনা হল। বৃথা। সব পড়ে রইলো শেষ পর্যন্ত। আস্তে আস্তে আলোর মতো, জলের মতো, কাঁচের মতো স্বচ্ছ হয়ে আসছে সব।···জীবন মরণের একটানা অবিরাম সংগ্রাম চলছিল এতদিন।·· অনিদ্রা, যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট। তারপর এক সময় বন্ধ হয়ে গেল শ্বাস। চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন কবি।

রাত্রি তখন বারোটা পঁয়ত্রিশ।···প্রার্থনা, প্রতীক্ষা, এত যে প্রত্যাশা, সব ব্যর্থ। ···সেই নিথর মৃত্যু স্তব্ধতার বুক চিরে ঘোষিত হল এক নির্মম মর্মান্তিক সত্য। ···কবি নেই।··নেই সেই নিত্য দীপ্যমান, জলন্ত সূর্যের রৌদ্র-দোসর। ধানসিড়ি নদী তীরে, হেমন্তের মাঠে মাঠে, রূপসীর চুল আর নরম ধানের গন্ধ ভরা পৃথিবীর কোলে ধূসর নির্জন পথে, কোনোদিন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না সেই গন্ধাশ্রয়ী ঘ্রাণমুগ্ধ কবিকে।··জীবনের ভিড়ে আজ অনুপস্থিত জীবনানন্দ দাশ।

তেইশে অক্টোবর·শনিবার সকালে কথাটা বলেছিলাম প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। তাঁর প্রতি কবির অসীম ভালোবাসা আর শেষ পর্যন্ত তাঁকে একটিবার দেখার জন্যে আন্তরিক ইচ্ছা আকুলতার কথা। সব কথা শুনে নিভে গেলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুশোচনায় ম্লান তাঁর কণ্ঠ: আসলে কি জানেন, প্রথমত ভুল রিপোর্ট পেয়েছিলাম। তারপর সঠিক খবর যখন পেলাম—তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শুনলাম, আচ্ছন্ন ভাব। বাক্‌শক্তিহীন, জ্ঞান হারাচ্ছেন মাঝে মাঝে, মোটে আর চিনতেই পারছেন না কাউকে। অস্ফুট বাষ্পরুদ্ধ প্রেমেন-

বাবুর কণ্ঠ : শুনে খুব কষ্ট হ'ল। অমন একটা কষ্টকর করুণ অবস্থা দেখার জন্যে মনকে কিছুতেই আর শক্ত করতে পারলাম না। আসলে আমি মোটে সহ্যই করতে পারিনে এ সব। অবিশ্যি এখন অনুতাপ হচ্ছে। খুবই কষ্ট হচ্ছে। ...কথা হ'ল অন্য প্রসঙ্গেও। তাঁর বাড়িতে যাবার জন্যে বার বার অনুরোধ করলেন। গেলাম-ও একদিন সকালে। সুপরিচিত অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।...সুদীর্ঘ আলোচনা হ'ল বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। অনেক কথার ভেতর একসময় প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন :...উদাসীন, নিঃসঙ্গ জীবনানন্দ। কেমন যেন এলোমেলো, দলগোত্র ছাড়া। যেন অন্য এক পৃথিবীর মানুষ। একটু সময় থেমে আবার বললেন, সত্যি এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য রহস্যময় জীবনানন্দের জীবন। এবং এই একমাত্র কারণেই কবির সঠিক নির্ভুল চরিত্র বিশ্লেষণ আজ একান্ত প্রয়োজন। কবি জীবনানন্দকে চেনেন অনেকে। কিন্তু মানুষ জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচয় খুব অল্প লোকের। কাজে কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখার দায়িত্ব ঠিক তাঁদেরই যাঁরা কবির সঙ্গে মিশেছেন ঘনিষ্ঠভাবে। কেবলমাত্র তাঁর অনুরাগী অগণিত ভক্ত পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থের জন্যেই তার প্রয়োজন। এই ধরুন না কেমন এক হতাশার সুর প্রেমেন্দ্র মিত্রের কণ্ঠে : বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতে গেলে আজ পর্যন্ত কিছুই তেমন লেখা হয় নি। আর আজ কে না জানে—একটি সমান্তরালবর্তী রেখায় যে দুটি ব্যক্তিকে পাশাপাশি রাখা যায়, তারা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দাশ। ভিড়ে নিরুদ্দিষ্ট। বহুর মধ্যে একক। সংসারে থেকেও বিচ্ছিন্ন।...আর এই একই কথা একদিন একটি গানের আসরে স্বনামধন্য কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-ও আমায় বলেছিলেন।

কথাটা মিথ্যে নয়। নির্জন একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গ ভ্রমণকেই তিনি পছন্দ করতেন বেশি। তাই ভাবতে অবাক লাগে—আমিই বুঝি ছিলাম তার একমাত্র ব্যতিক্রম। এক আধ দিন নয়। সুদীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই কবির প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণের আমিই ছিলাম একমাত্র অপরিহার্য সঙ্গী। প্রতিটি সন্ধ্যায় আমার আশা-পথ চেয়ে ব'সে থাকতেন। না গেলে ক্ষুণ্ণ হতেন।

কারণটা অবিশ্যি দুর্বোধ্য নয়।...কবির মনের গোপনতম রন্ধ্রেও আমার ছিল অবাধ, অসংকোচ প্রবেশাধিকার। ধাক্কা দিতাম, দোলা দিতাম, কথার সুড়সুড়ি দিয়ে অনায়াসে জাগাতে পারতাম তাঁর নিভৃত-ঘুমন্ত মনকে। আর

শুধু আমার একার কথাই বা বলি কেন···ঘনিষ্ঠভাবে মিশে অন্তত একটা কথা আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম। তিনি ভালোবাসতেন কৌতুকপ্রিয়, আনন্দবাদী মানুষ। খোলামেলা, হাসিখুশি অথচ জীবনদর্শন সম্বন্ধে যারা কিছুটা সজাগ ও সচেতন। আর বোধ করি এই কারণেই তিনি আনন্দবাদী, মুক্ত হৃদয় অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষকেও খুব পছন্দ করতেন।···কবির সহকর্মী এবং অন্যতম অকৃত্রিম গুণগ্রাহী বন্ধু অধ্যাপক অজিত ঘোষ।

অনেকেই হয়তো জানেন না। কবি ছিলেন ব্যঙ্গে সুনিপুণ। দারুণ রহস্য-প্রিয়। রঙ্গ-রহস্য, কৌতুকপ্রিয়তা কবির অস্থিতে, রক্তে, মজ্জায়। এক রকম সহজাত-ই বলা যায়। একটু রসের আভাস, এতটুকু কোথাও হিউমারের গন্ধ পেলেই—ব্যস্ আর দেখতে হবে না: তখন আর সেই রোমান্টিক, রূপোপজীবী কবি জীবনানন্দ নয়। অন্য মানুষ। হাস্য কৌতুকের প্রতি ছিল তাঁর এমনই দুর্বার আকর্ষণ।

নিজে তো জানিই। অশোকানন্দ এবং শ্রীমতী সুচরিতা দাশের কাছেও মজার মজার অনেক গল্প শুনেছি। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই কবি চরিত্রের একটি বিচিত্র দিক উদ্ঘাটিত হবে:

চুল উঠছিল কবির। মাথার পিছন দিকটা ক্রমশ কেশবিরল হ'য়ে আসছিল। বিশ্রী, বিশ্রী। টাক কবির চক্ষুশূল। অতএব টাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ভাইটেকস্, বলডেকস্, বলড্ অ্যাণ্ড মিলক্রিম; 'মহাভৃঙ্গরাজ' টাক নিবারণের যতো কিছু পাশুপত, ব্রহ্মাস্ত্র··একে একে নিক্ষেপ করলেন সব। তবু কিছুতেই কিছু নয়।

আসছিলাম লেক ভিউ রোড দিয়ে একদিন।

ধূসর সন্ধ্যা তখন রাত্রিতে রূপান্তরিতা। খুব ক্লান্ত। অনেকটা পথ হেঁটেছি সেদিন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞেস করলেন:

আচ্ছা—আমার টাকটা বোঝা যায়? দেখুন তো পেছন থেকে।

এ প্রশ্ন নতুন নয়। কম ক'রেও সহস্রবার বর্ষিত হয়েছে।

'না' বললে খুশি হন। 'হাঁ' বললে চিন্তিত।

বললাম: তা একটু বোঝা যায় বই কি। কবিতায় সূর্য বন্দনা তো আজ পর্যন্ত কম করেন নি। এখন ঠ্যালা সামলান।

তার মানে?

মানে তো স্পষ্ট। ভর দুপুরে রাস্তায় যখন বেরুবেন, আপনার ঐ টেকো চাঁদি ফাটিয়ে ছাড়বে আপনার ঐ জলন্ত সূর্য।

···না-না সূর্যকে আমার ভয় নেই। ভয় রাত্রিকে। কিছুদিন পরে তো লাইট পোস্টের তলা দিয়ে আর হাঁটতেই পারবো না। চাঁদিনী রাতে দেখেছেন কোনোদিন পদ্মার ইলিশকে ডিগবাজি খেতে?···ব'লেই সর্বাঙ্গ দুলিয়ে সেই উদ্দাম, উচ্ছ্বসিত জীবনানন্দের হাসি।···শুনে আমিও হাসতে হাসতে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম কবিকে: সাবাস—মহাকবি জীবনানন্দ দাশ।

কবির মুখ থেকে লাগসই কিছু শুনলেই আমি তক্ষুনি বলতাম, সাবাস জীবনানন্দ দাশ। মহাকবি বললেই কেমন যেন একটু বিব্রত, অপ্রস্তুতের হাসি হাসতেন। আমি ছাড়া তাঁকে আরও একজন 'মহাকবি' ব'লে সম্বোধন করতেন। তিনি অধ্যাপক অজিত ঘোষ। অনেক সময় দু'জনে দ্বৈতকণ্ঠেও বলতাম।

হাঁটায় এতটুকু ক্লান্তি নেই জীবনানন্দের।

যদি বলেছি কোনোদিন, দূর, আর পারছিনে বাপু, একটু দাঁড়ান।

অমনি কপট ভর্ৎসনার গর্জন: খাড়ান কিয়া?

প্রশ্ন করি, এ আবার কোন্ দেশী ভাষা?

উত্তর হয়. মাতৃভাষা। বরিশালের। অরবিন্দ গুহকে জিজ্ঞেস করবেন।

দ্বিরুক্তি না ক'রে অনিচ্ছুক পায়ে আবার হেঁটে চলেছি। জনহীন পথ। মাথার ওপর মেঘ ঢাকা চাঁদ। সামনে গাছ-গাছালি। পায়ের-নিচে নরম, গাঢ় সবুজ ঘাস।

হঠাৎ এক বিশ্রী—বিকট কণ্ঠের চীৎকার: ভাউয়া—ভাউয়া।

সে আবার কি?

ঐ তো দেখছেন না? কি রকম ড্যাবড্যাব ক'রে তাকিয়ে আছে। ভীষণ লাফায়। আর চোখ খুবলে নেয়!

তা ওরকম ভাউয়া—ভাউয়া ক'রে চেঁচাচ্ছেন কেন?—ও তো কোলা ব্যাঙ। আমাদের বরিশালে ভাউয়া বলে। আপনার অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করবেন।

শুধু কি পরিহাসপ্রিয়তা? এক অদম্য শিশুসুলভ কৌতূহল ছিল কবির।··· পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। ···হঠাৎ এক সময় দেখি আমি একা। কবির দু'পায়ে যথারীতি শিকড় গজিয়েছে। একেবারে স্থির, নিশ্চল, নিষ্পলক। ইশারায় ডাকলেন আমাকে। ঠিক যা ভেবেছি তাই। 'বসনালয়ের' সামনে ঝকঝকে নতুন একটা প্লিমাথ গাড়ি থেকে নামলেন এক বেঢপ, কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি। শালপ্রাংশু, পর্বতপ্রমাণ এক স্থূল মাংসপিণ্ড। হাঁসফাঁস করছে শরীর। তবু কেমন দিব্যি চটপটে, হাসিখুশি ভাব।

এই নিয়ে চলার পথে রসালো আলোচনা ভারি প্রিয় কবির: আচ্ছা

সুবোধবাবু, এরাও তো নভেল নাটক পড়ে। হয়তো কবিতা-ও। সিনেমা দেখে, গানের জলসায় যায়। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করে। করে না?

নিশ্চয়ই করে। এবং আরো অনেক সুস্থ, শিক্ষিত, রূপবান স্বামীর মতোই করে। আর খোঁজ নিয়ে দেখুন, ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী, নির্ঘাত পরমাসুন্দরী এবং স্বামী বলতে অজ্ঞান।

বলেন কি! সত্যি? ·

এই 'সত্যি' কথাটি একটা সহজ-সরল নিষ্পাপ শিশুর মতোই উচ্চারণ করতেন জীবনানন্দ।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একদিন গা টিপছেন আমার—সেই চাপা হাসি, রহস্য তির্যক্ দৃষ্টি আর অনুচ্চ ফিসফিস কণ্ঠ: দেখুন—দেখুন আপনার বাঁ দিকে। যাকে বলে মরালগ্রীবা আর লীলায়িত ভুজবল্লরী। দেখেছেন? · দেখলাম। দর্শনযোগ্য বস্তুই বটে। খর্বকায়, মণ্ডুকাকৃতি বিরাট স্থূলাঙ্গী, এক ভদ্রমহিলা। থপথপ ক'রে হেঁটে চলেছেন। শরীরের ভেতর গ্রীবা কিংবা কটিদেশ বলতে যাঁর কোনো বস্তুই নেই। আর লীলায়িত নয়। স্থির দুটি হাত সিমেন্টের থাম সদৃশ।

পথেঘাটে ছড়িয়ে আছে এমনধারা কতো যে বিচিত্র হাস্যোদ্দীপক চরিত্র। সে সব কথা কবি অনেকবার বলেছেন অশোকানন্দকে। আমাকেও। কবির এই স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস আর কৌতুক প্রিয়তার কথা শ্রীমতী সুচরিতা দাশ এবং মঞ্জুশ্রীর কাছেও কতোবার শুনেছি। সুচরিতা বলেন: দাদার মুখে নিত্য নতুন মজাদার গল্প শুনে আমরা সবাই হেসেই কুটিপাটি। অথচ আশ্চর্য! এমন সব রাশি রাশি উচ্চাঙ্গের গুরুগম্ভীর কবিতা যে লেখে, কি ক'রে যে সেই একই ব্যক্তি এমন হাসির তুফান তুলতে পারে; চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। ···কথাটা সত্যি। আমার কাছেও মজুত আছে এমন অজস্র গল্প। প্রখ্যাত লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছেও শুনেছি আরো অনেক। উজ্জ্বল উল্লেখযোগ্য, কৌতুকোদ্দীপক গল্প। সে সব আমি অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি। অনাবশ্যক এই প্রবন্ধের তাই আর কলেবর বৃদ্ধি করলাম না।

কি একটা কথায় কবিকে একদিন বলেছিলাম: স্বপ্ন রহস্যময় সত্যি ভারি মিষ্টি আপনার কবিতাগুলির নাম—ধূসর পাণ্ডুলিপি, আকাশলীনা, মনোকণিকা, সূর্যতামসী, নির্জন স্বাক্ষর।

অল্প একটু হেসেছিলেন: তা নামের একটা আলাদা মহিমা, আলাদা মাধুর্য

আছে বই কি। এই ধরুন না—রবীন্দ্রনাথের নাম যদি হলুইদাস পতিতুণ্ডি আর আমার নাম গদাধর তলাপাত্র হ'তো, তা'হলে কেমন শোনাতো বলুন তো?
আমার সঙ্গে আমার দুই মেয়ে সুচিত্রা মীনাক্ষী প্রায়ই যেতো কবির বাড়িতে। একদিন হয়েছে কি পরনের গেঞ্জিটা খুলে আরেকটা নতুন গেঞ্জি বুঝি পরতে যাচ্ছিলেন জীবনানন্দ। হঠাৎ কথাবার্তা নেই. আমার দুই কন্যা তো হেসেই খুন···কবিকে খালি গায়ে এর আগে আর কোনোদিন দেখে নি ওরা। জীবনানন্দের সারা গায়ে অসংখ্য কালো তিল। নধর সুপুষ্ট শরীর। মুখের তুলনায় গায়ের রঙ অনেক ফর্সা। তিলগুলিও তাই খুলেছে ভালো।·· অবাক চোখে তাকিয়ে হাসলেন কবি: কিগো চিত্রা মীনা হেসে যে একেবারে গড়িয়ে পড়ছো কী ব্যাপার? ও বুঝেছি। এত তিল দেখে—তাই না? তা হাসির কথাই তো। সব অপাত্রে দান বুঝলে মা। তার চাইতে এই তিল গুলি তোমাদের গায়ে থাকলে—তিলে তিলে তিলোত্তমা হতে পারতে। বলেই হাসি। স্থির হয়ে যায় চোখ। ওপরের ঠোঁটটা কাঁপে প্রথমে। কাঁপে কিছুক্ষণ। তারপর উদ্দাম উচ্ছ্বসিত হাসির ধমকে ফেটে পড়েন একেবারে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই যে অনবরত আসি, সারাক্ষণ মেতে থাকি আপনাকে নিয়ে, হয়তো কত অসুবিধা হয় আপনার। চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হয় তো কিছু বলতে পারেন না। একথা প্রায়ই ভাবি।
ঠিক উল্টো। বরঞ্চ আপনি এলে মন মেজাজ আমার ভালো থাকে। আমার মনোকষ্ট তো আপনি সবই জানেন। আপনি এলে সব ভুলে যাই। you are a perpetual source of pleasure...I enjoy your Company immeusely. বিশ্বাস করুন যদি কোনোদিন আমি আত্মজীবনী লিখি—you will definitely remain as a land mark in my autobiography. সযত্ন রক্ষিত সেই সব লেখা মঞ্জুশ্রীকে দেখিয়েছি। টুকরো টুকরো আরো অনেক কথা একমাত্র মঞ্জুকেই বলেছি বোধ হয়।
চিড়িয়াখানা কবির অতি প্রিয়। প্রচণ্ড আকর্ষণ।·· চন্দনা কাকাতুয়া হাঁস ঘুঘু ময়ূর···দিঘির জলে ভাসা কতো বিচিত্র বর্ণ পাখি। আর সর্বোপরি ঠাণ্ডা নির্জন ছায়াবীথি আর দিগন্ত বিস্তৃত ঘন বনানীর স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী। ভরদুপুরে কতোবার যে গেছি তাঁর সঙ্গে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। আগেই বলেছি হাঁটায় তাঁর ক্লান্তি নেই। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর চিত্র প্রদর্শনী দেখতে দু'জনে হেঁটেই গেছি গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে। আবার হেঁটেই ফিরেছি সারাটা পথ। ···মধে আর অন্য কথা নেই। দিনরাত শুধু বরিশাল, বরিশাল আর বরিশাল।

বরিশাল কবির ধ্যান স্বপ্ন জপমাত্র। বরিশালের বনশ্রী, বরিশালের রূপ বর্ণনা কবির মুখে আর ধরে না।· বরিশালের এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা কবির প্রিয় বন্ধু অচিন্ত্যকুমারও একদিন আমায় বললেন,—পটুয়াখালি থাকতে একদিন উনি গিয়েছিলেন জীবনানন্দের বাড়িতে। কবির সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন পুরো একটি দিন। মাঠে মাঠে, সোনালি শিষ সবুজ ধানক্ষেতে আর রাঙা মাটি লাখুটিয়ার পথ ধরে সারাদিন টো টো করেছিলেন দু'জনে। ...তারপর এক সময় ধানসিড়ি নদীর কিনারে দু'জনে চুপচাপ বসেছিলেন পাশাপাশি ··মাথার ওপর মুক্ত নীল আকাশ, সম্মুখে বিস্তীর্ণ বিপুল জলরাশি, দু'পাশে উচ্চশির মর্মরিত ঘন নিবিড় ঝাউবীথি— আর পায়ের নিচে কিশোরীর নরম শরীরের মতো গাঢ় সবুজ ঘাস।...মুগ্ধ বিস্ময়ে তাই অচিন্ত্যকুমার বার বার বলছিলেন, বরিশাল অপরূপা, সত্যিই শ্রীময়ী। প্রকৃতির সেই সীমাহীন ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যকে চোখে না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস হয় না। বরাবর লক্ষ্য করেছি শুধু নিরাসক্ত নন, নিরহংকার। অস্মিতা, অহমিকা কিংবা কোনোরকম আত্ম-প্রাধান্য বোধ একেবারেই ছিল না—জীবনানন্দের।

তরুণ শক্তিশালী লেখকের লেখা খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। ভালো লাগলে নির্দ্বিধায় অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। শুধু নিজেই পড়তেন না, পড়িয়ে শোনাতেন আমাকে। একদিন অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করলেন সর্বশ্রী মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা সম্পর্কে, কিছু কিছু লেখা দেখালেনও: দেখেছেন কি রকম বুদ্ধিদীপ্ত লেখা। আজকের কবিতায় কতো বিচিত্র সুর আর নতুন ভাবনা যে দেখা দিয়েছে তার উজ্জ্বল সার্থক উদাহরণ এই সব কবিতা। জীবন্ত ছবি সব। এঁরা সত্যিকার সৎ জীবননিষ্ঠ কবি।...

আগেই বলেছি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অতি প্রিয় বন্ধু। তাঁর লেখা সম্পর্কে একদিন বললেন, প্রেমেন যে কতো উঁচু দরের কবি সে কথা তার অসাধারণ কাব্য গ্রন্থ 'প্রথমা' পড়ে বোঝার দরকার হয় না। প্রেমেনের যে কোনো গল্প উপন্যাসের মধ্যেও তার সেই অপূর্ব কাব্যময়তা। আর বুদ্ধদেব বসুর প্রতি ছিল কবির অগাধ শ্রদ্ধা। বলতেন, He is a genius. I'm greatly indebted to him · আমি যদি আজ কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা অর্জন করে থাকি—সে শুধু বুদ্ধদেব আর 'পূর্বাশা'র জন্যেই। ওঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। হঠাৎ একদিন প্রেমেন্দ্র মিত্র আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা সুবোধ ·· তুমি তো দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছো জীবনানন্দের সঙ্গে—তোমারও কি মনে

হয় তিনি নিঃসঙ্গ নির্জনতম কবি ছিলেন? প্রেমেনদার এই প্রশ্নের উত্তর আমি অন্যত্র দিয়েছি। তবে জীবনানন্দের নির্জনতা প্রসঙ্গে কবি শুদ্ধসত্ত বসুর অভিমত মূল্যবান তাৎপর্যপূর্ণ এবং বোধ করি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আর সে কথাও আমি সবিস্তারে অন্যত্র আলোচনা করেছি। আমার মনে আছে শুদ্ধসত্ত বসুর একটি লেখা কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। লেখাটি পড়তেও দিয়েছিলেন আমাকে।

…সেদিন আমি 'শঙ্খমালা' কবিতাটি অনেকবার পড়েছিলাম। খুব ভালো লাগে আমার এই কবিতাটি। লেকের ধারে এক ছায়া ঘন অন্ধকারে দু'জনে পাশাপাশি পা ছড়িয়ে ব'সে উচ্চারণ করেছিলাম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি: 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার—দুইখানা হাত তার হিম…বললাম; স্বপ্নালুতা আর জীবনানুভূতির এই এক নিখুঁত ছবি। শুধু আনন্দ দেয় না। সৃষ্টি করে এক অনির্বচনীয় স্বপ্নলোক। আশ্চর্য আপনার প্রেমের চিত্রে সম্ভোগের কোনো সংকেত নেই। যৌনগন্ধের আবিলতা নেই। আপনি আকণ্ঠ পিপাসু রূপকার—শুধুই বর্ণগন্ধাশ্রয়ী কবি।

নিঃশব্দ। অপলক তাকিয়ে ছিলেন কবি: আচ্ছা এত যে লিখলাম, এর একটিও কি সুপ্রীম পোয়েট্রি হয় নি? যা আমার মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে পারে?

শুধু একটি কবিতা। কতো সীমিত সাধ।… তবু মৃত্যু আসে। মৃত্যু নির্মম। মৃত্যু ক্ষমাহীন। মৃত্যু চিন্তায় অস্থির আচ্ছন্ন কবি।…"এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব ভাসিতেছে চিরদিন" "অনেক ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখ নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি"—আতংকে হিম মৃতদের মতো তাই এই ধূসর মৃত্যুকে ভীষণ ভয় কবির।…

তাই আজো আমার স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসে: অসহায় মুমূর্ষু কবির সেই ম্লান পাণ্ডুর মুখ। মৃত্যুভয়ে মর্মরিত তাঁর সেই মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস। সেই ভয়ার্ত

আমি বাঁচবো তো? বুবু আমায় বাঁচিয়ে দে ভাই। ডাক্তারবাবু—আমাকে আপনারা বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু।

না না আজ নয়। এখুনি নয়। এখনো যে আছে অনেক সোনালি দিনের স্বপ্ন। আরো কতো অতৃপ্ত সাধ আশা। আরো কতো সক্ষম, সম্ভাবনাময় অপূর্ণ রঙিন কামনা।

যদিও কবি নিজেই একদিন বলেছেন:

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
জানি না কি আহা—
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে—
ধূসর মৃত্যুর মুখ।"

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

বাণী রায়

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ যে দ্বীপে ক্ষণ-বিশ্রাম লাভ করে, সে দ্বীপে অবশ্যই তার পায়ের চিহ্ন পড়ে থাকে না।

যে পথ ক্ষণজন্মারও প্রতিটি পায়ের ছাপ ধরে রাখতে পারে না, আমি সেই পথ। আমার জীবনে অনেক দুর্লভ প্রতিভার নিকটস্থ হবার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু সহজপ্রাপ্তির আনন্দে মূল্যবানকেও যথোচিত মূল্য দিতে পারি নি হয়তো। আজ মনে অনুতাপ আসে; জীবনানন্দ দাশের সঙ্গ যখন পেয়েছিলাম, কেন আরও নিবিড়তার সন্ধান করি নি; কেনই বা প্রত্যেকটি সাক্ষাতের খুঁটিনাটি সম্পর্কে একান্তচিত্ত হই নি? অনাত্মীয়া মহিলা হিসাবে হয়তো কম নারীই এই লজ্জাশীল ও সমাজবিমুখ কবির নিকটস্থ হবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে মিশেছিলাম পুরুষের মতো করেই। তাই কবি হয়তো আমার কাছে কদাচিৎ সহজ অন্তরঙ্গতায় ধরা দিতেন। নারী সম্পর্কে তাঁর সহজাত সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে সুদূর সংকোচ ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের দিনগুলি সংখ্যায় অধিক ছিল না, কিন্তু গভীরতায় গাঢ় ও স্থায়িত্বে দীর্ঘ ছিল। সেই অমূল্য দিনগুলির স্মৃতি শোকতন্ময় মনে একমাত্র সান্ত্বনা। আমি তাঁর জীবনের কোনো ঘটনা বা incidents সম্পর্কে অবহিত হবার চেষ্টা করি নি, কেবল মানুষ হিসাবে তাঁকে চিনবার চেষ্টা করেছিলাম।

স্বর্গগত জীবনানন্দ দাশ আমার বন্ধু নলিনীর ভাশুর হতেন। তিনি বিবাহের পর তাঁদের রসা রোডস্থ বাসা মোহিনী ম্যান্‌সনে আমাকে ডেকেছিলেন। সেখানে জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ (১৯৪৩-৪৪ সাল আনুমানিক)। নলিনী জীবনানন্দের কনিষ্ঠ অশোকানন্দকে বিবাহ করেছে জেনে আমি উল্লসিত ছিলাম। সমাজবিমুখ, লজ্জাশীল, প্রখ্যাত কবি কিন্তু নিজেই আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত আমার 'লুক্রেশিয়া' গল্প পড়বার পরে। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বাণী রায়?"

একটু সন্দেহাকুল মনে হ'ল ওঁকে,— "হ্যাঁ" উত্তরের পর তেমনি ভাবেই প্রশ্ন করলেন, "লুক্রেশিয়া আপনার লেখা?"

তিনি যেন যাচাই করে সত্যাসত্য জেনে নিতে চান। তখন আমি নবীনা লেখিকা মাত্র, কবিকে দেখে আমারই সংকোচ হবার কথা। প্রথম আলাপ কিন্তু অত্যন্ত সহজ অন্তরঙ্গতার মধ্যেই সম্পাদিত হয়েছিল।

এই পরিচয়ের প্রকৃত রূপটির মধ্যে জীবনানন্দের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনি নূতন লেখকদের রচনা পাঠ করতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস ছিল। সাহিত্যকে তিনি ভালবাসতেন অতি আন্তরিকভাবে। 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যেক সংখ্যায় প্রায় তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও সেই পত্রিকা তিনি পাঠ করতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত গুণগ্রাহী। তারপর ল্যান্সডাউন রোডের বিতলে আবার তাঁর সঙ্গে পূর্ব আলাপের সূত্র টানা হয়। শেষ পর্যন্ত সেই ঠিকানা ছিল তাঁর। জীবনানন্দ তখনও বরিশাল কলেজে অধ্যাপনা ছাড়েন নি। ছুটিতে যাতায়াত চলছে ও ছেড়ে দেবার উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। কবির মা তখন জীবিতা ছিলেন। তাঁর অতীত কবি-খ্যাতি শুনেছিলাম। কবির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ছিলাম না। তবে জানি মাতাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ছোট বোন সুচরিতা ও ছোটভাই অশোকানন্দের প্রতি তাঁর প্রচুর স্নেহ ছিল। তাঁর পুত্র, কন্যা ও সহধর্মিণীকে বন্ধুমহলে টেনে আনার বিপক্ষে ছিল তাঁর আত্মগোপনধর্মী সত্তা। সাংসারিক তরীর হাল ধরা ছিল কবিপত্নীর হাতে। নিজের ঘরে অনেক বই নিয়ে সম্পূর্ণ সাহিত্য-পরিবেশে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে জীবনানন্দ ভালবাসতেন। আর ভালবাসতেন মনের মতো বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা। প্রত্যেকদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে লেকের ধার পর্যন্ত ভ্রমণ তাঁর অভ্যাস ছিল। এই অভ্যাস তিনি কখনও ছাড়েন নি। বিকেলের পর তাঁকে বাড়ি পাওয়া শক্ত ছিল। ১৪ই অক্টোবর (১৯৫৪) লেকের পার থেকে ভ্রমণ সেরে ফেরার পথেই তিনি ট্রামের ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন। ২২শে অক্টোবর হাসপাতালে তাঁর জীবনান্ত হয়।

প্রকৃতির প্রতি জীবনানন্দের প্রবল আসক্তি ছিল, তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তির আড়ালে সেই প্রকৃতিকে ধরা যায়। হয়তো সেই প্রকৃতির আকর্ষণ নিত্য তাঁকে লেকের ধারে নিয়ে যেত। একলা যেতেন। বরিশালে তিনি বি. এ. পর্যন্ত পাঠ করেছিলেন। মাঠে ঘাটে যথেচ্ছা ভ্রমণ তাঁর অভ্যাস ছিল। ফলে, প্রকৃতির যে রূপ-রঙ-গন্ধসমৃদ্ধ একটি রূপ তাঁর কাব্যে দেখা দেয়, সে প্রকৃতি আর কোনো বাঙালী কবির কাছে সেইভাবে ধরা দেয় নি। একটু নিরিবিলি—শান্ত পরিবেশ এই সহজ সরল মানুষটি পছন্দ করতেন। স্বল্পভাষী

ও গম্ভীর বাহ্যত হ'লেও ব্যক্তি হিসাবে জীবনানন্দ সরল-অমায়িক ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। প্রয়োজন হ'লেও তিনি কোথাও অনুনয়ের ধার দিয়েও যেতেন না। অর্থের অভাব কখনও বা ঘটলেও অর্থের লোভ ছিল না। ইংরেজীতে কলকাতা থেকে এম. এ, পাসের পর তিনি বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপনা করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে থাকাকালীন আমার সঙ্গে তাঁর যোগ হয়। তারপরেই এক বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় স্থায়ী কাজের উদ্দেশে আসেন। তারপরে ব্যাঙ্কের কাজ নেন। 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদনায় যুক্ত থাকেন কিছুদিন। মধ্যে বাইরে ও মফঃস্বলে কাজ করতেন; যথা, খড়্গপুর কলেজে। প্রাইভেট ছাত্র পড়াতেন, প্রবন্ধ লিখতেন। বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে কিছুদিন কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত হাওড়া উইমেন্‌স কলেজে ছিলেন। তাঁর পুত্র সমরানন্দ দাশ, কন্যা মঞ্জুশ্রী, স্ত্রী লাবণ্য দাশ। জীবনানন্দ ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। এ সমস্তই তো বাইরের কথা। জীবনানন্দের ভাবে বলতে পারি, স্মৃতির গহ্বর হলুদপত্রাচ্ছন্ন। বাষ্প-উত্থিত স্মৃতিমূর্তির মুখ কখনও বিষণ্ণ, কখনও রঙে উজ্জ্বল। সে মূর্তি চেয়েছিল একটু নিশ্চিন্ত অবকাশ কাব্যরচনার নিমিত্ত। জীবিকাটুকু উপার্জনের প্রয়াস ক্লান্ত করেছিল তাঁকে। যান্ত্রিক রুটীনের অঙ্গীভূত হওয়ার বিপক্ষে বিদ্রোহ ছিল তাঁর—অযোগ্যের অধীনতা ছিল অসহ্য। নিঃসঙ্গ এই বিহঙ্গ আত্মার স্বপ্ন ছিল নক্ষত্রে নক্ষত্রে :

"...সেই উষ্ণ-আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘে, নক্ষত্রের মতো র'ব নক্ষত্রের সাথে।"

(অনেক আকাশ)

অবসর, লেখার জন্য অবসর কামনা ছিল তাঁর। তিনি পছন্দ করতেন সাহিত্যিক পরিবেশ ও নির্জনতায় লেখার মেজাজ তৈরি করা ও সাহিত্যপঠন। ছাত্রের মতো অধ্যয়ন তাঁর কাম্য ছিল। মনের রূপ ছিল অনুসন্ধানী; প্রতিটি বস্তুর, বিশেষত বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের যথার্থ রূপ ধরবার প্রয়াস ছিল তাঁর। পড়তে তিনি ভালবাসতেন। ইংরেজী সাহিত্যের কোনো কোনো বই তাঁকে ধার দিয়েছিলাম। মনে আছে দুটি নাম শুধু, মমের 'থিয়েটার' উপন্যাস ও ক্রোনিনের 'দি স্টার লুক্‌স্ ডাউন' উপন্যাস তাঁর ভাল লেগেছিল। তিনি বিভিন্ন দেশের উপন্যাস ও কবিতার আলোচনা করতে চাইতেন। জার্মান লেখক টমাস্ মানের রচনাকে তিনি আধুনিক উপন্যাসে শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন। সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতা ও এলিয়টের কবিতায় জীবনানন্দের অনুরাগ দেখেছিলাম। একটু

প্রাচীন কবি, যথা মধুসূদন ইত্যাদির কবিতা তাঁর ভাল পড়া ছিল না। ইংরেজী গল্প-উপন্যাস অপেক্ষা কন্টিনেণ্টাল গল্প-উপন্যাস তিনি বেশী পড়েছিলেন। সমস্ত সাহিত্য-আলোচনার মূল সুর দেখতাম নিজের মতকে তিনি আমার মতেরও ভিত্তির উপর রাখতে চাইতেন। অন্যের কাছ থেকে সত্যকে যাচাই করে নেবার এক প্রবৃত্তি।

কতকগুলো জাগতিক বিষয়ে দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় হলেও জীবনানন্দ অন্তরঙ্গ ও সমধর্মী বন্ধুদের কথা উপেক্ষা করতেন না। পিতা সত্যানন্দ দাশ ধর্মপরায়ণ শিক্ষক, মাতা কুসুমকুমারী দাশ কবি। সন্তানের মনে শুচিতাবোধ ছিল প্রবল, রুচি ছিল মার্জিত। কিন্তু মনের গতি সেই প্রাচীন সমাজের মধ্যে সীমায়িত হয়ে রুচিবাগীশের কলমে কিছু কবিতা লিখে ক্ষান্ত হয় নি। মাতার উত্তরাধিকারী তিনি হয়েছিলেন কাব্যক্ষেত্রে। কিন্তু, মাতা যখন লিখেছেন :

"বিপাসার তীরে ওঠে রবি"

পুত্র লিখেছেন :

" · গেছে বুক—মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ – নারীর মতন
এ-দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে !" ('পিপাসার গান')

স্পর্শ-স্বাদ-গন্ধে ভরা একটি জগতে কবি প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে নৈতিক ধর্মশাসনব্যর্থ। প্রি-রাফেলাইট কবি সুইনবার্নের সঙ্গে অনেকে তাঁকে তুলনা করেছেন। আমরা আমাদের দেশের কোনো লেখককে যতক্ষণ না বিদেশী মানদণ্ডে মাপ করতে পারি, স্বস্তি পাই না। জীবনানন্দ যে তাঁর নিজের মতো, একথা বলতে আমাদের বাধে।

প্রকৃতপক্ষে, গ্রামীণ পরিবেশ রচনায় বাংলা-সাহিত্যে জীবনানন্দের সমতুল্য ছিলেন গদ্যকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে তুলনীয় জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি।' দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন কখনও পৃথক হ'লেও সাদৃশ্য প্রচুর। প্রাকৃতিক বা গ্রামীণ পটভূমির যে সমস্ত অজানা, অচেনা বস্তুপুঞ্জ ইতিপূর্বে কারুর ভাবদৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি, তাদের অন্তরঙ্গ রূপ আমরা প্রথম দেখলাম কবিতার মাধ্যমে :

"দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;"

('মৃত্যুর আগে')

সাম্প্রতিক কবিতার সঙ্গে তুলনায় কবিতায় ভাষায় পুরাতন কোনো লক্ষণ দেখা যাবে। জীবনানন্দের মত ছিল, কোনো বাঁধাধরা নিয়ম অবলম্বনে কবিতা লেখার অনুশাসন স্থাপন না করা। 'করেছি' সহজ কথ্য ভাষা, কিন্তু 'করিয়াছি' যদি কলমে আসে তা'হলে তাই রাখা উচিত। 'মিল' সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। প্রাচীন পদ্যের ভাষাও ছুৎমার্গের প্রথায় সর্বতো বর্জনীয় নয়। 'লয়ে' কথাটির ব্যবহারে জীবনানন্দের মত ব্যক্ত আছে, ক্রিয়াপদও উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলির সাধুভাষায়। আধুনিক কাব্যের যিনি জনক ছিলেন, তাঁর কবিতায় আর যা হোক আঙ্গিকের দিক থেকে হাস্যকর কৃচ্ছ্রসাধন দেখা দেয় নি। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে আবেগের স্থান সংকীর্ণ হয়ে গেলেও কবি আবেগ ধর্মী কবিতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

জীবনানন্দের কাব্য-সমালোচনা নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়। মানুষ হিসাবে তাঁকে যে ভাবে দেখেছি, সেই সূত্র ধরে অনিবার্য কাব্য স্মরণ মাত্র। কবি মায়ের মুখে বরিশালের লৌকিক ছড়ার উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন শৈশবে। সে সব ছড়ায় অবশ্যই প্রাকৃত বাংলার ঘনবুনানি ছিল। তাই বোধহয় কবি বঙ্গ ভাষায় তাঁর স্বপ্নচারী সুদূর কবিতার মধ্যে মধ্যে অঙ্গরাগ করতেন :

"আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—"

অথবা

"ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব" ('অবসরের গান')
"মোর দেহ ছেনে গেছে অলস—আঢুল কুমারী আঙুল" ('পিপাসার গান')
"মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে"—

('ক্যাম্পে')

এই অভিনবত্ব সর্বত্রই যে রুচিকর হয়েছে তা নয়, কবিতায় অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্বর আদিমতা জানিয়েছে কথ্য ভাষার মিশ্রণ ও সিমেণ্টের মতো কবিতার গাঁথুনী পাকা করেছে অবলীলাক্রমে। এক্ষেত্রে কথার ভাষায় সাহিত্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামত কিয়ৎপরিমাণে ভাবব্য।

জীবনানন্দের কবিতায় দুর্বোধ্যতা আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো

ভাল কবিতা কি বহু সময়ে তাই নয়? সহজবোধ্যতাই সাহিত্যে উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি নয়। ইদানীং কবি যে সমস্ত কবিতা লিখছিলেন, তাদের মধ্যের চিন্তাধারার যোগসূত্র পাঠকের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কখনো সাংবাদিকের প্রথায়, কখনো দার্শনিকের তন্ময়তায় কাটা-কাটা কথা সাজিয়ে গেছেন। অবচেতন মনে তাঁর চিন্তাধারার সংযোগ অবশ্যই ছিল; লিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির অর্থ তাঁর নিজের কাছে সহজ। কিন্তু, পাঠক বিপন্ন হন। তাই জীবনানন্দের কবিতার আবৃত্তি সহজ নয়। ভাল ক'রে না বুঝে পাঠ করলে সে কবিতার অন্তর্নিহিত সংগীত ও তাৎপর্য প্রতীয়মান হয় না। আবার ভালভাবে পাঠ করতে সক্ষম হ'লে বিরুদ্ধবাদীর মনও অর্থ নির্ণয়ের পর আপ্লুত হয়ে যায়। এটি পরীক্ষিত সত্য।

জীবনানন্দকে একদিন বলেছিলাম তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য। তিনি তাঁর অভ্যস্ত রঙ্গ-ভঙ্গিমায়, প্রতিবাদ জানালেন। আমি কিছু না বলে দ্বিতল থেকে তাঁর একটি নবতম প্রকাশিত কবিতা নিয়ে এসে ওঁর হাতে দিয়ে বিনীত অনুরোধ জানালাম, "দয়া ক'রে এটি একটু বুঝিয়ে দিন না।" আমার পূর্ব থেকেই ইচ্ছা ছিল ওঁর কবিতার অংশবিশেষ ওঁর কাছ থেকে বুঝে নেব।

জীবনানন্দ লজ্জিত, অপ্রতিভ হলেন। নিজের কবিতা যেন গোপন বস্তু, কোনো মতেই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে আলোচ্য নয়। অত্যন্ত অপ্রস্তুত মুখে তিনি নাগপাশ মোচনপ্রয়াসী ব্যক্তির আকুলতায় বলে উঠলেন, "আজ থাক। পরে একদিন হবে।"

সেই মুহূর্তে তাঁর আত্মার একটি বিশেষ রূপ আমার চোখে পড়ল। আত্মগোপন। তিনি যে কবি, এই শোচনীয় ঘটনা বাইরের লোকের কাছে তুলে ধরার নয়। সাহিত্য-আলোচনা ও মনুষ্যচরিত্র দর্শন কাম্য হ'লেও নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কবিতা নিয়ে কবিরূপে জনতার সম্মুখে উপস্থিত হবার বাসনা তাঁর ছিল না। তাই সভা ও সভার ফুলের মালা তাঁকে খুঁজে পায় নি। তিনি লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। কখনও কোনো সভায় নিয়ে যাওয়া যেত না তাঁকে। তাঁর কণ্ঠে তাঁর কবিতার আবৃত্তি অপূর্ব সুন্দর ছিল। কণ্ঠ তাঁর গম্ভীর পুরুষোচিত, যুক্ত হয়েছিল আবেগ। রেডিওতে তাঁর কাব্যপাঠ যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা জানেন কি অপরূপ মূর্ছনা ও আবেগে সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর স্পন্দিত হয়ে উঠত। তখন বোঝা যেত, মাত্র তখনই বোঝা যেত, জীবনানন্দ দাশ কত বড় কবি। সেনেট হলের (২৮শে জানুয়ারী ১৯৫৪) কবি-সম্মেলনে পঠিত 'বনলতা সেনে'র শেষ লাইন দু'টি আজও মনে বাজছে:

"সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

শ্রোতার বারংবার অনুরোধে বিশাল সেনেট হলের ব্যাপ্তি মন্থন ক'রে গভীর আবেগধর্মী কণ্ঠ একটির পর একটি কবিতা পাঠ ক'রে যাচ্ছিল। জীবনানন্দ যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি নিঃসন্দেহে সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল।

জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহুল পঠিত রচনা। আজ তরুণ কবিদের মধ্যে শতকরা আশিজন জীবনানন্দের অনুকরণীয় ভঙ্গিতে কবিতা লিখবার চেষ্টা করছেন, তাঁর পুস্তকগুলির বহু সংস্করণ হয়েছে। যখন সাধারণ তাঁকে চিনতে শুরু করেছে ও তাঁর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উৎসুক হয়ে উঠেছে, তখনি তাঁর ঘটল অকালমৃত্যু।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের যুগ অত স্বপ্নভারাতুর রূপকথার রাজকন্যা নয়। 'ঝরা পালক' ছিল কবির প্রথম কাব্য-পুস্তক—স্বকীয়তা প্রাপ্তির পূর্বে নকল-নবীশ রচনা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' অন্য এক জগতের চিহ্ন রেখে গেল জীবনানন্দের কাব্যধারায়। প্রেমের ব্যথার মধ্যে কবি নিজেকে খুঁজে পেলেন, আর খুঁজে পেলেন পরিচিত জগতের নূতন রূপ।

"জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বার-বার যার ইশারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে-কেঁপে ছিঁড়ে শুধু যায়!
একাকী মেঘের মতো ভেসেছে সে—বৈকালের আলোয়-সন্ধ্যায়!"

সমস্ত জীবনে তাঁর লেগেছে ম্লান গোধূলির আলো, বিষণ্ণ হেমন্ত। তাঁর কবিতার বিষাদ ও বেদনাবোধ তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। সমগ্র কাব্য আচ্ছন্ন করে বাজে :

"আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;" (আট বছর আগের একদিন)

জীবন ও মৃত্যুর ঘন বুননের মাঝে মাঝে দূরের আকাশের ক্ষণদৃশ্য কবিকে উদাস করে দিত। বিরাট পটভূমিকায় সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর

কাব্য। অনেক দূরের দেশে অনেক বড় অতলে ছোট কবিতা হারিয়ে যেত বিভূতিভূষণের জীবনদর্শনের জন্মমৃত্যুর রহস্য আড়ালে এক ও অখণ্ড—

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন",

(বনলতা সেন)

জীবনানন্দের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এক ধরনের ধী-নির্ভর হিউমার। দারুণ রোমান্টিক এই কবির লজ্জাজড়িত স্বল্পভাষণ এবং নিঃসঙ্গ স্বভাব বিভক্ত হ'ত চমৎকার হিউমারের অনুশীলন ও ইঙ্গিতে। তাঁর সঙ্গে আমার কথার যোগ ওখানেই ছিল অল্প কথায় বুঝে নিতে পারা যেত পরস্পরের বক্তব্য ও হাস্যের সেতুবন্ধ রচিত হ'ত নিমেষ মাত্রে। এই শ্রেণীর হিউমার বর্জিত লোকদের আমরা 'the other type' বলতাম। কোন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসায় আমি অর্থবাচক প্রশ্ন করতাম, "উনি কি?" জীবনানন্দ তার চির অভ্যস্ত বক্র হাস্যে উত্তর দিতেন, unfortunately, the other type!"– একটুক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে অন্যের দিকে চেয়ে উনি তার মুখে সায় খুঁজতেন, তারপর হঠাৎ অতি উচ্চস্বরে প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। তাঁর হিউমার অন্যে ঠিকমতো বুঝতে পারল কি না যাচাই করে নেওয়ার পরে তবেই তাঁর দুর্লভ উচ্চহাস্য শোনা যেত। নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ সর্বদাই নিজের পালকের পাখি খুঁজতেন নিঃসংশয়ে।

জীবনানন্দের চরিত্রের এই দিকটি লক্ষ্য করে আমি একদিন প্রস্তাব করলাম, "আসুন না, আমরা একটি বৈঠক খুলি। আমাদের মতো লোক বেছে বেছে অল্পসংখ্যক নেব। কথা বলে বাঁচা যাবে।"

জীবনানন্দকে প্রকৃতির কবি বলা হয়। সহজ শিশুসুলভ সারল্য তাঁর ছিল। কোনো কিছুতে তাচ্ছিল্য বা অবিশ্বাস আমি তাঁর দেখি নি। বন্ধুজন সমক্ষে উৎসাহ, নূতন কিছুতে কৌতূহল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি হাসিমুখে আমার কথা স্বীকার করলেন। উৎসাহিত হ'য়ে বলে চললাম, "এই বৈঠকের নাম দেওয়া যাক Kit-Kat Club, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে যেমন Kit-Kat Club প্রসিদ্ধ হয়েছিল, তেমনি আমাদের এই Kit-Kat Club-ও প্রসিদ্ধ হয়ে উঠবে।"

জীবনানন্দ সপ্রশংসভাবে উচ্চহাসির সঙ্গে আমার খেয়ালকে অভিনন্দিত করলেন। তাঁর প্রবীণ বয়স, নিভৃত গম্ভীর সত্তা যেন এই খেয়ালগুলিকে মর্যাদা দিতে একবার কুণ্ঠিত হ'ল দেখলাম। কিন্তু, পরক্ষণেই তিনি নব উদ্যমে সায়

দিলেন। আমরা বেছে বেছে কয়েকটি নাম নিজের মধ্যে আলোচনা করলাম, যাঁদের সদস্য হতে আহ্বান করা হবে।

Kit-Kat Club অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেস্টোরেশন যুগের সভ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে উনচল্লিশ জন প্রতিভাশালী স্বনামধন্য ব্যক্তি একত্রিত হয়ে এই বৈঠকের সৃজন করেন, (১৭০০-১৭১০), নাট্যকার উইলিয়ম কনগ্রীভ ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইংলণ্ডে নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়ে যে প্রতিক্রিয়াশীল উজ্জ্বল সভ্যতা দেখা দেয়, 'কিট-ক্যাট'এ তারই প্রতিফলন হয়েছিল।

আমাদের এই অখ্যাতনামা কিট্-ক্যাট ক্লাব সেদিন দুই জনের কথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও সদস্যসংখ্যা তার দুইজনের অধিক হয় নি। কয়েকজন সাহিত্যিক ও বোদ্ধাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছিলাম। তাঁরা উৎসাহও দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আমারই উদ্যমের অভাবে গড়ে তোলা হয় নি। আজ আর দুঃখ নেই। রেস্টোরেশন যুগে যদি Kit-Kat Club বিদগ্ধজনের মিলনক্ষেত্র হয়েছিল, আমার এই Kit-Kat Clubও ন্যূন ছিল না, কারণ কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন আমার খেয়ালসৃষ্ট অনামা বৈঠকের সহযোগী।

আমার বাড়ির জনসমাগমহেতু নির্জনতাপ্রিয় কবি কদাচিৎ এখানে আসতেন। যখনই আসতেন আমরা দুরূহ বা জটিল বিষয়ের আলোচনায় মগ্ন হয়ে যেতাম। পরিহাস করে সেই দিনগুলি আমি Kit-Kat Club-এর অধিবেশন বলে আনন্দ পেতাম। একদিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা হ'ল এবং অবশেষে বেলা দু'টো বেজে গেলে অগত্যা সভা ভঙ্গ করতে আমরা বাধ্য হলাম। সেই Mighty Atom আমাদের মানবিক যুক্তিতর্কজালে ধরা দিলেন না। অযথা আহারের সময় উত্তীর্ণ করে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কবিকে ফিরে যেতে হয়েছিল। কিট-ক্যাট ক্লাবের মাত্র দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন আজ নেই। অপ্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞাতকুলশীল, হাস্যজনক শিশু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অন্য সদস্যের যে শ্রদ্ধা ও শোকপ্রকাশ করা সমীচীন, আমি কাগজ কলমে আজ সেই কর্তব্যই পালন করতে উদ্যত হয়েছি।

মানুষ ও কবি জীবনানন্দ কখনও অভেদ, কখনও পৃথক। তাঁকে খুঁজে চিনে নিতে হ'ত—তাঁর কবিতাকেও। রেস্টোরেশন যুগের নীতিবর্জিত বঙ্কিম বৈদগ্ধ্য তাঁর রচনার উপজীব্য নয়, কিট-ক্যাট্ ক্লাবের কনগ্রীভ অথবা 'সুইফ্‌টের পথাবলম্বী বাঙালী কবি জীবনানন্দ ছিলেন না। কিন্তু তবু তাঁকে কেন্দ্র করেই বিংশ শতাব্দীর বাংলায় কিট-ক্যাট্ ক্লাব গড়ে তুলবার স্বপ্ন

দেখেছিলাম। যদি সেই বৈঠক পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত, তাহ'লে আমাদের মধ্যমণি ইংলণ্ড গগনের উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জ অপেক্ষা হয়তো অধিকতর শোভমান হ'তেন। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত কবি। মস্তিষ্কে তাঁর মিল ছিল ও কিট্-ক্যাট্ ক্লাবের বিদগ্ধশ্রেণীর সঙ্গে। তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় আধুনিক কবি। তরুণ কবিকুল তাঁর অনুসারী। তবু মনে হয়, তিনি যদি সত্য Kit-Kat Club-এর সদস্যদের মতো সমধর্মী ও বোদ্ধা বন্ধু পেতেন! কয়জন আমরা তাঁকে বুঝতে পেরেছিলাম?

স্বাভাবিক রঙ্গবোধে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ-সাহিত্যে'র নিয়মিত পাঠক ছিলেন—তাঁকে গালাগালি সত্ত্বেও। একদিন আমরা 'শনিবারে চিঠি'র হিউমার নিয়ে আলোচনারত ছিলাম। সম্পাদক জীবনানন্দ দাশকে সুমধুর বিশেষণে আপ্যায়িত করতেন। অথচ জীবনানন্দের তাতে কৌতুকের অন্ত ছিল না। আমি সান্ত্বনাচ্ছলে বললাম, "বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। সজনীবাবু আপনার যে পাব লিসিটি করেছেন, সে জন্য তিনি ফী চাইতে পারেন।"

"ঠিক বলেছেন।"

"একদিন আলাপ করবেন? অত হিউমারের ভক্ত আপনি।"

"হবে, হবে।"

সেইদিন বিদায়কালে জীবনানন্দ দাশ বলে গেলেন অনাবিল আনন্দের সঙ্গে—"সজনীবাবুকে বলবেন এমনিভাবেই যেন আমার আরো প্রচার করেন। হা, হা, হা!" সেই হাসির প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বলে দিল, লুকোচুরি খেলায় সজনীকান্তের হার হয়েছে। প্রকৃত ব্যক্তি যে; তিনি চিরপলাতক। ছায়াকে বিদ্রূপের বাণবিদ্ধ করবার চেষ্টায় জীবনানন্দকে বিন্দুমাত্র আঘাতও কোনো সমালোচক দিতে পারে নি।

কদাচিৎ, কোনো মুহূর্তে জীবনানন্দের বাহ্য ব্যবহারের কোনো অংশে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাহ্য ব্যবহারের সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য লক্ষিত হত। কিন্তু, বিভূতিভূষণ গদ্যশিল্পী—তাঁর বাহ্য ব্যবহার কখনও বা অভিনেতাসুলভ ছিল, রঙ্গমঞ্চে প্রাদপ্রদীপের উজ্জ্বলতম আলোকসম্পাতের স্থানটি অধিকারের প্রয়াস পরিলক্ষিত হত। আর, জীবনানন্দ ছিলেন অন্ধকারতম কোণটুকুর প্রত্যাশী। তাই তাঁর উদাসীনতা বা নির্জন প্রকৃতি-প্রিয়তা বা সরল অনাড়ম্বর আরও অনেক হৃদয়স্পর্শী। তবু রচনার দিক থেকে গদ্য ও কাব্য-সাহিত্যে এই দুই শিল্পীর অবদান তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা চলে।

জীবনানন্দ সম্পর্কে সহজ কতকগুলি বিশেষণ আমরা পাই—তাঁর কবিতা

চিত্রকল্প, তিনি হেমন্তের কবি। তিনি উপমাবিলাসী। দৃশ্য জগৎকে শুধু চিত্রকল্পে অঙ্কিত করে তিনি ক্ষান্ত নন, অন্য দৃশ্যজগতের সঙ্গে তাকে উপমাতে প্রতিষ্ঠিত করে তবে যেন তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট হত। 'মত' কথাটির বহুল-ব্যবহার তাঁর কাব্যে বিশেষত্ব, কখনও বা মুদ্রাদোষ। এখানেও স্বভাবগত যাচাই করার অভ্যাস দেখা যায়:

"আশঙ্কা ইচ্ছার পিছে বিদ্যুতের মতো কেঁপে ওঠে!
বীণার তারের মতো কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে যায় প্রাণ!
অসংখ্য পাতার মতো লুটে তারা পথে পথে ছোটে,—
যখন ঝড়ের মতো জীবনে এসেছে আহ্বান!
অধীর ঢেউয়ের মতো অশান্ত হাওয়ার মতো গান
কোন্ দিকে ভেসে যায়!" ['জীবন']

লক্ষণীয়, পঙ্‌ক্তিগুলি পাশাপাশি। কিন্তু এখানে মুদ্রাদোষ মাধুর্যরচনায় ব্যাঘাত ঘটায় না। জীবনানন্দের কাব্যে এক কথা বার বার ব্যবহার আছে, শিথিল আলস্যে নয়! তিনি কখনই শিথিল কবি ছিলেন না। সংগীতধর্মী তাঁর এই কবিতাগুলি বার বার এক শব্দ, এক ধ্বনি দিয়ে গানের ধুয়ো সৃষ্টি করে থাকে। নূতন পথের পথিক ছিলেন কবি। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিপরীত পথে আজ পর্যন্ত যত আধুনিক কবি চলে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বকীয়তাসম্পন্ন কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। আঙ্গিক, ভাষা ও ভাবের আমূল পরিবর্তন সূচিত হ'ল তাঁর নিঃসঙ্গ মনের নিজধর্মে বহিঃপ্রকাশের মধ্যে। চিন্তার গতি তাঁর ছিল ভিন্ন, অসাধারণ ও বঙ্কিম। লাজুক স্বল্পভাষী, নির্জনতার কবি কিন্তু নিজের চিন্তাধারার যথাযথ ও অবাধ বহিঃপ্রকাশে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সাহস কেবলমাত্র যুগস্রষ্টার থাকে। বিদ্রূপ, অনাদর, উপদেশ কিছুই তাঁকে নিজের পথ থেকে স্খলিত করে সহজগম্য পথে চালাতে পারে নি। তিনি নিজে যা ভাল বুঝেছিলেন, সেই পথে একনিষ্ঠ ছিলেন শেষ পর্যন্ত। তাঁর মানসিক শক্তি অনুকরণযোগ্য। সাম্প্রতিক কবিতায় তিনি ছিলেন জনক। তাঁর কবিতার প্রথম যোগ্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। পুনরাবৃত্তি, উপমা, পঙ্‌ক্তির অসামঞ্জস্য, আরও নানারূপ প্রক্রিয়া অভূতপূর্ব ভাবপ্রকাশের জন্য কবিকে ব্যবহার করতে হয়েছে। ইচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তি তাঁর বিশেষত্ব কতকগুলি সংজ্ঞা মধ্যে তাদের পুনঃপুনঃ প্রকাশ মনকে বিস্ময় বা অভিনবের আস্বাদে চকিত, উত্তেজিত করে তোলে না। ক্রমাগত পাই চিল, পাখি, হরিণ, প্যাঁচা, বেতফল, ধান, শস্য, ঘ্রাণ, সমুদ্র, জল, আকাশ, মানুষী, মাংস, ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে

কবি-মেজাজের প্রকাশ। সমস্ত কবিতা যে বিষণ্ন-মধুর লোকে প্রয়াণ করতে চায়, সেই লোকের পরিবেশ রচনায় কথাগুচ্ছ নিঃসন্দেহে সাহায্য করলেও কবিমনের কখনও স্থাবরবৃত্তির পরিচায়ক নয়।

নিজের জগতে নিমগ্নচিত্ত কবির মৌলিক প্রতিভার-বাহন যে আঙ্গিক বা ভাষা হয়েছিল, ইংরেজি কবিতার স্বাদবঞ্চিত বাঙালীর কাছে হয়তো বা কখনও অর্থহীন প্রতিপন্ন হতেও পারে। যথা, 'ঘ্রাণ' কথাটি কবি প্রায় সর্বদা ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করেছেন; শব্দগঠনও বহুলপরিমাণে পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত; বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র অন্যত্র।

অতিরিক্ত সমাজ-সচেতন সমালোচক জীবনানন্দের লিরিক শ্রেণীর কবিতায় বর্তমান জগৎ থেকে পলায়নী প্রবৃত্তি দেখতেন ও আধুনিক সমাজের কোনো প্রতিফলন না দেখে অতৃপ্ত থাকতেন। ইদানীং রচিত কবিতায় জীবনানন্দের মধ্যে কবিচিত্তের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের যোগসাধনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্যই তাঁর কাব্য অন্য জগতের সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্ব সপ্তাহে রেডিওতে পঠিত 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটির প্রশ্ন শেষ করে যেতে পারলেন না কবি।

মানুষ হিসাবে জীবনানন্দকে দেখা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ছিল। তাই কাব্যের পঙ্‌ক্তি স্বতঃই মনে এসেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আমার প্রিয় পুস্তক, তাই বেশী উদ্ধৃতি ও-বই থেকেই। বিগত পূজা সংখ্যায় (১৩৬১) যে কবিতাগুলি ছিল, তারা পরীক্ষামূলক প্রধানত:

'তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূলসীমা আলোর মতো ;—হয়তো সত্য আলো।'

['অবিনশ্বর', শারদীয়া পূর্বাশা]

সুতরাং সঠিক মতামত সহজসাধ্য নয়।

যে আবেগ পূর্বতন কাব্যের প্রাণ ছিল, ইদানীং রচিত কাব্যে সেই আবেগ আস্তে আস্তে সরে গিয়ে প্রত্যক্ষ ও বর্তমান জগৎকে স্থান দিচ্ছিল। প্রেম কখনও প্রতিপাদ্য হ'লেও করুণ-গম্ভীর আত্মসমর্পণ নয়। জগৎকে বাইরে রেখে মনে দ্বার দেওয়া সম্ভব নয়।

অথচ জীবনানন্দের নির্জনতাপ্রিয়তার মধ্যে লক্ষণীয় ছিল এই যে, শহরের প্রাণকেন্দ্রে তিনি থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর গ্রামীণ কবিতা সত্ত্বেও এই দিক থেকে মানসিকপ্রবণতা নাগরিক ছিল। যেখানে সভ্যতা বা সংস্কৃতি নেই, সেখানে শুধু প্রকৃতি অথবা নির্জনতা নিয়ে তিনি থাকতে পারেন নি।

অনেক লোকের মধ্যে নিঃসঙ্গতা তাঁর ধর্ম ছিল। আমার বাড়িতেও জনসমাগমহেতু তিনি আসতেন কম।

সেদিন শবযাত্রার দিন দেখলাম অসংখ্য সাদা ফুলে-ছাওয়া তাঁর শরীর,—আমার হাত শূন্য। দুটি দিন মনে পড়ল। স্মরণীয় তারা। ওঁর বাড়ি থেকে সন্ধ্যাবেলায় জীবনানন্দ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিলেন। পথে ফুলের দোকান। সাদা বেলফুলের মালা কিনলাম। কবি বললেন, "হ্যাঁ, আমারও এই মত। টেবিলে জল দিয়ে সাজিয়ে রাখলে অনুপ্রেরণার মতো একটা কিছু—" হাসতে হাসতে তিনি উপহৃত মালা পকেটে তুলে রাখলেন সযত্নে।

আরও একদিন কবির সঙ্গে ফিরবার পথে একঝাড় রজনীগন্ধা কিনলাম। বাড়িতে কলসীতে সাজালাম কবির সম্মুখে। আমার কতকগুলি অপ্রকাশিত ও সদ্য রচিত কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করবার কথা চলছিল—অন্য ধরনের কবিতা—বন্য প্রেমের। তিনি আগ্রহ সহকারে সবগুলিই শুনলেন ও বার বার অনুরোধ করলেন সেগুলি প্রকাশিত করতে। ফুলের গন্ধ যে পরিবেশ রচনা করে, সেদিনও কবি আলোচনা করলেন নিজের পুষ্পপ্রীতি প্রদর্শন পূর্বক। জীবনানন্দ যে কত বড় ও কত আন্তরিক কবি সেদিন অনুভব করেছিলাম আমার কবিতার প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপরে দেখে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্মরণ করছি, আমার কাব্যপুস্তক 'জুপিটার' তিনি সমালোচনার্থে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর হাতে দিয়ে এসেছিলেন ও বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'তে পারে দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিলেন। 'পূর্বাশা'য় আমার 'সপ্তসাগর' বইখানির সমালোচনা করবেন নিজে এই ইচ্ছায় তিনি নিজে থেকে বইখানি নিয়ে গিয়েছিলেন। সময়াভাবে হয়ে ওঠে নি। উনি বাসস্থানের গোলমালে বিব্রত ছিলেন। তবু অপার কৃতজ্ঞতায় তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণ করছি।

সেনেট হলের কবি-সম্মেলন থেকে আমরা একসঙ্গে ফিরছিলাম। পথে অনেকক্ষণ উদাস নীরবতায় আকাশ লক্ষ্য করে অবশেষে কবি সহসা বলে উঠলেন, 'আপনার সেই কবিতাগুলো? ছাপা হ'লে আমাকে কিন্তু এক কপি দেবেন।'

বুঝতে পারলাম, তাঁর মনে সর্বদা কবিতার সুর বাজে। আমার যতটুকু মূল্য তাঁর কাছে, সেটুকু আমি কবিতা লিখি বলেই, সাহিত্যিক বলেই। অনেক লোকের কোলাহল-মুখরিত নগরে ইনি তো নিজের নিঃসঙ্গ কাব্যজগৎ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে পারেন! এই যে চারপাশে ট্রাম-বাস, লোকজন, কিছুই ওঁর চোখে পড়ছে না, মনেও প্রবেশ করছে না। অথচ, উনি তো কলকাতায়

থাকতেই ভালবাসেন। কবিধর্ম কিন্তু নির্জন পল্লীর স্বপ্নে মগ্ন! তবে? বুঝতে পারলাম, কবি নাগরিক জনতার মধ্যে থাকতে ভালবাসেন কারণ জনতা সময় বিষয়ে চমৎকার আড়াল রচনা করতে পারে। জনতার অন্তরালে নিজেকে আবৃত্ত করে লুকিয়ে থাকা চলে, মফঃস্বল শহরে ব্যক্তির সে আড়াল থাকে না, তিনি প্রকট হয়ে পড়েন।

সেই পুষ্প সমাকুল দিন দুইটি এইখানেই শেষ হয়ে গেল এই শবযাত্রার বেল-রজনীগন্ধার স্তূপে! সেখানে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হয় নি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হ'ল, জীবনানন্দ একদিন কি সতৃষ্ণভাবে বলেছিলেন, "আপনার বাড়িটায় যদি থাকতে পারতাম তবে কি ভালভাবেই না লিখতে পারতাম! লিখবার অবকাশ বা নির্জনতা পাই না। উপন্যাস লিখব ভাবছি। কত কি লিখবার আছে। আপনার ঘরটি যদি পেতাম!"

সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলাম, মনে বিস্তৃততর হয়ে ফিরে এল: যে সাহিত্যিক নিজের অক্ষমতা পারিপার্শ্বিক নির্ভর মনে করতে পারে না, তার যন্ত্রণা যেন আপনার কখনও অনুভব করতে না হয়। প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যদি প্রেরণাবিহীন প্রতিভার অবসাদ বহন করতে হয়, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জীবনানন্দ অবসাদের পূর্বেই বিদায় নিতে পেরেছেন।

কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন-দর্শন

বিমলচন্দ্র ঘোষ

এক

"আমি সেই পুরোহিত, — সেই পুরোহিত।
যে-নক্ষত্র ম'রে যায়, তাহার বুকে শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে—
সেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে—

*　　*　　*

"আমি চ'লে যাবো—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে ;
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে !"

(নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

অগাধ জীবন পিছনে ফেলে রেখে কবি জীবনানন্দ চলে গেলেন। যে মৃত নক্ষত্রের হিমশীতল স্পর্শ কবিসত্তাকে নিঃশেষ করে দিয়ে গেল, সেই মরা নক্ষত্রের কঙ্কাল কি বাংলা কাব্যের স্বপ্নাকাশ থেকে উল্কার মতো আজো কক্ষচ্যুত হবে না ? যার উদ্দেশ্যে জীবনানন্দের 'সকল গান'—সকল সুর—কাব্যশরীরের সকল স্পন্দন স্পন্দিত হল, সেই হৃদয়হীনা মৃগতৃষ্ণিকার বুকে কবির স্মৃতি কি বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেছে ? এই মানস-দৈন্যের সর্বনাশা চিতা কোনো কোনো বাঙালী কবির চিত্ত-শ্মশানবক্ষে কতদিনে নির্বাপিত হবে কে জানে !

আজ থেকে আঠারো উনিশ বছর আগে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রথম সংস্করণ (১৯৩৬) প্রকাশিত হয় ; জীবনানন্দের বয়স তখন ছত্রিশ সাঁইত্রিশ, তারও কত বছর আগে তিনি 'নির্জন স্বাক্ষর' লিখেছিলেন তার সন তারিখ আমার জানা নেই। জীবনানন্দের নামের সঙ্গে তাঁর জীবন-দর্শনের কি নিদারুণ বৈপরীত্য ! কি করুণ অসঙ্গতি ! মানব-জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হল শান্তি ও আনন্দ-লাভ ! প্রাচীন ভারতও একথার সাক্ষ্য দেয় :

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।

আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি

তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম॥"

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কবি জীবনানন্দের জীবনচেতনায় শান্তিও ছিল না, আনন্দও ছিল না। সর্বদা তিনি মরা নক্ষত্রের বরফঢাকা শীতলতার মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালবাসতেন। একথা সত্য যে, বর্তমান ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনেও শান্তি নেই। "কোনো মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া"—তবু কেউ মরতে চায় না, মরা নক্ষত্রের হিমস্পর্শ আবরণে নিজেদের কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ ঢেকে রাখতে চায় না। মানুষের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম—সব কিছুরই প্রকাশ মুক্তির জন্য, আনন্দের জন্য। মানুষের সামনে যদি ভবিষ্যতের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, না থাকে তবে মানুষ কিসের আশায় বাঁচবে? মানসীকে উদ্দেশ করে কবি বলছেন:

"উৎসবের কথা আমি কহিনাকো পড়িনাকো দুর্দশার গান

যে কবির প্রাণ

উৎসাহে উঠেছে শুধু ভ'রে,

সেই কবি – সে-ও যাবে স'রে;

যে কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ শুধু জেনেছে বিষাদ

মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ,

যে বুঝেছে – প্রলাপের ঘোরে

যে বকেছে—সে-ও যাবে স'রে

একে একে সবি ডুবে যাবে;—"

[—কয়েকটি লাইন: ধূসর পাণ্ডুলিপি]

কী নির্মম স্বীকারোক্তি! নৈরাশ্য যেন কবির অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশে ছিল। কবিতাটির পঙ্‌ক্তি সাজানোর মধ্যেও পাশ্চাত্য ক্ষয়িষ্ণু কবিদের প্রভাব লক্ষণীয়। কবি জীবনানন্দ ঔপনিষদিক রহস্যময়তায় বলেছেন, "কোনো এক মানুষীর তরে, যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হয়ে তার বুকের উপরে!" কে সে? কি তার পরিচয়? যার 'বুকের উপরে' তান্ত্রিক শবসাধকের মতো কবি পুরোহিত হয়ে প্রেম জ্বালিয়েছিলেন?—কোন এক মানুষীর জন্য? সে কি এই পৃথিবীর মানুষ? না—সে বেদান্তের ব্রহ্ম? যাকে উদ্দেশ করে কবি আবার বলছেন:

"যে আকাশ জ্বলিতেছে, তার মতো মনের আবেগে

জেগে আছ—

জানিয়াছ তুমি এক নিশ্চয়তা—হয়েছ নিশ্চয়!

কবি সেই অনুদ্দিষ্ট "তুমি"কে শেষ পর্যন্ত জানিয়েছেন : "হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন,—পথের পাতার মতো তুমিও তখন, আমার বুকের পরে শুয়ে রবে ?" ইরানের আদিকবি বাবা তাহিরের কবিতায়ও ঠিক এই ধরনের জ্বালা, এই ধরনের বেদনার সাদৃশ্য পাওয়া যায় :

"I burn like yonder taper
My heart consumes in flame
I weep I melt in torment
Account this to thy shame
By night and day the same."—Baba Tahir.

প্রায় হাজার বছর আগের এই বেদনাবোধেরও একটা স্পষ্ট অর্থ আছে, হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথের বেদনাবোধ আরো স্বচ্ছ :

"জেলেছো কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার ?
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দির তলে ?
নাহি জানি তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশি দিন মান
যেন সচেতন বহ্নি সমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে ?" [অন্তর্যামী, চিত্রা]

মানুষের জীবনে বাসনার শেষ নাই, কামনার অন্ত নেই,—তাই যুগে যুগে এই নিদারুণ অতৃপ্তির জ্বালা বুকে নিয়ে অভিমানী কবিরা নানা ছন্দে, নানা ভাষায়, নানা ভাব-ব্যঞ্জনায় ঈশ্বরের কাছে নানা ভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন। জীবন-দেবতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আরো স্পষ্ট, আরো বলিষ্ঠ স্বীকৃতির ছন্দে :

"গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিত্য নব ॥" [—চিত্রা]

বাবা তাহির, জালালুদ্দীন রুমি, ভক্ত কবির, দাদু, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই আধ্যাত্মিক ও 'মিষ্টিক' কবিতা সৃষ্টির জন্য জগদ্বিখ্যাত—কিন্তু প্রত্যেকেই আশাবাদী। মানবজীবনের জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে পালিয়ে যাবার জন্য এই মহান জীবন-প্রেমিকরা কদাচ নিজেদের অমূল্য কবিসত্তাকে হিমশীতল মৃত্যুর আবরণে ঢেকে রেখে অব্যহতি পাবার পাগলামী প্রকাশ করেন নি।

দুঃখের বিষয় মানব-সভ্যতার এই গৌরবময় যন্ত্র-যুগে জন্মগ্রহণ করেও জীবনানন্দ ক্রমাগত মৃত্যু কামনা করে গেছেন তাঁর অগণিত বিষণ্ণমধুর কাব্যের মাধ্যমে। এ একপ্রকার অদ্ভুত মানসিক ব্যাধি। 'মরা নক্ষত্রে'র সঙ্গে যেন তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। অঘ্রান মাসের হৈমন্তী কুয়াশায় জীবনানন্দের কবিমনের আকাশ যেন সর্বদা শিশির ঝরাতো। কবি "শিশিরের সুর" শুনে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। পাঠক, লক্ষ্য করে দেখবেন তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে শিশিরের কী অজস্রতা! আর সেই শিশির ঢাকা রহস্যলোকে মৃত্যুর যদি কোনো রস থাকে তবে জীবনানন্দ পাগলের মতো সেই দুর্জ্ঞেয় রসাস্বাদনে তন্ময় হয়ে পড়তেন। সাক্ষাৎ মৃত্যু আর মৃত অতীতকে বার বার নানা সূত্রে স্মরণ করতে তিনি ভালবাসতেন। যেমন :

(১) "—মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে।"

—[কার্তিক মাঠের চাঁদ—ধূঃ পাঃ]

(২) "পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হয়েছে যা—তারপর হাতছাড়া হ'য়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে, আজো তুমি তার স্বাদ ল'য়ে
আর একবার তবু দাঁড়ায়েছ এসে!"

—[কার্তিক মাঠের চঁদ—ধূঃ পাঃ]

(৩) "যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে—মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন—
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে ল'য়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান—" [সহজ : ধূঃ পাঃ]

(৪) "চেয়ে দেখি, দুটো হাত, ক'খানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি;
চোখ দু'টো চুণ-চুণ, মুখ খড়ি-খড়ি!
থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি—
সব বাসি—সব বাসি—একেবারে মেকি!"

[পরস্পর—ধূঃ পাঃ]

(৫) "চোখে কালোশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,

যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চাল্‌কুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব।" [বোধ : ধূঃ পাঃ]

(৬) "বিয়োগের— বিয়োগের— মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি ?" [ক্যাম্পে : ধূঃ পাঃ]

(৭) "যেন কোন্‌ বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে...চেয়ে ছাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।"
[শকুন : ধূঃ পাঃ]

(৮) "আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায় ; যেন কোন্‌ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।"
[মৃত্যুর আগে : ধূঃ পাঃ]

(৯) "উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়।
পৃথিবীর পুরোনো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়!
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়!"

৯. সংখ্যক অংশটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' শেষ কবিতা স্বপ্নের হাতে-র শেষাংশ। —এইখানেই কবির দার্শনিক চিন্তার শেষ সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপিতে' অনেকগুলি বিস্ময়কর কবিতা আছে, যেগুলি বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের নিজস্ব দান কিন্তু সমগ্রতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, কবি যেন এক সীমাহীন রহস্যময়তার ও অস্পষ্টতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত মহাবিস্মরণীর মধ্যে পরমাগতি লাভ করতে চেয়েছেন। এই মৃত্যুধর্মী ধূসর আত্মকেন্দ্রিকতার হাত থেকে কবি জীবনানন্দ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তি পান নি।

পরবর্তীকালের রচিত একটি কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ যেন মনে হয় বাস্তব জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে হঠাৎ ক্ষণকাল সচেতন হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই অসতর্ক সচেতনতার মধ্যে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন :

"কে যেন উঠিল হেঁচে,—হামিদের মরকুটে কান। ঘোড়া বুঝি
সারাদিন গাড়ী টানা হ'ল ঢের—ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায়
নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস :
যেন কোন ব্যথা নাই পৃথিবীতে— আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি ?
'কেন মৃত্যু খোঁজ তুমি ?' চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ !"

এই সময় থেকেই কবি জীবনানন্দ ছন্দোবিন্যাস, ভাববিন্যাস, শব্দ চয়ন, প্রতীক ও ব্যঞ্জনা ইত্যাদির দিক দিয়ে ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়েছিলেন, এর একমাত্র কারণ মানবসমাজের ওপর কবির নিদারুণ বীতরাগ ও হৃতশ্রদ্ধা। লাসকাটা ঘরের অর্থাৎ মর্গের 'রক্ত ফেনা মাখা মস্তকের ইঁদুর', 'গলিত স্থবির ব্যাং', 'থুর থুরে অন্ধ পেঁচা', 'অন্ধকার সজ্জারামের মশা', 'রক্ত ক্লেদ বসার ওপর উড়ন্ত 'মাছি', "কবি নয় অজর অক্ষর অধ্যাপক, দাঁত নেই চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি," "মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি," থ্যাদা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁট,"—ইত্যাদির বীভৎস তাড়নায় কবির মন পীড়িত ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। সুস্থমানসিকতার অভাবে এতবড় একজন কবি নিজেকে নিজেই সর্বস্বান্ত করেছিলেন। আর তাঁর সর্বনাশ করেছিল একদল পণ্ডিতম্মন্য ভক্তের অত্যুৎকট প্রশংসা. আধুনিক বাংলাকাব্যে যাঁরা আঙ্গিক সর্বস্বতা, অভিনবত্ববিলাস, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুর্বোধ্যতা আর অবচেতনিক উন্মত্ততার পরিচয় পেলে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে হৈহৈ করে বেড়ান।

মনে হয় মৃত্যুর কয়েক মাস আগে জীবনানন্দের কাব্য-চেতনা বৌদ্ধ মহাপরিনির্বাণ ও বৈদান্তিক 'জ্ঞাতুমিচ্ছা'র দার্শনিক প্রেরণায় মৃত্যুর মধ্যেও সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন গতানুগতিক দুর্বোধ্যতার অসুস্থ হৃদয়াবেগে :

"শূন্য তবু অন্তহীন শূন্যময়তার রূপ বুঝি ;
ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস ;—
যদি না মানব এসে তিনফুট জাগতিক কাহিনীতে নীলাভ আকাশ
বিছিয়ে অসীম ক'রে রেখে দিয়ে যায় :
অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।"

[মহাজিজ্ঞাসা : শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬১]

আবার এই একই বৎসরে একই সময়ে অপর একটি শারদীয় সংখ্যায় কবি তাঁর অপ্রেম আর প্রেমকেও ধ্বংসের পটভূমি দিয়ে আচ্ছাদিত করে তার মধ্যে অনাচ্ছাদিত প্রেমিককে ডাক দিয়েছেন :

"সময় অনেক চিহ্ন লক্ষ্য ভেঙে ফেলে ; ছুটেছে দুরন্ত অশ্বক্ষুর ;
একে একে সকলকে নষ্ট করে দেবে, সময়ের হাতে সবই বিচ্ছিন্ন ভঙ্গুর
হয়ে যায় জেনেছি অনেক দিন আমি। তবুও সময় তার সকল ধ্বংসের পটভূমি
দিয়ে আচ্ছাদিত ক'রে অপ্রেম প্রেমকে তবুও দেখেছো
অনাচ্ছাদিত হে প্রেমিক তুমি।"

[প্রেমিক : শারদীয় বন্দেমাতরম ১৩৬১]

এরপর আর কোনো সন্দেহই থাকে না যে কবি মৃত্যুকেই মনেপ্রাণে একমাত্র সত্য বলে জেনেছিলেন বলে, শেষ পর্যন্ত সনাতন ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পাননি ; প্রথম যৌবনের দিশাহারা নক্ষত্র-বিলাসী জ্যোতির্বিদ প্রৌঢ় বয়সে ব্রহ্মবিদ হতে চেয়েছিলেন।

দুই

১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর, শুক্রবার রাত্রি ১১।০ টার পর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে জীবনানন্দের জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়েছে। এ মৃত্যু যেমনি শোচনীয় তেমনি মর্মান্তিক। কবির এই অকাল মৃত্যুতে বাংলায় কবি-সমাজ বিচলিত হয়েছে। অল্প কয়েকদিন আগে দেশপ্রিয় পার্কের সংলগ্ন রাসবিহারী এভেনিউতে চলন্ত ট্রামের ধাক্কায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন। শেষ পর্যন্ত এই আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়! মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি তাঁর শোকসন্তপ্ত পত্নী, পুত্র কন্যা ও গুণগ্রাহী বন্ধুদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন। কবির এই অপঘাতমৃত্যুতে আমরা আত্মীয় বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করছি।

আধুনিক বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে যে কয়জন কবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, জীবনানন্দ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। শুধু অন্যতম বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। আঙ্গিক ও জীবন-দর্শনের জটিলতার জন্য জীবনানন্দের কাব্যধারা ছিল সুস্থতম আধুনিক জীবনবিজ্ঞানের বিরোধী। তথাপি তাঁর কিছু কিছু কবিতা কাব্যরসপিপাসু মনকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তির অতীতস্তরে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক রহস্যময়তার মায়াজাল সৃষ্টিতে জীবনানন্দের অধিকাংশ রচনাই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। এই মারাত্মক দুর্বোধ্যতার প্রভাব সমসাময়িক বহু তরুণ কবির মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপের থেকে

আমদানি এই দুর্বোধ্যতা ও প্রজ্ঞাসর্বস্বতার প্রভাব বাংলাদেশে জীবনানন্দের মতো বহু শক্তিশালী কবিই অতিক্রম করতে পারেন নি।

এই নির্জনতা প্রিয়, নির্বিরোধী ও স্বল্পবাক কবি বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখেও তাঁর কাব্যের মূল সুরটিকে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করে তুলতে পারেন নি। অথচ কী অসামান্য শক্তি নিয়েই না তিনি জন্মেছিলেন! সংবেদনশীল মনের রঙ দিয়ে সুগভীর সহানুভূতির সঙ্গে যেখানেই তিনি পল্লী-প্রকৃতি ও কৃষক-জীবনের বেদনা মিশ্রিত কৃষিভূমির ছবি আঁকতে গেছেন, সেখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। দুঃখের বিষয় সেই একই কবিতার গতি ও পরিণতির মধ্যে যেখানেই তিনি তাঁর অসুস্থ মানসিকতার অনর্গল উচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের কাছে চির দুর্বোধ্য জীবন দর্শনের অবতারণা করতে চেয়েছেন, সেখানেই তিনি আমাদের আতঙ্কিত করেছেন। এই অদ্ভুত মানসদ্বন্দ্ব তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই প্রতিফলিত। জীবনানন্দের জীবন-দর্শন একাকীত্বের তমসাচ্ছন্ন নৈরাশ্যে অন্তর্মুখীন। যে অন্তরের দ্বার, জানালা, গবাক্ষ, বাতায়ন মনুষ্যময়ী পৃথিবীকে এড়িয়ে চলার অত্যদ্ভুত অহংকারে অবরুদ্ধ।

যে তরঙ্গায়িত ও দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দোবিন্যাসের মন্থরতায় জীবনানন্দ কাব্য রচনা করতেন, একমাত্র সেই ছন্দ ছাড়া অন্য কোনো ছন্দে জীবনানন্দের বিষণ্ণ গম্ভীর চিন্তাধারাকে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। বক্তব্য ও আঙ্গিকের এমন ওতপ্রোত মিল আধুনিক আর কোনো কবির মধ্যে দেখি নি। জীবনানন্দকে অনুকরণ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। কারণ জীবনানন্দের যে মন ও বুদ্ধি কাব্য রচনা করতো, সে মন ও বুদ্ধি আধুনিক জীবন-সংগ্রামের পরিবেশে জন্মাতে পারে না; অতীতের কাব্যজগতেও জন্মানো সম্ভব ছিল না। এ মন ও বুদ্ধি প্রথম ইউরোপীয় উত্তরসামরিক সংস্কৃতিবিকারের ভয়াবহ উন্মত্ততার মধ্যে জন্মেছিল।

জীবনানন্দের কবি-প্রতিভা মাঝে মাঝে অসামান্য অনুভূতির মশারি টাঙিয়ে স্বপ্নাসীন ব্যক্তিসত্তার অদ্বিতীয় ভাবপ্রবণতাকে "মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো, কখনো বিছানা ছিঁড়ে নক্ষত্রের দিকে"—উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এই রোমাঞ্চকর কাব্যানুভূতি বাংলাকাব্যের ইতিহাসে বিরল। কবি বলছেন :

"জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জলজল করছিল বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো।

যে-নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে ম'রে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে ;
যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে
কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?
আড়ষ্ট—অভিভূত হ'য়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন ;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল ;
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে সাঁই-সাঁই ক'রে,
সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।"

[হাওয়ার রাত]

হায় জীবনানন্দ, তুমি যে কী অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলে সে কথা হয়তো তুমি নিজেও জানতে না, আর কোনোদিন তোমার কোনো শুভানুধ্যায়ী তোমাকে মনে করিয়েও দেন নি। তাই তোমার কলম থেকে "হাওয়ার রাত" আর "বনলতা সেনের" মতো কবিতা আর বেরুলো না! তুমি চলে গেলে এক মুহূর্তের রিক্ততার বোঝা বুকে নিয়ে মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারে।

এই অদ্ভুত আত্মবিলাসী খেয়ালী কবির খেয়ালের অন্ত ছিল না। রোমাঞ্চকর কল্পলোকের মায়ারাজ্যে হয়তো একটা বিড়াল বা একটা চিলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সময়াতিপাত করলেন। যে বিড়াল কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়ে সূর্যের পিছনে পিছনে চলে :

"সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলি আমার দেখা হয় :"

*   *   *

"হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের-সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;"   [বিড়াল]

জীবনানন্দের 'চিল,' "বেতের ফলের ম্লান চোখে," "পৃথিবীর রাঙা রাজ-কন্যাদের মতো," "ভিজে মেঘের দুপুরে ধানসিঁড়ি নদীর তীরে তীরে কাঁদে।"

এই জাতীয় অসুস্থ-সুন্দর চিত্তবৈকল্যের পাশাপাশি "বনলতা সেনের"-মতো পরমাশ্চর্য লিরিকও রচনা করেছেন। এই একটি মাত্র কবিতার জন্য কবির নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

"হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।"

'বনলতা' কবির রোমান্টিক স্বপ্নচারিণী মানসসুন্দরী নয়,—সে আমাদেরই মতো রক্তমাংসের মানবী। কেমন তাকে দেখতে? কেমন তার মাথার কেশ? কোন অবস্থায় কবি তার দেখা পেলেন?

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'"

তারপর পরমতৃপ্ত রোমাঞ্চিত কবি তাঁর কাব্যসঙ্গিনীকে কাছে পেয়ে, সব দুঃখ, সব জ্বালা, সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলেন স্বপ্নময় অন্ধকারের রূপকথার মায়া রাজ্যে :

"পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

কবির এই রোমান্টিক ইচ্ছাপূরণের অভিসার পথে পাঠকের মনও উধাও হয়ে ছুটে চলে হাজার হাজার বছরের পৃথিবীর ঐতিহাসিক পথ দিয়ে ;—যে পথে কবি তাঁর বহু বিচিত্র রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য-স্বপ্নের অন্ধকারে দেখা পান তাঁর মানসীর। যে মানসী বৌদ্ধযুগভাস্কর্যের কারুশিল্পে অপরূপা, যে মানসী বিদিশার রাত্রি দিয়ে গড়া। সমস্ত ইতিহাস পরিক্রমার শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত কবিকে যে মানসী দু'দণ্ড শান্তিদান করে—যার নাম 'নাটোরের বনলতা সেন'।

তিন

বরিশালের 'সর্বানন্দ ভবনে' অবস্থানকালে কবি জীবনানন্দ সাধারণ মানুষের চেয়ে পরিত্যক্ত প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ, ঘনপল্লবিত বৃক্ষলতা ও নৈশনীল আকাশের অগণিত নির্বাক নিঃশব্দ নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসতেন। শুধু বরিশালে নয়, কলকাতায় এলেও সেই একই অবস্থা। গত কয়েক বৎসর থেকে তিনি কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন। দেখা হ'লে যখন জিজ্ঞাসা করতাম, "মানুষের সঙ্গে মেশেন না কেন?' তা'র একটি মাত্র উত্তর শোনা যেত, "ভালো লাগে না!' মানুষের সঙ্গ তাঁর অসহ্য লাগতো। সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে অন্যেরা যদি হাজার কথা বলতেন, জীবনানন্দের মুখ থেকে বেরুতো দু'একটি নিস্পৃহ মন্তব্য। নিজের মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল এই নিঃসঙ্গতাপ্রিয় কবির স্বধর্ম। তাই রবীন্দ্রনাথের পর অদ্বিতীয় কাব্য-প্রতিভার অধিকারী হয়েও জীবনানন্দ একাকীত্বের নির্মম অহঙ্কারে এই প্রাণবন্ত প্রগতিশীল যুগবিভূতির গৌরব টিকা ললাটে ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন নি।

একদিন দেশপ্রিয় পার্কের ধারে সন্ধ্যার সময় কবির সঙ্গে কথা বলছি। এমন সময় পার্কের ভেতরে একটি শিশু আর্তস্বরে চীৎকার শুরু করে দিল। শিশুটি দাসীর কোল থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল, খুবই আঘাত পেয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ক্রন্দন শুনে জীবনানন্দ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন, "অসহ্য, শহরে দু'দণ্ডও শান্তি নেই!" শুনে বলেছিলাম, "কিন্তু গ্রামেও শিশু আছে, আর পড়ে গেলে এমনিভাবেই কাঁদে!" সে কথায় তিনি কোনো উত্তর দিলেন না।

আজ সুদীর্ঘকাল পরে আকস্মিক অপঘাতে মৃত কবির জীবন ও কাব্যধারা সম্বন্ধে যত ভাবছি ততই দেশপ্রিয় পার্কের ধারের সেদিনের সেই ঘটনাটির কথা মনে পড়ছে। 'কবিতাই কবি মানসের দর্পণ'—একথা যদি সত্য হয় তবে জীবনানন্দের কবিতা তাঁর মানববিদ্বেষী চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি বলে মেনে নিতেই হবে।

উর্ণনাভ যেমন আত্মলালার সূক্ষ্ম তন্তুজাল বিস্তার করে তার মধ্যে বসে থাকতে ভালবাসে, জীবনানন্দও তেমনি যেন তাঁর তৃতীয় নেত্র ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এক অমানবীয় মনোময় রহস্যলোক সৃষ্টি করে তার মধ্যে বসে থাকতে ভালবাসতেন। বহিরঙ্গ প্রকৃতির পঞ্চাতান্মাত্রিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর এক অস্বাভাবিক অন্তরঙ্গতায় তিনি আপন কাব্যসৃষ্টির মধ্যে মশগুল হয়ে যেতেন। এই অদ্ভুত প্রকৃতির কবি সারা জীবন ধরে সেইসব গ্রন্থ সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে

পড়াশোনা করতেন, যেগুলির মধ্যে মানুষের সমাজ, দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতির অত্যাধুনিক সমস্যাবলীর নামগন্ধও থাকতো না। সামাজিক চেতনা ও জাগতিক অভিজ্ঞতার অভাবে যে মহৎ কাব্য সৃষ্টি করা যায় না, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। মার্কসবাদী কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গ তাই তিনি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলতেন। এই আত্মঘাতী মানসিক অবস্থা ও রোমান্টিক ভাবাদর্শের ফলে জীবনানন্দের কাব্যধারা ক্রমাগত বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হয়ে উঠেছিল।

'কোন এক মানুষ' আর 'কোন এক মানুষী'র—খোঁজে আর তাঁর হৈমন্তী কুয়াশাচ্ছন্ন মনের হারিয়ে যাওয়া ঠিকানার অনুসন্ধানে তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, সর্বপ্রকার অনুভূতি খরচ করে ভূতাবিষ্টের মতো শূন্য পরিক্রমা করেছেন। যে মানুষ ও মানুষীকে চেনা রঙ দিয়ে আঁকা যায় না, জানা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, পরিচিত ছন্দ দিয়ে কাব্যরূপে সৃষ্টি করা যায় না। সমস্ত বর্তমান কবির কাছে "ব্যথিত অতীত"। মরা নক্ষত্রের বুকের শীত কবির নিরবয়ব আত্মার গায়ে শিহরণ জাগায়। অঘ্রানের পিঙ্গলা রাত্রে শান্তিহীন শিশিরের জলে কবি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' রচনা করেন। এইখানেই জীবনানন্দ কাব্যের ট্র্যাজেডি। 'মেঠো চাঁদ' আর 'মেঠো তারার আলোয়' 'শিশিরের সুর' শুনতে শুনতে একমাত্র সেই পাখি কবির কাব্যে প্রেরণা জাগায়—যার নাম পেঁচা! কবি-মনের পোড়ো জমিতে জীবনের স্পন্দন নেই,—আছে শুধু 'শুকনো ডাঁটা', 'চড়ুয়ের ভাঙা বাসা', 'ঠাণ্ডা কড়কড়ে পাখির ডিমের খোলা', 'মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুকনো মাকড়সা',—আর ছুটোছুটি করে "ইঁদুর পেঁচারা"! কী ভীতি-প্রদ কল্পনা! কী মর্মান্তিক কাব্যানুভূতি! পাঠকের রসপিপাসু মনকে বিষণ্ণ করে তোলা ছাড়া জীবনানন্দের সমগ্র জীবন-দর্শনের আর কোনো দায়িত্ব নেই।

এই নৈরাজ্যধর্মী নির্বেদ, এই অর্থহীন নিসর্গ পরিক্রমার ভাবগম্ভীর অবসাদ, এই প্রাকৃতিক গূঢ়ৈষণার সর্বনাশা আত্মপ্রবঞ্চনা পৃথিবীর বহু শক্তিশালী কবিকেই বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে। মাঝে মাঝে বাউল আর রামপ্রসাদী ঢঙে শ্মশানের সাম্যবাদ কবির মনকে সমদর্শী করে তোলার চেষ্টা করেছে,—

"আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়—
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নীচে পৃথিবীর তলে।"

কিন্তু এ কল্পনা এই পর্যন্ত, তারপর কবি-মনকে এক পদও অগ্রসর হতে দেয় নি, তাই শুনি এ কাব্যের শেষ অভিলাষ,—

"এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে
ঘুমাবার সাধ ভালবেসে!"

জীবিত অবস্থায় মৃত্যুকে তিনি অর্ধচেতন কবির চোখ দিয়ে দেখতেই ভালবাসতেন কারণ মানুষ তাঁর কাছে অসহ্য ছিল, সমাজ তাঁর কাছে দুর্বিষহ ছিল। সংসারী মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন জানতে পারি নি। বিস্ময়কর কবিপ্রতিভার অধীশ্বর হয়ে তিনি জন্মেছিলেন রবীন্দ্রযুগের তৃতীয় পর্বে। আধুনিক বাংলাকাব্যের ইতিহাসে তিনি ছিলেন স্বয়ম্ভূ। এই সচ্চরিত্র, সাধু ও নির্বিবাদী কবির অপমৃত্যু আমাদের মনে দুঃসহ বেদনার সৃষ্টি করেছে। এক একবার মনে হয় সারাজীবন কেবল মৃত্যুকে ভালবেসেছিলেন বলেই কি মৃত্যু তাঁকে অসময়ে ডেকে নিল? কবির স্মৃতি আজ কবির ভাষাতেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে:

"চোখের তারার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির—
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর।"

জীবনানন্দর কোলকাতা

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রাম লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে যখন দেখি, একটা ট্রাম পাশ দিয়ে চলে গেল আর তার চাকার ঘর্ষণে আগুনের ফুলকিগুলো ছড়িয়ে পড়ল, তখন ঐ ফুলকিগুলোর গভীরে নৈঃশব্দ্যের জগত যেখানে রয়েছে, সেখানে কেন জানিনা, জীবনানন্দ-র স্পষ্ট মুখ দেখতে পাই।

হ্যাঁ, এই কোলকাতার ধুলোমাটি অঙ্গে মেখেই তিনি রূপসী বাংলার অনেক নীরব নিসর্গ ছবি সত্তার গভীরে দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু যে কোলকাতার সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল ঘর করে গেছেন, তার দিকে কি তিনি একবারও ভালবাসার দৃষ্টিতে ফিরে তাকান নি? কোলকাতাকে তিনি ভালবেসেছিলেন তবে সে ভালবাসার সংজ্ঞা নিতান্তই স্বতন্ত্র। বাংলার মুখ দেখেই তিনি অবশ্য পৃথিবীর মুখ দেখার তৃপ্তি পেয়েছিলেন আর সেজন্যে বাংলা-ই তাঁর যথার্থ নায়িকা, তবুও কাদম্বরীর পত্রলেখার মতো, কোলকাতা ও তার নগর জীবনের রূপ তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে।

জীবনানন্দ যেহেতু আবিষ্টতার কবি সেহেতু কোলকাতার মুখের মেলা, জনতার কোলাহল, এক কথায় দিবালোকের কোলকাতা তাঁকে তেমনভাবে নাড়া দিতে পারে নি। জনতার কোলাহলে একা বসে ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হয় যেন 'কোন দূর জাদুপুর—রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী।' কিন্তু 'ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ, / লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার, এই ধূলি—ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার'—কবির আবিষ্ট চেতনায়, 'ডুবে যায় নীলিমায়—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে।' এইখানেই কোলকাতাকে তিনি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেছেন। তিনি যদিও বলেছেন, 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে' আর কথাটা বলেছেন প্রবক্তারই মতো তবুও যে কোলকাতাকে তিনি অনুভবের আলোয় দেখেছেন তার রূপ স্বতন্ত্র। তা হল রাত্রির নির্জন কোলকাতা, কিংবা বাহির কোলকাতার গভীরে যে দ্বিতীয় কোলকাতা নীরবতায় আবিষ্ট হয়ে আছে সেই কোলকাতা। আমাদের কোলকাতা তাঁর মতো বিকেলের নক্ষত্রের কাছে দূরতর দ্বীপ। এই দিবালোকের নগরী আত্মমগ্ন কবিকে তেমন করে আবিষ্ট করতে পারে না। কেননা, 'ভোরের

স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হয়ে আসে।' যখন নগরীর বুকে দুপুররাত দল বেঁধে নামে, হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ; যখন, একটি মোটরকার গাড়লের মতো কেশে যায় অস্থির পেট্রোল ঝেড়ে, কিংবা, তিনটি রিকৃশ মায়াবীর মতো জাদুবলে ছুটে মিশে যায় শেষ গ্যাসল্যাম্পে, তখনই কোলকাতার রূপ তাঁকে আবিষ্ট করে। তিনি তখন ফিয়ার্‌স্‌ লেন ছেড়ে দিয়ে হঠকারিতায়, মাইল-মাইল পথ হেঁটে এসে দাঁড়ান বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে—টেরিটি বাজারে। নগরীর বাতাস তখন চীনাবাদামের মতো বিশুষ্ক। মৃত ও জাগ্রত কোলকাতা তখন এক হয়ে গেছে ; কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ, ডাইনামোর গুঞ্জন তখন সব একাকার। নগরীর এই মহৎ রাত্রির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তিনি লিবিয়ার জঙ্গলের ভেতর দিয়েই হাঁটতে থাকেন। লোল নিগ্রোটা তখন বড়ো একটা গরিলা বলে মনে হয়। কোলকাতার প্রতিটি সভ্য প্রাণী যে লজ্জাবশতই কাপড় পরে এ কথা তখন তাঁর আর বুঝতে অসুবিধে হয় না। এই রাত্রির অন্তর কোলকাতাই তাঁকে আবিষ্ট করেছে, তারই নগ্ন নির্জন হাতে তিনি হাত রেখেছেন। এই স্বতন্ত্র কোলকাতার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন লাসকাটা ঘরটি।

এমন কি, দিবালোকের স্বচ্ছ কোলকাতার মধ্যেও তিনি কখনো কখনো এই মগ্ন ছায়াচ্ছন্ন কোলকাতাকে খুঁজে পান। তখন নগরের ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর তিনি শুনতে পান, তিনি দেখতে পান, আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায় / অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্য সাগর। এই কোলকাতায় অধিবাসীদের কোনো সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই, তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই ; শরীর বিবশ হলে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের কংগ্রেসের মত কোনো আশাহতাশার কোলাহলও নেই। এখানের শ্রমিকরাও তাই সঠিক শ্রমিক নয়। এই কোলকাতায় এক ভিখিরিনী, তিনজন খোঁড়া, খুড়ো সকলেই একই চায়ের মগে চুমুক দিয়ে কুটুম হয়ে যায় আত্মীয়তার বন্ধনে। আমাদের চেনা কোলকাতা তাই তাঁর কাছে অচেনা। এখানে শত-শত শূকরের চিৎকার, শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বরে কবির আবিষ্টতা তাই ভেঙে যায়। সেজন্যেই প্রকাশ্য দিবালোকের কোলকাতায় যে ভিখিরীকে তিনি দেখতে পান, সে আহিরীটোলা, বাদুড়বাগান থেকে ভিক্ষা পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধ নীরব অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে দেয়, গ্যাসলাইটেই মুখ বাড়িয়ে দেয়।

যখন, 'শেষ ট্রাম মুছে, গেছে শেষ শব্দ, কোলকাতা এখন / জীবনের জগতের

প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ'—তখনই তাঁর নিজস্ব কোলকাতা, যে রাজ্যের তিনি প্রেমিক—স্বতন্ত্র স্বরাট, সেই কোলকাতা মূর্ত হয়ে ওঠে। তখন, 'চারিদিকে ঘর-বাড়ি পোড়ো-সাঁকো সমাধির ভিড়; / সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে / যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর / পুরানো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে। কোলকাতায় তখন, 'সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে। / কেউ ভুল করেনাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব / চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।' এই কোলকাতাকে দেখেই তিনি বলেন, 'আর কিছু দেখেছি কি: একরাশ তারা—আর—মনুমেণ্ট-ভরা কলকাতা?' আমরা যে কোলকাতাকে নিয়ে ব্যস্ত সেই শহর-বন্দর—বস্তি—কারখানাভরা কোলকাতাকে দেশালাইয়ে জ্বেলে দিয়ে তিনি তাই নেমে এসেছেন আবিষ্টতার প্রান্তরে, এসেছেন যেখানে সেখানে 'নাহিকো কাজ—উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা; / এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।'

কোলকাতার গভীরে যে কোলকাতা, যার মাথার উপরে স্কাইলাইট আর সেখানে আকাশে পাখিরা পরস্পর কথা বলে, সেই কোলকাতাকেই তিনি ভালবেসেছেন। তারই অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো তিনি মিশে থাকতে চেয়েছেন। শরীরে তারই মাটির গন্ধ মেখে, জলের গন্ধ মেখে তিনি মগ্ন হয়েছেন। কোলকাতার প্রতি তাঁর এই ভালবাসা সোচ্চার না হলেও, তা অশ্রুতও নয়।

বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাবার সময় কখনো কখনো যখন নিজেকে একা মনে হয় তখন সেই মন নিয়ে যে কোলকাতাকে আমি দেখি কিংবা ঘুম না এলে মাঝ রাতে রাস্তায় প্রেতের মতো হাঁটতে হাঁটতে যে কোলকাতাকে দেখতে পাই, সেই আশ্চর্য নীরব ম্লান কোলকাতাই জীবনানন্দর কোলকাতা। তাকেই তিনি গোপন প্রেমের রহস্যে কবিতায় ধরে রেখেছেন। আর সেজন্যেই বোধহয়, এই কোলকাতার মাটিতেই অন্ধকারে নিজেকে তিনি চিরকালের মতো মিশিয়ে দিয়ে গেছেন।

আমার স্বামী জীবনানন্দ দাশ

[লাবণ্য দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার]

কবিতা সিংহ

[আমার এই লেখার বিষয় কেবল কবি জীবনানন্দ দাশ নন। কবি-জায়া লাবণ্য দাশের ভূমিকাও এ লেখায় প্রধান। কবির দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি অন্তরঙ্গ চিত্রে যেমন স্বামী ও পিতা জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তি জীবনটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখি, তেমনি সমুজ্জল হয়ে থাকে কবির এক পরম আপন জনের চিত্র।]

লম্বা ছিপ্‌ছিপে উজ্জল শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে। মুখের গড়ন লম্বা ধাঁচের। উজ্জল চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, পাৎলা ঠোঁট। বয়স সতের আঠারো। ঢাকায় হস্টেলে থেকে পড়ত। নাম লাবণ্য। ছোটবেলাতেই বাবা মাকে হারিয়েছে। মানুষ হয়েছে জ্যাঠামশাই-এর কাছে।

তখনকার কালের ঢাকার কলেজের মেয়ে যেমন হত, ঠিক তেমন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে গোপন সংযোগ, শরীরচর্চা, আবার নাচ গান অভিনয়ে ঝোঁক। মা-বাপ নেই বলে খুব স্পর্শকাতর—সেই লাবণ্যকে হঠাৎ একদিন জ্যাঠামশাই বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলেন। হস্টেল থেকে বাড়িতে আসতে এক মাঠ কাদা ভাঙতে হয়। পরনে নকৃশাপাড় তাঁতের সাধারণ শাড়ি। আসতেই জ্যাঠামশাই বললেন, বাড়িতে অতিথি এসেছেন চা জলখাবার এনে দাও। সেই কাদামাখানো শাড়ি পরেই লাবণ্য লুচি মিষ্টি চা নিয়ে এলেন বাইরের ঘরে। অতিথির সংখ্যা মাত্র একজন। শ্যামবর্ণ, অতিসাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা নতমুখী একটি আটাশ উনত্রিশ বছরের যুবক।

জ্যাঠামশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—ইনি দিল্লী থেকে এসেছেন। ওখানকার রামযশ্‌ কলেজে পড়ান। ইংরেজির অধ্যাপক। আর এ আমার ভাইঝি লাবণ্য।

জীবনানন্দ দাশ চোখ তুলে নমস্কার করলেন।

সেদিন দুপুরে জ্যাঠামশাই লাবণ্যকে বললেন দিল্লী থেকে যে ছেলেটি এসেছিলেন, তিনি তাঁকে দেখতেই এসেছিলেন। এবং যাবার সময় মনোনীত করে গেছেন। লাবণ্যের কিন্তু তখন বিয়ে করতে একটুও ইচ্ছে নেই। সে সময়ে কারই বা থাকে। বিশেষ করে সবে তখন কলেজে ঢুকেছে, সবে মুক্তির স্বাদ, সবে রাজনীতির রহস্যময় আস্বাদ—তখন সব এত নতুন এত বৈচিত্র্যময়…

জ্যাঠামশাই লাবণ্যকে জীবনের বাস্তব দিকগুলির কথাও ভাবতে বললেন সেদিন। বাবা নেই, মা নেই। কেবল তিনিই সম্বল। আর জীবনানন্দ কথা দিয়েছিলেন বিয়ের পরও লাবণ্য পড়বেন। তাছাড়া যখন জ্যাঠামশাই বলছিলেন—'মেয়েটা মা-বাপ মরা, একটু জেদী একটু আদুরে, ওকে তুমি ভালো করে দেখো'—তখন ছেলেটির শান্তচোখে একটা আশ্বাসের ছায়া তিনি স্পষ্ট দেখেছেন। বিশেষ করে ছেলেটির শান্ত প্রকৃতিটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল।

লাবণ্য মত দিলেন।

সে বছরটা ১৯৩০ সাল।

সে সময়টা বৈশাখ।

সেদিন সন্ধ্যায় তাড়াহুড়ো করে বরিশালে বাড়ি, দিল্লীর ছেলেটি ঢাকার এক শাড়ির দোকানে ঢুকে জীবনে প্রথম একটি শাড়ি কিনল। আশীর্বাদের শাড়ি। সন্ধ্যায় আশীর্বাদ হ'ল। লাবণ্য হিন্দু কুলীন বাড়ির মেয়ে। মানুষ গিরিডিতে। তাঁর বিশেষ হিঁদুয়ানির সংস্কার ছিল না। জ্যাঠামশাই ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিতেন বলেই তিনি লাবণ্যকে জিজ্ঞেস করে নিলেন, বিয়ে কোন্ মতে হবে। ব্রাহ্ম বিবাহে লাবণ্যের আপত্তি হয় নি।

বিয়ের সময়ে জীবনানন্দর সঙ্গে এসেছিলেন বুদ্ধদেব বসু আর অজিত দত্ত। বিয়ের অনেক রমণীয় স্মৃতির সঙ্গে স্বামীর একটি বন্ধুর স্মৃতিও কেন যেন গেঁথে গিয়েছিল তাঁর মনে। বুদ্ধদেব ছোটখাটো বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল একটি যুবা তখন। স্বামী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন, পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু লাবণ্যর চোখে সুন্দর লেগেছিল তাঁর প্রাণচাঞ্চল্য, আকর্ষণীয় কথা বলার ভঙ্গি, সহজ সাবলীল আচরণ। লাবণ্য দাশ বললেন,—"সাধারণত ওঁর বন্ধুদের সামনে খুব একটা বেরোতাম না। কিন্তু বিয়ের দিনটি থেকেই বুদ্ধদেববাবুকে আমি আমার স্বামীর বন্ধু, আমাদের বড় সুহৃদ বলে জেনেছি। তিনি এলেই তাঁর কাছে এসে বসেছি। তাঁর পাণ্ডিত্য, কবিপ্রতিভা নাম যশ কিছুই আমাদের আর তাঁর মধ্যে কোনো আড়াল সৃষ্টি করে নি। বিয়ের দিনে দেখা সেই বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটি—আমার তরুণ স্বামীর তরুণ সঙ্গীটি আমার কাছে ঐ ভাবেই মুদ্রিত হয়ে গেছেন।"

বিয়ের পরে বরিশালে গেলেন বর বধূ। মস্ত সংসার। অনেকখানি ছড়ানো মেলা জায়গা নিয়ে বড় বড় ঘর। কিন্তু মাটির ভিত। খড়ের আস্তর। শহর থেকে গিয়ে লাবণ্যর খানিকটা অবাক লেগেছিল। ঢুকতেই ইতস্তত করছিলেন

ঘরে। পরে সেই বড় বড় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঘর, আম, জাম, বট অশথের ছড়ানো বড় বড় বাগান পুকুরের স্নিগ্ধতা লাবণ্য অনুভব করেছিলেন।

তরুণ স্বামী কিন্তু কোনোদিন গৌরব করেও বলেন নি তিনি কবিতা-টবিতা লেখেন। তাঁর 'ঝরা পালক' বলে একটি কাব্যগ্রন্থও আছে। কিন্তু সবসময়ে তিনি বই পড়তেন। বই-ই ছিল তাঁর আশ্রয়। ছোট ছোট অক্ষরে কি যেন লিখতেন মাঝে মাঝে। বাংলায়। লাবণ্য এলে লুকোতেন। আর স্বামী যা লুকোবেন তাই-ই যদি কেড়ে নিয়ে দেখবেন তাহলে আঠারো বছরের মেয়েটির আর জেদ কোথায় রইল? লাবণ্য দাশ বলছিলেন,—"অনেকে বলেন, তিনি নিপাট ভালোমানুষ, আত্মভোলা কোনোদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না ইত্যাদি। এসব যখন শুনি, বা পড়ি, তখন আমার খানিকটা অদ্ভুত লাগে। কারণ ঐ ছবিতে আমি যেন আমার অচেনা ব্যক্তিত্বহীন একজন সাজানো সৌখীন কবির তৈরি করা ছবি দেখতে পাই। আমি ঐ ব্যক্তিত্বহীন জীবনানন্দকে সত্যিই চিনি না। আমার স্বামীর ছবি, আমার কাছে সম্পূর্ণ অন্য। তাঁর উদার মন, আর ব্যক্তিত্বের জন্য জীবনে অনেকবার আমি অনেক সমস্যা থেকে উদ্ধার পেয়েছি মনে পড়ে। দু-একটা চিত্র আমি দিই।

মনে আছে, একবার বিয়ের ঠিক পরে পরেই বরিশালের গ্রামের প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন, 'আহা অমন এম, এ পাস প্রফেসর ছেলে, অথচ বিয়েতে বিশেষ কিছুই পেল না।' আমি এসব কথা শুনে খুব কষ্ট পেলাম। আমার স্বভাবই ছিল জেদী। আর সব রকম প্রশ্রয়ও পেতাম ওঁর কাছে। একদিন চাপা গলায় বললাম ওঁকে 'বাঃ রে আমি কি তোমায় সেধে সেধে বিয়ে করেছি। তোমরা যে এত সব কথা শোনাও। তুমিই তো আমায় নিজে দেখেশুনে নিয়ে এসেছ।' কথাটা উনি শুনলেন। তারপর আমার শাশুড়ির কাছে গিয়ে বললেন,—'যাঁরা এসব কথা বলছেন, আমি লাখ টাকা পেলেও তাঁদের বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতাম না। সুতরাং এ নিয়ে চর্চা না হওয়াই ভালো।' সুতরাং তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলই এবং কথার উচিত জবাব তিনি চিরকালই দিতে পেরেছেন।'

'আর একটি ঘটনা মনে পড়ে, তাঁর জীবনের কোথাও দেওয়া নেওয়া, দেনা-পাওনার কোনো স্বাভাবিক সংস্কারই ছিল না বলে বিয়ের সময় আংটি-বদলে পাওয়া আমাদের বাড়ির আংটিটি নিয়ে তাঁকে খুব লজ্জা পেতে দেখেছি। কেবল বলতেন, 'আচ্ছা, কেন যে ওঁরা এত টাকা খরচ করে এই আংটি করিয়ে দিলেন। শুধু শুধু ভদ্রলোকদের খানিকটা অর্থব্যয়।' আমার শাশুড়ি বললেন,

'বাঃ আংটি বদলের সময় লাগবেনা বুঝি।' উনি বিব্রত হয়ে বলতেন, 'তা একটা পেতলের আংটি-টাংটি দিলেই তো হত!'

বিয়ের পর বরিশালে এসে লাবণ্যর পড়া স্থগিত রইল। জীবনানন্দও একটু ইতস্তত করছিলেন কিভাবে স্ত্রীর কলেজে পড়ার কথাটা পাড়বেন এই ভেবে। তখন লাবণ্যর এক শ্বশুরমশাই বললেন, ঠিক আছে তোমার পরীক্ষা নেব। যদি পাস হও তাহলে পড়ার অনুমতি পাবে।

লাবণ্য দাশ বললেন,—'একটি খালি ঘরে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে তিনি আমায় কাগজ কলম দিয়ে বললেন, এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজিতে একটা রচনা লেখ! অন্য মেয়ে হলে হয়তো অভিমান করে লিখতই না। আমি কিন্তু লিখলাম। রচনাটা পড়ে তিনি আমাকে পড়বার অনুমতি দিলেন। আগস্ট মাসে ভর্তি হলাম। ডিসেম্বরে টেস্ট্‌-এ বসলাম। আই. এ পরীক্ষার সময় থেকেই ওঁর সহায়তা পেয়েছি। পূর্ণ সহযোগিতা পেলাম বি. এ পরীক্ষা দেবার সময়। তখন উনি আর কারো কথা শুনলেন না। আমাকে পড়াতে লাগলেন। তখন মঞ্জু হয়েছে। মঞ্জুকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রে পড়তাম। বিশেষ করে উনি আমাকে সংস্কৃতটা খুব যত্ন করে পড়িয়েছিলেন। পড়ার সুবিধার জন্য ঘর আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আবার পাছে রাত্রে পড়ায় ফাঁকি দিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে গল্প করি, তাই শিকল তুলে শাসন করে দিয়ে যেতেন। নিজেও সব সময় পড়তেন। বিশেষ করে ইংরেজি বই। অঙ্কেও খুব ভালো ছিলেন। কেবল হাতে ফিগার এঁকেছিলেন বলে পাঁচ নম্বর কেটেছিল। পঁচানব্বই পেয়েছিলেন অঙ্কে।

যখন আই এ পড়ছি তখন সে বিনয়-বাদল-দীনেশের সময় তখন হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি, বাড়ির সামনে কুড়ি-পঁচিশখানা সাইকেল। পুলিস এসেছে। একজন আমার পড়ার টেবিলের ওপর চেপে বসে আছে, আর একজন আমার বিছানার ওপর। উনি:খুব বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে। আমি স্পষ্ট বুঝলাম ভয়টা নিজের জন্য যত না তত নববধূর জন্য। পুলিসকে বলছেন,—না না ওর তো কোনো রকম সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে জানি না!

—আপনি কি জানবেন মশাই! ওরা সব ঢাকার মেয়ে। ওরা এসব কথা মরে গেলেও কাউকে বলবে নাকি?

—বেশ তো আপনারা সব সার্চ করে দেখুন!

লাবণ্য দাশ বললেন,—"পুলিস কিভাবে যে ওঁর যত্ন করে গুছিয়ে রাখা পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ছড়িয়ে নষ্ট করতে লাগল! বাড়ির সবাই কত বিরক্ত হলেন। নতুন বউএর জন্য এই পুলিসের হাঙ্গামা। কিন্তু উনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলেন। একটি কথাও বললেন না।

পুলিস অনেকক্ষণ ধরে দলের একটি ছেলের নাম বের করবার জন্য আমাকে

নানা রকম জেরা করতে লাগল। আমি খবর পেয়েছিলাম এসব হবে। তাই সাবধান ছিলাম। তবু অসাবধানবশত কিভাবে জানিনা একটি বই হঠাৎ পুলিসরা বের করে ফেললে। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবের ইতিহাস বোধহয় বইখানা। তখন ওঁর মুখের সব রক্ত সরে গেছে। পুলিস খাতাপত্র খুলে বসেছে একেবারে। তখন পুলিস এইভাবেই এলোপাতাড়ি অ্যারেস্ট করছিল। হাজার হাজার অ্যারেস্ট। আমি হঠাৎ বললাম—আচ্ছা বইটার জন্য আপনারা এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?

—কেন হব না?

—আমার ইণ্টারমিডিয়েটে হিস্ট্রি আছে তা জানেন?

—হ্যাঁ কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

—বাঃ ওটা তো আমার পাঠ্য!

সৌভাগ্যবশত পুলিস অফিসাররা ছিলেন ম্যাট্রিক পাস মাত্র। তাঁরা একটু চোখ চাওয়াচায়ি করলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি একটু বয়স্ক তিনি বললেন, নাও হে নাও, অনেক তো হয়েছে, এবার নিল্ লিখে চলো। পুলিস চলে যাবার পর আমার খুড়শ্বশুর রাগের চোটে বইখানা টুকরো করে ছিঁড়লেন। আর তিনি বিপর্যস্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, আচ্ছা কি হ'ত বলো তো যদি ওরা সত্যিই খোঁজ নিত বইটা পাঠ্য কিনা!

উনি ছোটবেলা খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। ফুল ভালোবাসতেন। গুছোনো ঘরদোর ভালোবাসতেন। বেঁচে থাকাটাকে শিল্পের মতো দেখতে চাইতেন। আমি একটু বিলাসী ছিলাম। উনি আমার সাজার সাধটুকু ভালোবাসতেন। বলতেন —'জানো মেয়েরা খুব সুন্দর করে সিঁদুরটি না পরলে, আল্তাটি না দিলে, আমার বাপু, ভালো লাগে না।' আমি অমনি চট্ করে দেখে নিতাম আমার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখাটি উজ্জ্বল আছে কিনা। আর ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথের গান। 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' গানটি ওঁর প্রিয় ছিল।

ওঁর মৃত্যুর পরপার সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। মাঝে মাঝেই ওই কথা বলতেন। বলতেন মৃত্যুর পরে অনেক প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়। আর খালি বলতেন, আচ্ছা বলো তো, আমি মারা গেলে তুমি কি করবে? ওঁর বড় দুঃখ ছিল, ওঁর জেঠিমার নিষ্করুণ বৈধব্য পালন ওঁকে পীড়া দিত। উনি আমাকে বলতেন, 'তুমি কিন্তু ওসব কিছু করতে পারবে না। ঠিক এই রকমটিই থাকবে।' সব সময় শুনতে শুনতে যখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটত তখন রেগে-টেগে গিয়ে বলতাম, আমি মরে গেলে তুমি কত তাড়াতাড়ি বিয়ে করবে তাই ভাবো তো, আমার কথা তোমায় ভাবতে হবেনা একেবারে!

তখন উনি হেসে চুপ করে যেতেন।

ছেলেমেয়েরা ছিল ওঁর বন্ধু। আর কবিতা শোনার গোপন সঙ্গী। মঞ্জুর কবিতা লেখা ওই ওঁর থেকেই পাওয়া। আর সুচরিতা, আমার ননদ, ওর কাছেও মাঝে মাঝে লেখা পড়তেন। রসগোল্লা খেতে খুব ভালোবাসতেন। ছেলে হয়তো রসগোল্লা খাচ্ছে। হঠাৎ সমবয়সীর মতো এসে বলতেন— "আধখানা দে নারে!" কলকাতায় আসবার পর সুবোধ রায় ছিলেন ওঁর খুব বন্ধু, তাঁর সঙ্গে রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত গল্প করতেন। ছোট ছেলে সমরও থাকত সেই নিশীথ আড্ডায়।

এবার বলি সম্পূর্ণ আমাদের দুজনের মধ্যেকার কথা। হয়তো এ কথায় একজন সংবেদনশীল কবিজায়ার ছবি ফুটবে না। নাই বা ফুটল। আমি তো তাঁর বা আমার কারো কোনো মিথ্যা এক 'Halo' তৈরি করতে পারব না। ওঁর কবিতা ক্রমশ ক্রমশ ধরছি। এখনও অনেকবার অনেকবার পড়তে হবে। আমিও ওঁর একজন পাঠিকা। বিয়ের পর থেকে অনেকদিন আমার কাছে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন কবি। আমার কবি। যখনই কোনো বাংলা লেখা নিয়ে গেছি দেখাতে, উনি বলেছেন, correct করবার কিছু নেই। লিখতে তুমি জানো। ধাঁচ আছে নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোথায় কি বলেছেন আমি জানি না। তবে আমায় বলেছেন,—চাঁদ বা সূর্যকে রাহু গ্রাস করে একটু একটু করে। একবারে মারে না। আর সেই তখনও মাঝখানে কালো কাচ ফেলে তবেই চাওয়া যায় তাঁর দিকে। রবীন্দ্রনাথকে যে আমরা দেখি সেও আমাদের সেই ভাবে দেখা।

তাঁর সংসারে তিনি আমাকে অধীন করেছিলেন অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে। বরিশালেই বলতেন যখন নিজের সংসার হবে তোমাকে আমি স্বাধীনতা দেবো সম্পূর্ণ অবাধে। তা তিনি দিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমার মধ্যে যে আদরে আদরে নষ্ট, একটু উদ্ধত ছোট্ট মেয়েটি ছিল—তার প্রতিও ছিল—তাঁর অবাধ প্রশ্রয়। আমার বাপের বাড়ি ছিল না বলে আমার দুঃখটি তিনি বুঝতেন। একবার কোথায় যেন বেড়াতে যাবার কথা হয়েছিল। তিনি বললেন, খুব ভালো করে বেড়ানোটুকু উপভোগ করবে। আমাদের কথা ভেবে চট করে এসো না যেন। কিছুদিন থেকে এসো!

আর কেউ না বুঝুক আমি বুঝেছি স্বামী হিসেবে তিনি কতখানি অনুভূতি-প্রবণ ছিলেন। নাহ'লে এমন কথা বলা কিন্তু খুব সহজ বিষয় না।

কখনো পরীক্ষার সময় কলমে কালি ভরি নি। উনি সব ঠিক্‌ঠাক্ করে

দিতেন। ক্লাসের খাতা দেখতাম যখন হাতের কাছে ডিক্সনারী নিয়ে কখনো বসি নি। জানিই তো উনি আছেন। পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শব্দের বানান বা মানে জিজ্ঞেস করে নিতাম। ওঁর বলতে দেরি হলেই, ভয় দেখাতাম,—দাঁড়াও আসছি! তোমায় কবিতা লেখা বের করছি!

উনি অমনি সহাস্যে আমার প্রশ্নগুলি উত্তর দিতেন। নাহলে মৃদুভাবে বলতেন, এক সঙ্গে সব লিখে এনে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়!

মনে আছে নাটক করলাম আমরা! 'ঘরে-বাইরে'। আমি সেজেছিলাম মেজ বৌরাণী। ওঁকে বললাম টিকিট রইল, যেয়ো কিন্তু!

"ভাবো, নাটক শেষ করে, বাড়ির বৌ ফিরছি, রীতিমতো রাতে। কিন্তু ভয় নেই। প্রায় দাপটের সঙ্গে। এসেই বুঝলাম, যান্ নি। রেগে-টেগে অস্থির, বললাম—পাঁচশোবার বললাম যাবে! গেলে না কেন? একদিন কবিতা লেখা কামাই দিতে পারো না!'

উনি বললেন,

আহাঃ রাগ করো কেন? তুমি করেছ! ভালোই তো হবে। হবে না? চলো খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, খাবে চলো।

আমি তখনও রাগ করছি দেখে বললেন,

—আচ্ছা আচ্ছা কাল যাবো।

বলো তো আজ নাটক হয়ে গেল, উনি কাল কোথায় যাবেন?

আমার যত দাপট ছিল ওঁর কাছে। অন্য কিছুতে বকতেন না, শুধু ছেলে-মেয়ে ছিল ওঁর প্রাণ, ওদের কিছু বললেই বকতেন।

মনে আছে লিখতে যদি চেয়ারে বসলেন তো আর জ্ঞান নেই। কিছুতেই গেঞ্জী ছাড়বেন না! আর আমি ওঁর গেঞ্জী কাচবই। তখন একটা বড় কাঁচি নিয়ে আসতাম। বলতাম, কাটি? পিঠ থেকে কেটে নিই গেঞ্জীটা?

হেসে খুলে দিতেন।

উনি যে চাকরি পেতেন না তা নয়। উনি চাকরি করতে চাইতেন না। বার বার বলতেন, বলো তো, কি নিদারুণ সময়ের অপচয়। বড় ক্ষতি হয়। এভাবে এতটা সময় চলে যাওয়া। আহা, যদি আমার এমন সঞ্চয় থাকত যে এ ভাবে সময় নষ্ট না করলেও চলত!...ওঁর এই কথাটি বড় মনে পড়ে! আর একটি ব্যক্তিগত কথা মনে পড়ে, বিবাহিত জীবনের শুরুতে জ্যাঠামশাইকে যে কথাটি দিয়েছিলেন সারা জীবন তিনি তা রেখেছিলেন। আমাকে কোনোদিন কোনো কারণে ক্ষুণ্ণ করেন নি!

স্মৃতির পাতায়

কবিজায়া লাবণ্য দাশ

জগৎ পরিক্রমায় দিন এবং রাত্রি মানবজীবনে নানা স্মৃতি বহন ক'রে আনে—কোনোটি সুখের কোনোটি বা বিষাদের।

আমার জীবনেও হেমন্তের কুয়াশা ঢাকা একটি রাত ব্যথাভরা স্মৃতির ডালি নিয়েই সামনে এসে দাঁড়ায়।

সে রাত চুরি ক'রে নিয়েছিল কবি জীবনানন্দের অমূল্য প্রাণসম্পদটিকে। লুকিয়ে ফেলেছিল তাকে চিরদিনের মতোই তার ঘনকালো আবরণের অন্তরালে—ফিরিয়ে সে আর দিল না।

তাইতো মনের রুদ্ধ দুয়ার ঠেলে একটি কথাই আজ বার বার বেরিয়ে আসতে চাইছে,

"স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত তুমি আজ নেই"—

বসন্তকালে ঋতুরাজের আগমনে মলয় পবন যখন সবুজ বনানীর শ্যামলিমাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়, গাছের বুকে দেখা দেয় নতুন পাতা, ফুল আপনাকে বিকশিত করে এবং নীলাকাশ থেকে ভেসে আসে পাখির আনন্দ লহরী—ফাল্গুন মাসের এই রকম একটি দিনেই বরিশাল শহরে জন্ম নিলেন কবি জীবনানন্দ।

প্রকৃতিদেবী আপন হাতেই বরণ ক'রে নিলেন তাঁর এই আদরের দুলালকে।

বাবা দেবোপম সত্যানন্দের সান্নিধ্যে এবং মা কুসুমকুমারীর স্নেহচ্ছায়ে বড় হ'তে লাগলেন এই শিশু। বাবার ধ্যানগম্ভীর ভাব এবং মায়ের অপার সহনশীলতা এ দুয়ের মিশ্রণে গঠিত হ'ল তাঁর চরিত্র।

আমাদের দেশের প্রতিটি সন্তান কম কথা ব'লে কাজের ভিতর দিয়েই তার মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তুলুক। এই ছিল মায়ের ঐকান্তিক মনোবাসনা। তাঁর এই মনোভাব মূর্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত কবিতায়:

—"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে"—

কম কথা ব'লে কাজে বড় হ'য়ে পৃথিবীতে তাঁর মায়ের কবিতাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন কবি জীবনানন্দ।

তিনি ছিলেন মা-অন্ত-প্রাণ। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে মায়ের স্নেহকোমল স্পর্শ না পেলে কোনো কিছুই তাঁর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠত না। কিন্তু বাবার সঙ্গে কবির সম্পর্ক ছিল অতি সম্ভ্রমের। তাঁর মনের মণিকোঠাটি ভরা ছিল তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায়। সে শ্রদ্ধার পরিমাপের ক্ষমতা বাইরের জগতের ছিল ব'লে আমার মনে হয় না।

এইরকম বাবা-মায়ের সন্তান হ'য়ে পৃথিবীতে আসতে পারায় তিনি চিরদিন নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করেছেন।

ঝড়, ঝঞ্ঝা, দুর্যোগের ঘনঘটা বহুবার তাঁর জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে—ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পথ হারিয়ে দিশেহারা তাঁকে হ'তে হয়েছে বৈ কি। কিন্তু তাঁর মা, বাবার আশীর্বাদই আলো হয়ে তাঁকে পথের সন্ধান দিয়েছে। শতবাধা অতিক্রম ক'রে সোজা হয়ে হেঁটে যাবার যুগিয়েছে শক্তি।

কবির কথা ব'লতে গিয়ে আজ মনে পড়ে তাঁর পরলোকগতা ছোটপিসীমার কথা—মনে পড়ছে তাঁর কাকা স্বর্গত ব্রহ্মানন্দ দাশের কথা। ছোটপিসীমা—চিরকুমারী স্নেহলতা দাশ যতদিন বেঁচে ছিলেন, পরিবারের সকলকে অন্তর দিয়েই আঁকড়ে ধরেছিলেন।

মায়ের পরে এই ছোটপিসীমার সঙ্গেই কবিকে মন খুলে কথা ব'লতে এমন কি হাসি ঠাট্টা ক'রতেও দেখেছি। আবার মাকে হারিয়ে এই পিসীমার মধ্যেই মায়ের অস্তিত্বকে আকুল হ'য়ে খুঁজে বেড়াতেও দেখেছি।

ছোটপিসীমা আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে পণ্ডিতিয়া প্লেসে কাকার বাড়িতে যাবার সময় যে মুহূর্তে বলেছেন, "মিলু, এবারে যাই।" অমনি কবি তাঁর খাতাপত্র ফেলে রেখে পিসীমার ডান হাতখানি জড়িয়ে ধরে বলতেন, "এখনি কি যাবে? আর দু একটা দিন থেকে যাও না। ভাই-এর বাড়ি যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? থাক, থাক। আরে, যে কদিন পার থাক না।"

কবির কাকা ব্রহ্মানন্দ দাশের ছেলে না থাকায় তিনি তাঁর দাদার এই প্রথম সন্তানটিকে হয়তো মনে মনে গভীরভাবেই স্নেহ ক'রতেন। তাই শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কবির শয্যাপাশে দেখেছি তাঁর অস্থির মনের ব্যাকুলতা।

মুখে তিনি কিছুই প্রকাশ করেন নি। শুধু দুটি হাত পিছনে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে অনবরত পায়চারি করেছেন। আমি নির্বাক হ'য়ে সবই লক্ষ্য করেছি। তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছে তিনি শুধু যে কবির কথাই ভাবছেন তা নয়। মনে পড়ছে তাঁর দাদা এবং মেজো বৌঠানের কথা—ভাবছেন তিনি আমাদের কথা।

এই কাকা সম্বন্ধে কবিকে বহুবার ব'লতে শুনেছি—"আমাদের কাকাকে সহজে বোঝা যাবে না। মুখের ভাষা তাঁর রুক্ষ, কিন্তু অন্তরে তাঁর ফল্গুর ধারা। তাঁর কর্তব্যবোধ অসীম—পরিবারে তাঁর দানেরও সীমা নেই। কিন্তু সবই নীরবে। কোনোপ্রকার অভিব্যক্তিই তাঁর নেই।"

মহামানবের স্মৃতিতর্পণই তাঁর চরিত্রানুশীলন। একথা কবি সর্বতোভাবেই স্বীকার ক'রতেন।

তাইতো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিনটিতে ধরিত্রীমায়ের বুকে উষার আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উচ্চারণ ক'রতেন,

"মরণ সাগর পারে তোমারেই স্মরি,
তুমি যে অমর।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনার ঘর
তোমারেই স্মরি।"

বিশ্বকবির তিরোধানের স্মরণীয় দিনটিতে তিনি বলেছিলেন, "কী প্রতিভা আজ আমরা হারিয়ে ফেললাম। লোকে তাঁর কতটুকু বুঝতে পারল? বহুর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে, বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্যের ঝংকার তুলে যিনি যুগান্তর ঘটিয়েছেন, তিনি আজ কোথায়?

পরমুহূর্তেই অস্থিরভাবে ব'লে উঠেছেন—"না, না, না। হারিয়ে তিনি যান নি, কোনোদিনই যাবেন না।

—আছে, আছে, আছে এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;
জয় অস্তসূর্য জয়, অলখ অরুণোদয় জয়—"

তারপরেই কি এক মূক বেদনায় ম্রিয়মাণ কবি নীরব ধ্যানে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিয়েছেন।

কবির বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে বরিশালে। সেখানে দেখেছেন তিনি হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃরূপ। সুখে, দুঃখে, স্নেহে, ভালবাসায় অনুভব করেছেন তাদের অপূর্ব একাত্মবোধ।

তাই প্রাকস্বাধীনতাকালে একই মায়ের বুকে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি তাদের সেই রক্তলোলুপতা কবিচিত্তকে বেদনাবিহ্বল ক'রে তুলেছিল—মথিত করেছিল তাঁর প্রাণ।

অন্তরের সুতীব্র বেদনাকে তিনি মুখে প্রকাশ ক'রতে পারেন নি। লেখনীর বাহুডোরে বেঁধে রেখে গেলেন ভাবীকালের সন্তানদের পথ দেখাবার জন্যে।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি? আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্ত নদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে, "গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার,
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রীটের, এণ্টালীর—
কোথাকার কেবা জানে।
অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে;
কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে।

তিনি ছিলেন ছাত্রদরদী। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও আমি তাঁর ছাত্রপ্রীতি লক্ষ্য করেছি। তিনি "দাশগুপ্ত" না লিখে শুধু "দাশ" লেখাতে তপসিলী সম্প্রদায়ের বহু ছাত্র এসে তাঁকে বলত, "স্যার, আমাদের সমাজে আপনার মতো এইরকম একজন প্রতিভাশালী লেখক ও সহৃদয় অধ্যাপক পেয়ে আমাদের সম্প্রদায়ের, প্রতিটি নরনারী ধন্য হয়ে গিয়েছে। কবি কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতেন।

আমি রাগ ক'রলে ব'লতেন, "দেখ, আমাকে সমগোত্রীয় ভেবে কেউ যদি ভুল ক'রেও মনে আনন্দ পায়, তবে সে ভুল ভাঙবার দরকার কি? কারো জন্যে কিছুই ক'রতে পারি না। তারা নিজে থেকে যদি একটু আনন্দ পায় তো পাক না।"

তাঁর এক লাইন কবিতা পাবার আশায় আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে প্রতিদিন দলে দলে ছাত্রছাত্রীকে আসতে দেখেছি। সকলেই কিন্তু হাসিমুখে ফিরে যেত।

কিছু বললেই উত্তর দিতেন, "এরাই তো আমাদের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা। এদের ভিতর দিয়েই তো আমরা বেঁচে থাকব। এদের কি ফেরাতে পারি?"

তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। ফুল, লতা, ঘাস, আম, জাম, নারকেলের সবুজপাতা, আকাশের নীলিমা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। কাশের বনে, ধানের খেতে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা তাঁর মনে জাগাত বিস্ময়।

সন্ধ্যেবেলা স্টীমার, লঞ্চ, এমন কি নৌকার ক্ষুদ্র আলোক শিখাটিও যখন ঢেউয়ের গতিছন্দের সঙ্গে তাল রেখে ছোট নদীটির বুকে শিহরণ জাগাত, তখন সেই লহরীর নৃত্য দেখতে দেখতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন।

রাত্রির তারায় ভরা উদার আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিয়েছেন, এবং রহস্যময়ী তারকার অবগুণ্ঠন উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন।

সূর্যের প্রথম রশ্মিরেখা যখন নীলাকাশের ছোট্ট পাখিটির ডানায় সোনালি রং বুলিয়ে দিত অথবা তাঁর অতিপ্রিয় শিউলি গাছটিকে রংএর নেশায় মাতিয়ে তুলত, কবি তখন তাঁর ঘরের বাগানের দিকের দরজার সামনে একখানি ইজিচেয়ারে বসে সেই সৌন্দর্য নেশায় বিভোর হ'য়ে কোন্ এক স্বপ্নলোকে চ'লে যেতেন। এই সৌন্দর্যের অনুভূতিই নানাভাবে, নানাছন্দে রূপ নিয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়।

এই স্বপ্নলোকে বিচরণ করতে করতেই চিনতে পেরেছিলেন তিনি বাংলামায়ের নিজস্ব রূপটিকে। তাইতো তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠল—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের ক'রে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে।

বাংলা মায়ের যে কয়জন সন্তান বিশ্বের দরবারে মায়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গিয়েছেন কবি জীবনানন্দ তাঁদের অন্যতম। যশোলক্ষ্মী যখন জয় গৌরবের মালা হাতে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন—ঠিক সেই সময়েই হেমন্তের কবি হেমন্তেরই এক কুয়াশা ঢাকা রাতে চিরদিনের মতোই হারিয়ে গেলেন—হারিয়ে গেলেন রহস্যময় রাজপুরীর সোপানাবলী ধরে কোন্ এক গুহাবক্ষে। মহাকালের ডাক যখন আসে, তখন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার প্রস্তুতি আমাদের করতেই হয়। স্বপ্নভরা পৃথিবীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে মায়াবী মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে সমস্ত চিন্তা ভাবনায় পরিসমাপ্তির রেখা টানতেই হবে।

কিন্তু মাটি-মায়ের স্নেহডোর ছিঁড়ে ফেলা খুব সহজসাধ্য নয়। অজানাকে জান্‌বার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে সেটুকু মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন কবি—

—আমার এ শিরা উপশিরা
চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধরণীর নাড়ীর বন্ধন,
শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির ক্রন্দন—
মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা—তোমার ;

ডেকেছিলো ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম ঘাস—জোনাকির ঝাড়,
আমারে ডাকিয়াছিলো আলেয়ার লাল মাঠ।—

*　　　*　　　*　　　*

নয়ন মুদিনু ধীরে—শেষ আলো নিভে গেল পলাতকা নীলিমার পারে,
সদ্য প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে।

কিন্তু বাংলার কবি—বাংলার মাটি, জল ছেড়ে বেশীদিন দূরে থাকতে পারবেন না।

পারবেন না তিনি শস্যক্ষেতের সোনালি ফসল, আম কাঁঠালের ছায়াঘেরা বন, নদী কল্লোল, কোকিলের কুহুতান ছেড়ে দূরে থাকতে। তাইতো তিনি সকলকে বার বার আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ ডাঙায়;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে,
রূপসীর ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক—আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে

বুদ্ধদেব বসু

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হ'লো। শুঁয়োপোকার খোলশ ঝ'রে গেলো, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষণিক ব'লেই কোনো-কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু ক'রে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার—যাঁর 'বেদে,' 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে—তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনও ভেঙে যায় নি। আর এঁদের মধ্যে—সম্পাদক দু'জনকে বাদ দিয়ে—যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হ'তো তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিলো। তাঁর সাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়; লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম ব'লে ভুল করছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'-র মতো সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য নাম বাস্তব কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ্য করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিলো যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারি নি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম—এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ—যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়,

মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের বাঁধানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও তা সংগ্রহ করতেও পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা ধারণা আছে আমার ; কিন্তু প্রথম বছরে কোন-কোন লেখা বেরিয়েছিলো সেটা স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিলো '১৩৩৩' 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যত, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলি এখনো আমার হাতের কাছে আছে, আর তাতে—এখন পাতা উল্টিয়ে প্রায় অবাক হ'য়ে দেখছি—প্রথম দেখা দিয়েছিলো 'সহজ', পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন' 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা' 'কল্লোলে' 'ক্যাম্পে' 'পরিচয়ে,' 'মৃত্যুর আগে,' 'কবিতা'য়, আর কোনো কোনোটি 'ধূপছায়া'য় বেরিয়েছিলো, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে তার উপর যখন বই ছাপা হ'লো তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম ; তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ ব'লে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক স্তবকবিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয় নি।

'প্রগতি'তে, শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ্য ছিলো আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যেই তাগিদ ছিলো, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিলো না। দেশের মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লণ্ডনে-পাস-করা প্রোফেসর, আর কেউ বা ফরাশি জর্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাতই কলেজের ছাত্র কিংবা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে ; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ কথাকে কীটের অন্নে পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পঙ্‌ক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে, তাই আমরা হেরে যাইনি, ভেঙে যাইনি, স'রে যাইনি, দাঁড়িয়ে

ছিলাম শরবর্ষণের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে-কদিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘৃণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হ'তো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হ'তো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক ব'লে মনে হয়; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ লাগে। অবশ্য আমি অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধ'রে সেই অপব্যয় সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হ'লো, তা না-হ'লে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ নতুন ক'রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হ'তে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মূর্ছা যান না—শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হ'য়ে থাকে মূঢ়তার, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম 'Remember to Remember'। এই নামটি উল্লেখযোগ্য, কেননা আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের বড়ো একটা অংশ হ'লো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ

পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় ব'লে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।

২

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো তার কিছু-কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলির লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি; কিন্তু এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু, সব দোষ সত্ত্বেও, অংশগুলি অন্য কারণে ব্যবহার্য হ'তে পারে: প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী-রকম ভাবে সাড়া তুলেছিলো; দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিঞ্চিৎ কাজে লাগতে পারে।

> জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেন নি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ;—অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ · তাঁর কবিতা একটু ধীরে-সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।
>
> জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তা'কে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়।··· তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে' ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়। · তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে' শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করে'ই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ বলে' মনে হয় না। [তিনি] এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করেনি—যথা, "ফেঁড়ে" "নটকান", "শেমিজ", "থুতনি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য

এসেছে সে-কথা আগেই বলেছি ; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী করে' নিতে পেরেছেন, এর জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী। * * *

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।···জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে' এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান ;—সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো।...[সেইজন্যেই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে। * * *

[তাঁর] ছন্দ অসমছন্দ হ'লেও "বলাকা"'র ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য কানেই ধরা পড়ে ;—"বলাকা"র চঞ্চলতা, উদ্দাম জলস্রোতের মত তোড় এর নেই ;—এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী—থেমে-থেমে, অজস্র ড্যাশ ও কমার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে ব'য়ে চলেছে। এতে প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি। এই সুর যেন বহুদূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে।

জীবনানন্দবাবুর···বহু কবিতায়···পরমবিস্ময়কর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued।···দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক'টি লাইন নেয়া যাক—

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে!
পৃথিবীর কানে

নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান !
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,—জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে !

এখানে যেন কথা শেষ হ'য়েও শেষ হয়নি ;—কথা ফুরিয়ে গেলেও তা'র বিষণ্ণ সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার…ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট করে' থেমে যায় না, ভ্রমরের পাখার মত গুঞ্জন করে' ভেসে যায়।

['প্রগতি'—আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য]

অনিল। * * * আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে' আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি ?

অনিল। জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ। জীবানন্দ দাশ ? কখনো নাম শুনিনি তো !

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা ! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তা'র প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।'… আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি লাইনে আঁকা হয়েছে—একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হ'য়ে উঠেছে ; শব্দের মূল্য-বোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল। এই কবি…উভচর ভাষা অবলম্বন করে' আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তাঁর ভাষা সব চেয়ে স্বাভাবিক। সরল, নিরলঙ্কার, ঘরোয়া ভাষার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে ? তুমি যদি অনুমতি করো, প্রগতি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে' শোনাই।

সুরেশ। শুনি?

অনিল। (পড়িল)।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু–ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর!
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা
যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছ জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passageটির একমাত্র weak point হচ্ছে রুধির কথাটা। তা ছাড়া, একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাক, music আছে—একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering। থেমে-থেমে পড়তে হয়—তবে সুরটি কানে ধরা পড়বে। যেমন—'রাতের, বাতাস তুমি। বাতাসের, সিন্ধু, ঢেউ॥ তোমার, মতন কেউ; নাই আর॥'

সুরেশ। তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল। ঠিকই—দেহ কথাটা এখানে সঙ্গত হয়নি। শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] জাতে তুলে' দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুরেশ। দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিলো না, কিন্তু ছেঁড়া!

অনিল। ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না নাকি?

সুরেশ। ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অনভ্যাস। সয়ে' গেলেই এর সৌন্দর্য ধরা পড়বে। ভাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর

বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাঙলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—তা'র ব্যাকরণ, তা'র বিধি-বিধান, তা'র spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।·· অথচ, আশ্চর্যের বিষয় বাঙলা কবিতা এখন পর্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত convention-গুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি; আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত ক'রে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি, যদিও ও-সব ফ্যাশান দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা ক'রে আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে' রাখবো? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন বলে' মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাঙলা করে' তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে লিখেছেন:

সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা—শাদা—বরফের কুচির মতন।

শুনে তোমার—শুধু তোমার কেন? অনেকেরই—হাসি পাবে, বলবে—'ঠাণ্ডা—শাদা—এ আবার কী?' কিন্তু ঐ শব্দ দুটো গদ্যে লিখতে পারি, মুখে বলতে পারি—আর কবিতাতেই লিখতে পারবো না? কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো না, বিছানাকে বিছানা?·· যত কথা আমাদের মুখের ভাষায় স্থান পেয়েছে · কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে করে' রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ-সম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে' কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে' তুলবো না কেন?···আমি তো বলি, ক্ষণিকার ভাষা, জীবনানন্দের কবিতার ভাষা purest বাঙলা, কারণ তা বাঙলা ছাড়া আর কিছু নয়।

('প্রগতি'—ভাদ্র, ১৩৩৬, 'বাঙলা কাব্যের ভবিষ্যৎ')

ইচ্ছে ক'রেই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ করলাম, সেই সময়কার সাহিত্যিক আবহাওয়ার কিছু আভাস দেবার জন্য। আজকের দিনের পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে কবিতায় 'ঠাণ্ডা' বা 'শাদা' কথাটার ব্যবহারের সমর্থনের জন্য এতগুলো বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হ'তে পারে কিন্তু এ-কথা সত্য

যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোনো বাঙালী কবি করেননি। মনে পড়ছে 'পাখিরা' কবিতা পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিলো 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিলো ব'লে। ওটা যে ঐকান্তিক চমক-লাগানো ব্যাপার নয়, সপ্রাণ এবং সজীব নূতনত্ব, এতদিনে সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এমনকি, মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের স্পন্দন তিনি এনেছিলেন; 'তোমার শরীর—তা-ই নিয়ে এসেছিলে একদিন', এই পঙ্‌ক্তিটি প'ড়ে আমি 'শরীর কথাটাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা শুনিনি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনায় সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

৩

কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল'-আপিশে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন; অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখিনি। হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করতে করতে বৌবাজারের মোড়ের কাছে এসে ধ'রে ফেলেছিলাম। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার, মেঘলা দিনে মাঠের পথে ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে; পরে, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে, ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত আছি অজিত, আমি, অন্যান্য বন্ধুরা। কলকাতায় চ'লে আসার পর রমেশ মিত্র রোডের একতলা ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সঙ্গে ব'সে আছি, শীতকাল, বিকেল হ'য়ে এলো। হঠাৎ চেয়ার-টেবিল ন'ড়ে উঠলো, আমরা বাইরে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বসলাম আবার। পরের দিন কাগজে পড়লাম উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের খবর। কিন্তু এই সবই ঝাপসা স্মৃতি, এদের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। আসলে, জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতায়, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমকালীন

অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন ; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না ; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে ক'রে পেছিয়েও পড়েছি কখনো-কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি। কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব-সংকোচ। যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে একবার পাক্ষিক সাহিত্যসভার ব্যবস্থা করেছিলুম ; তাতে, এ. আর. পি.র কর্মভার সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে আসতেন, কিন্তু জীবনানন্দ এসেছিলেন একবার মাত্র ; এসে, একটি কবিতা পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হ'য়ে, অথবা তারই ফলে, আমাদের একটু অপ্রস্তুত ক'রে দিয়ে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর মুখে তাঁর নিজের কবিতাপাঠ আমি কখনো শুনিনি, যদিও শুনেছি ইদানীং তরুণদের কাছে তাঁর সংকোচ কেটে গিয়েছিলো। অথচ, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন ; দেখাশোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর ক'রে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে—যার অনেকটা অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘ'টে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয়নি ; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুরস্কার ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি ক'রে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া ; আনন্দ পেয়েছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রুফ দেখে, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা ব'লে, তাঁকে আবৃত্তি ক'রে। বাংলা কবিতার যতগুলো পঙ্‌ক্তি বা স্তবক আমার বিবর্ধমান বিস্মরণশক্তি এখনও হারিয়ে ফেলেনি, কিংবা পরিবর্তমান রুচি বর্জন করেনি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধ'রে অনেকটা রক্ষাকবচের মতো মনে-মনে বহন ক'রে আসছি, তার মধ্যে জীবনানন্দর পঙ্‌ক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, অন্য অনেক পাঠকেরও মনে—ভাবী কালেও বেঁচে থাকবে ; তবে আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমাদের পক্ষে স্বল্পপরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখবো না।

৪

জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি ; আজ আবার প'ড়ে আরো কিছু নতুন কথা আমার মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে

সন্দেহ নেই যে ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে তিনি অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ—আর এ-সব কথা পাঠকমহলে যথেষ্টরকম জানাজানিও হ'য়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যেন পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে চলেছে। একদিকে আমরা রাখতে পারি যে-সব কবিতা বিশুদ্ধ বর্ণনার, অথবা স্মৃতিভারাতুর, অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত: যেমন 'মৃত্যুর আগে' 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত'—পাঠক আরো অনেক জুড়ে নিতে পারবেন—আমি 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের প্রেমের কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চাই। অন্য দিকে আছে যে-সব কবিতা মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু বলতেও চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করবো 'বোধ', 'ক্যাম্পে', আর সেই লাসকাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটি, যার নাম দেয়া হয়েছিলো 'আট বছর আগের একদিন'। 'কয়েকটি লাইন'কে বলা যায় 'বোধে'র সঙ্গী কবিতা—দুটিই কবির স্বগতোক্তি—প্রথমটিতে কবি নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ঘোষণা করছেন তাঁর নূতনত্ব ('কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী, / আমি ব'হে আনি'), ব'লে দিচ্ছেন তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য কোনখানে ('উৎসবের কথা আমি কহি নাক', / পড়ি নাক' দুর্দশার গান / শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান'); আর দ্বিতীয়টিতে জীবনের সঙ্গে কাব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত তিনি, তাঁর 'বোধ' আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিপ্রতিভা, যার তাড়নায় 'সকল লোকের মাঝে ব'সে/ আমার নিজের মুদ্রাদোষে / আমি একা হতেছি আলাদা'। আবার, তাঁর আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায়: প্রথমত, সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা, বা যে-কবিতায় সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, কুয়াশার পরদা ঝুলে আছে ('মাঠের গল্প', 'হায় চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা'); দ্বিতীয়ত, আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ('অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস'), আর তৃতীয়ত, যে-সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রৌদ্র আর রাত্রি, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এই চিত্রশালাটিতে 'হিজলের জানালায়

আলো আর বুলবুলি'কে যদিও একবার দেখা যায়, আর 'ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ' ভোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই, পড়তে-পড়তে আমাদের মন বারে-বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হ'য়ে আসে। আমি ভাবছিলাম 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে-বলতে কবির হৃদয় 'দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে' ভ'রে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'। ভাবছিলাম 'নগ্ন নির্জন হাতে'র বিস্ময়কর গঠনের কথা—কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে, তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায় চিল্'-এ দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাত' কবিতায় অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হ'য়ে উঠলো—'মৃত্যুর আগে'র ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।

৫

আলোচনার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে। দেখানো যেতে পারে, বিদ্রূপের শক্তি তাঁর হাতে কী-রকম আত্মস্থ আর গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিলো 'সোনার পিত্তলমূর্তি' অথবা 'অজর, অক্ষর অধ্যাপকে'র উদ্দেশে লেখা পঙ্‌ক্তিগুলিতে,* কিংবা কেমন ক'রে আলোছায়ার দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি স্বপ্নগোচর অতিবাস্তবের মায়ালোকে প্রবেশ করছিলেন 'বিড়াল', 'ঘোড়া', 'যেই সব শেয়ালেরা' ধরনের কবিতায়। শেলি, কীটস, পূর্ব-ইএটস আর কোথাও-কোথাও সুইনবার্নকে তিনি কেমন ক'রে ব্যবহার করেছিলেন তা তুলনার দ্বারা দেখানো যেতে পারে; সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইএটস-এর

* তাঁর মধ্য পর্যায়ের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটি সংক্ষুব্ধ বিবমিষা লক্ষ্য করা যায়—আসলে তার আরম্ভ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সময়েই, সেই সময়েই 'অন্ধকার' কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী'তে 'কোটি-কোটি শূয়ারের আর্তনাদে'র 'উৎসব' দেখে তিনি 'অন্ধকারের অনন্ত মৃত্যু'র ভিতর মিশে যেতে চেয়েছিলেন। তারই কিছুকাল পরে 'আদিম দেবতারা' কবিতায় ঘৃণা তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো :

'O curlew'-র তুলনায় তাঁর 'হায় চিল' অনেক বেশি তৃপ্তিকর কবিতা, আর 'The Scholars' সঙ্গে 'সমারূঢ়ে'র সম্বন্ধ যেমন স্পষ্ট, তার স্বাতন্ত্র্যও তেমনি নির্ভুল। 'ওড টু এ নাইটেঙ্গেল'-এর কোনো-কোনো পঙ্‌ক্তি 'অবসরের গান'-এ কেমন নতুন শস্য হ'য়ে ফ'লে উঠেছে, তাও সহজেই বোধগম্য। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দর অসংরক্ত, অ-মানবিক জগতে শ্রান্তি বোধ করেন, তাঁকে অনুরোধ করা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুনর্বার পড়তে—জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণতপ্ত ও স্বরবহুল; এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই রকম 'সচ্ছল'ভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হননি ('জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবার ; / এই সচ্ছলতা আমাদের'), নিজের কথা নিজে লঙ্ঘন ক'রে উৎসবের কথা বলেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন ক'রে 'প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ' তুলেছেন তিনি মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে 'কোথাও ফড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতার চাপে ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারিদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর, 'মৃত্যুকে দলিত ক'রে' 'জীবনের গভীর জয়' তিনি প্রচার করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই দ্যোতনাময় যে এটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখালে আলোচনার সহায়তা হ'তে পারে। এর আরম্ভ—'শোনা গেল লাসকাটা ঘরে / নিয়ে গেছে তারে।' ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে কোনো-এক পুরুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে—আর এই খবরটি শুনেই কবি অনুভব করলেন—মৃত্যুকে নয়, তাঁর চারদিকে চাঁদ-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'কে :

> অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
> রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে
> ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল, আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
> 'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায় ?'

'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনেক কবিতাতেই এই ঘৃণা বা বিদ্রূপের আঘাত পড়েছে ; তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এটিকে একটি প্রধান স্বর বললে ভুল হয় না।

তবুও তো পেঁচা ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে।
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

মনে পড়লো বাঁচার ইচ্ছার, বাঁচার চেষ্টার অন্যান্য উদাহরণ :

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে ফের রৌদ্রে উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।…
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;—

কিন্তু এই প্রাকৃত প্রেরণা মানুষের পক্ষে তো সর্বস্ব নয় :

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা
এই জেনে।

হয়তো গাছের ডাল প্রতিবাদ করেছিলো, ভিড় ক'রে বাধা দিয়েছিলো জোনাকিরা, থুরথুরে অন্ধ পেঁচা ইঁদুর ধরার প্রস্তাব এনে জীবনের 'তুমুল গাঢ় সমাচার' জানিয়েছিলো—কিন্তু চেতনার সংকল্পে প্রকৃতি বাধা দিতে পারলো না।

এর পর অনিবার্য প্রশ্ন : কেন মরলো লোকটা? কোন দুঃখে? কিসের ব্যর্থতায়? না—কোনো দুঃখই ছিলো না ; স্ত্রী ছিলো, সন্তান ছিলো, প্রেম ছিলো, দারিদ্র্যের গ্লানিও ছিলো না। কিন্তু—

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;

লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই…

যদি এই অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতার শেষ হ'তো, তাহ'লে এটি এত দূর পর্যন্ত আলোচ্য হ'তো না। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আবার আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম—যেন একটি ঢেউ স'রে যেতে-যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাঁচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারেনি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জ'পে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন—'আমরা দু'জনে মিলে শূন্য করে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'—মৃত্যু পার হ'য়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি, আর—সেই সঙ্গে—নির্বোধ ও পাশবিক জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।

৬

তাঁর উপমা, বিশেষণ ও ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হ'তে পারে। যেহেতু তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান অবলম্বন, তাঁর হাতে বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো কর্মিষ্ঠ। 'শিকার' কবিতায় বত্রিশটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে চোদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের তেরো বার ব্যবহার ; 'হাওয়ার রাত'-এ 'মতো'—সংখ্যা আট। এতে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের ভেবে দেখতে বলবো, ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা বা সমীকরণ ছাড়া বর্ণনার কোনো উপায় আছে কিনা, যে-কোনো কবিতায় কতখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে যান তাহ'লে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু। আর দুটি কথা বিবেচ্য : জীবনানন্দ একটিও উপমা প্রয়োগ না-ক'রে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখ নাকো একটি কবিতা')-র মতো অজস্র কবিতা লিখেছেন,* আর তাঁর অনেক উপমাই সরল বা আক্ষরিক নয়, তা থেকে নানা স্তরে নানা ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, যেমন গানের পরে অনুরণন। কাস্তের মতো চাঁদ, রবারের বলের মতো বুক, বরফের কুচির মতো স্তন—এই সব উপমার উপর আমি জোর দেবো না, কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা

---

* উপমা ও উৎপ্রেক্ষাকে আলাদা ক'রে দেখছি এখানে, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পেও তফাত আছে। 'হাঙরের ঢেউ' বা 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস' বড়ো অর্থে উপমা বইকি, কিন্তু ব্যাকরণগত অর্থে নয় ; আর সেই বড়ো অর্থ নিলে এ-কথাই বলতে হয় যে কবিতার ভাষাই উপমা।

যা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করেন নি ব'লেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করবো আরো আগেকার লেখা একটি পঙ্ক্তি—

আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন—

পড়ামাত্রই আমাদের মনে যে-নূতনত্বের চমক লাগে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লাল রঙের চোখটাকে বোঝানো হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে যায় গোধূলির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন'—এটা হ'লো চাক্ষুষ উপমা, কিন্তু সেই আগুনই যখন সূর্যের আলোয় 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' হ'য়ে যায়, তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না, মনের মধ্যেও নির্বাপণের বেদনা অনুভব করি। কী উপমায়, কী বিশেষণে, একটি ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলেন তিনি—'ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পান' করতে হ'লে বর্ণ, গন্ধ আর আস্বাদকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়; 'বলীয়ান রৌদ্র' বললে রোদ যেন আয়তন পেয়ে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবুপাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনও-শিশির-শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর সুগন্ধি হ'য়ে শুয়ে থাকতে। এরই পাশে-পাশে 'পরদায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ' আর সন্ধ্যাবেলায় 'জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর' চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোনো স্থাপত্যকর্মের মতো প্রদক্ষিণ ক'রে-ক'রে দেখে নিতে পারি। তেমনি, রাত্রি কখনো 'বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে', কখনো 'জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া'টুকুর মধ্যে স্তব্ধ ও সংহত, কখনো 'নক্ষত্রের রূপালি আগুনে' উজ্জ্বল, আর কখনো দেখি সন্ধ্যার অন্ধকার 'ছোটো-ছোটো বলের মতো' পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত, কিন্তু জীবনানন্দ কখনো-কখনো তাদের একত্র ক'রে দুটোকেই আরো স্পষ্ট ক'রে ফোটাতে পেরেছেন ('কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা'); আবার, যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ, তাদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা সেনের চোখ, আর আত্মঘাতীর জানালার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক' প্রবল নিস্তব্ধতা। এ-সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম ক'রে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে

অনুভূতির রহস্যলোকে। বৌবাজারের নৈশ ফুটপাতে, যেখানে কুষ্ঠরোগী, 'লোল নিগ্রো' আর 'ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকে'র ছায়াছবির উপর ইহুদি গণিকার আধো-জাগা গানের গলা ঝ'রে পড়ছে, সেখানকার বাতাস নেহাতই প্রাকৃত অর্থে শুকনো নয়, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চিনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হ'য়ে উঠলো, এই রকম একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। কোনো মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয় না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে কখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হ'তে পারে। যে-মানুষ আপন হাতে মরতে চলেছে তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা, এই অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত ছবিতে আসন্ন আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো থমথমে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। হয়তো এখানে আরো কিছু ইঙ্গিত আছে, এই 'উট' যেহেতু মৃত্যুর দিকেই প্রলুব্ধ করছে, তাই মনে হয় উপমাটি সেই প্রাচীন কাহিনী থেকে আহৃত, যেখানে উট এসে প্রথমে শুধু ঘাড়টুকু রাখার অনুমতি চাইলো, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সমস্ত ঘর জুড়ে গৃহস্থকেই বহিষ্কৃত ক'রে দিলে। অনেক বিশেষণও এই রকম মনস্তত্ত্বঘটিত: আত্মহত্যার উদ্যোগের সময় অশ্বত্থের 'প্রধান আঁধার', জীবনপ্রেমিক মশক-সংঘে সমাকীর্ণ 'যূথচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিরপরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী প্যাঁচা'র জীবনস্পৃহার 'তুমুল, গাঢ় সমাচার'।

'সমাচার' কথাটাও লক্ষণীয়। মিশনারিরা 'গসপেল'-এর আক্ষরিক অনুবাদ করেন 'সুসমাচার'—এ-কথা মনে রাখলেই ধরা পড়ে যে শব্দটিতে এখানে 'খবরে'র চাইতে অনেক বেশি কিছু বোঝাচ্ছে। শুধু বিশেষণে নয়, বিশেষ্যপদেও, আর সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারে তাঁর দুঃসাহসী আক্রমণ বারে-বারেই রত্ন ছিনিয়ে এনেছে। বিদেশী শব্দ, গেঁয়ো শব্দ, কথ্য বুলি, অপ্রচলিত শব্দ, আর যে-সব শব্দকে আশাহীনরূপে গদ্য ব'লে আমরা জেনেছি—এই সব ভাণ্ডারের উপর সহজ অধিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ছন্দব্যবহারে বৈচিত্র্য নেই, আপাতরমণীয়তাও না, কিন্তু নেই ব'লে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের; যা আছে, তার সম্মোহন এত ব্যাপক যে তিনি আজকের দিনেও অনায়াসে এবং অনাক্রমণীয়ভাবে 'ছিল-দেখিল' মিল দিতে পেরেছেন, যা অন্য কোনো কবির পক্ষে সম্ভবই হ'তো না। তাঁর কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আবিষ্ট হবেন বার-বার, শিহরিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে শুয়ে আছে কিনা'; 'ঘাসের উপর দিয়ে

ভেসে যায় সবুজ বাতাস / অথবা সবুজ বুঝি ঘাস'), মুগ্ধ হবেন যখন হঠাৎ এক-একটি অত্যন্ত চেনা আর গদ্যধর্মী কথার প্রভাবে পুরো পঙ্‌ক্তিটি আলোকিত হ'য়ে ওঠে।

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই— নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে!

ভব্য সমাজে অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হ'তে পারলো। তেমনি, বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়, শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়—আমাদের হৃদয় সুদ্ধ ডুবে গেলো শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে ব'লে—

অকূল সুপুরিবন স্থির জলে আলো ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ
হয়ে আছে।

দৃশ্যটিকে 'এক মাইলে'র মধ্যে সীমিত করা হয়েছে ব'লেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এটুকু না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে তাঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলো যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ ক'রে গেছে—

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে

প্রেম ছিল, আশা ছিল, তবু সে দেখিল
কোন ভূত?

বলা বাহুল্য, 'ভূত' বা 'ঠ্যাং'-এর মতো শব্দের ব্যবহার অন্য যে-কোনো কবির পক্ষে হাস্যকর হ'তো।

৭

তাঁর অনন্যতা বিষয়ে অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক'য়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'—তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি

স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা', বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের, আলোড়নের নয়—তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, স্থিরতার। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমান্টিক হ'য়েও, তাই, তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো* ; আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত ব'লে মনে হয় ; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে—তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হ'তে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল ; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি—'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো—একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে, এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথম বার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধির' মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

১৯৫৫

---

* অর্থাৎ, এক হিশেবে তিনি বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।